হে অ র ণ্য ক থা ক ও

‘বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে’

বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার সঙ্গে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশি তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে—ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদিহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরি লেখার শুরু—এগুলো যে কোনো দিন ছাপার মুখ দেখবে তা মনে ছিল না। প্রকাশকের চাপে হঠাৎ একখণ্ড ছাপা হল— তারপর আরও, তৃণাঙ্কুর,ঊর্মিমুখর, উৎকর্ণ। পাঠকরা আগ্রহ করে পড়েন এর স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ডায়েরির এই ক-টা পাতা ছাপতে সাহস পাওয়া গেল।...অরণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেখানটায় বেশি, বর্তমান গ্রন্থে সেই সব অংশগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতি।—

কাল বারাকপুরে ফিরে এসেচি সুদীর্ঘ ন'মাস পরে। আগের ডায়েরি লেখার পর দশ-এগারো মাস কেটে গিয়েছে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর মশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত ৺পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশিলা গত কার্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ি এসেচে খড়্গপুর, তখন বাংলা দেশের ঘাসভরা মাঠ, টলটলে জলে ভর্তি মেদিনীপুর জেলার খাল বিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়লো। খড়্গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো—“আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।”

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম নাআর। কিন্তু সেদিন আসা হলো না, এই ক’দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ি এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বন-ঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমিরসবুজত্বে, পাখির অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্বর বৃক্ষ-বিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে, যেখানে একটা সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ি যাবার পথে একজনদের বাড়ি একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম—সেই সব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখির ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য কি সুন্দর লাগছে! যেন নতুন কোন্ দেশে এসে পড়েচি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেছে, সব হয়ে উঠেচে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ও পারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে-পড়া অস্ত-সূর্যের রাঙা রোদের অপূর্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখলাম—সে গাছটা তেমনি আছে। তারপর বিকেলে নগেন খুড়োর ছেলে ফুচুর সঙ্গে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই নাবাল জমিটার ধারে নরম সবুজ ঘাসের উপর বসে ভাবছিলাম গত মার্চ মাসে দেখা মানভূমের সেই নাকটি-টাঁড় বনের কথা, মানভূমের বৃক্ষলতাহীন পথের কাঁকর ছড়ানো টাঁড়ের কথা, বামিয়াবুরু ফরেস্টে উনিশ শো ফুট উঁচুপাহাড়ে সেই রাত্রিযাপনের কথা, চাঁইবাসাতে ভবানী সিং ফরেস্ট অফিসারের বাড়ির বিস্তৃত কম্পাউন্ডে বসে গত চৈত্র সংক্রান্তির অপরাহ্ণে চা খেতে খেতে দূরবর্তী বরকেলা শৈলমালার আড়ালে সূর্য অস্ত যাওয়ার সে দৃশ্যের কথা—মাঠাবুরু পাহাড়ে শালবনের মধ্যের উঁচু পথ দিয়ে কাঠ-কয়লা মাথায় করে বয়ে নামাচ্চে যে হো মেয়েরা, যাদের মজুরী চারবার দুর্গম পথে ওঠানামা করলে মাত্র সতেরো পয়সা, তাদের কথা—গত পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমায় বহরাগড়া

থেকে কেশুরদা রিজার্ভ (বাঁশের) ফরেস্ট দেখতে যাওয়া ও বগরাচোড়া গ্রামের সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রাম্য স্বর্ণ বাউড়ি দেবীর মন্দিরের পাশে স্তূপীকৃত প্রাচীন পাথরের দেব-দেবীর হাত-পা ভাঙা মূর্তিগুলির কথা। বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের মাথায় সেদিন দুপুরে আমি, সুবোধ ও সিন্‌হা সাহেব বসে ছিলাম, শৈলসানুতে বসন্তের পুষ্পিত লতা, পলাশ ও গোলগোলি, নীচের উপত্যকায় অজস্র ঘেঁটু ফুল। সুবোধ ঘোষ 'আরণ্যক' পড়ে শোনাচ্ছে সিন্‌হা সাহেবকে, আমি বসে বসে একদৃষ্টে বাঘমুণ্ডী শৈলারণ্যের সে সুন্দর রূপ দর্শন করচি, সেই শঙ্খ ও শোভা নদীর কথা (কি চমৎকার নাম দুটি। শঙ্খ ও শোভা!)—এই সব কত কি ছবি গত ক'মাসের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাত্‌ড়ে বার করে দেখচি মনের চোখে আর চোখ চেয়ে দেখচি বাংলা দেশের যশোর জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীর মাঠে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্যের সামনে বসে, সামনে আমার শৈলমালার amphitheatre-এ ঘেরা ভাল্‌কী ফরেস্ট নয়, (হঠাৎ মনে পড়লো ভাল্‌কী ফরেস্টের মধ্যে আমার আবিষ্কৃত সেই অপূর্ব বন্য সরোবার "লিপুদারা"র কথা, সেই উত্তুঙ্গ চুনা পাথরের শৈল-গাত্র, সেই নটরাজ শিবের মত দেখতে সাদা গাছটা, যার নাম আমি রেখেছিলুম শিববৃক্ষ, সেই লিপুকোচা গ্রামের লোকদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্য হস্তীর ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে আমাকে ও ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হাকে আমাদের বনমধ্যস্থ তাবুতে পৌঁছে দেওয়া), এ হোল আসশ্যাওড়া, ষাঁড়া, শিমুল, কেঁয়োঝাঁকা গাছের বন, চারিদিকে ছায়াভরা অপরাহ্ণে কোকিল-কূজনে চমক ভেঙে যায় যেন, ভাবি এ বাংলা দেশ, বাংলা, চিরকালের বাংলা মা। নতুবা এত বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ কোথায়? এত পাখির ডাক কোথায়? যারা চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকে, তারা কি বুঝবে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহনীয় রূপ, তাদের মন তো আকুল হয়ে ওঠেনি বাংলার বাঁশবনের ছায়ায় ঘাটের ধারের মাটির পথে বেড়াবার জন্যে, চোখ পিপাসিত হয়ে ওঠেনি একটু সবুজ বনশ্রী দেখবার জন্যে?

রাত অনেক হয়েচে। আমি ডায়েরি লিখচি, কল্যাণী পাশে শুয়ে বই পড়চে। অনেক দিন পরে দেশে এসে ও খুব খুশি। আজ বলচে ওবেলা, "আমাদের এ বাড়িটা কেমন ভাল, কেমন ছাদ—না?" সত্যি, বাড়িটা আমারও ভাল লাগচে। ঘন ছায়াভরা বাগান ও বনে ঘেরা, ওই বড় বকুল-গাছটায় বাল্যদিনের মত জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে জানলা দিয়ে দেখচি, বিলবিলের ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙ ডাকচে আর বনে ঝোপে কত কি কীটপতঙ্গ যে কুস্বর করচে তার ইয়ত্তা নেই।

আবার মনে পড়চে সেই কতদূরের শঙ্খ ও শোভা নদীর তীর, গভীর নাকটিটাঁড়েরবনমধ্যস্থ কৃষ্ণ প্রস্তরের রসই গণ্ডশৈল ও আদিম মানবের চিহ্নযুক্ত গুহা, ভাল্‌কী জঙ্গলে বন্য বরমকোচা গ্রামের সেই মুণ্ডা যুবতীটি, যে আমায় বলেছিল—"তুই কি করচিস এ বনে আমাদের? ভাল ভাল জায়গা দেখে বেড়াচ্ছিস বুঝি?" অবিশ্যি এত ভাল বাংলায় বলেনি।

আর মনে পড়চে নিমডির বনে সেই পলাশ ফুলের শোভা গত বসন্তে ও মাঠা গ্রামের সাঁওতালের মত চেহারা সেই ভুবনেশ্বর বাঁড়ুজ্যের কথা। সুদূর নাকটিটাঁড়ের বন ও বন্য শঙ্খ নদীর তীরবর্তী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিলাসন। সাঁওতালের মত দেখতে, মিশ কালো—নাম বল্লে, ভুবনেশ্বর বাঁড়ুজ্যে। আমি চমকে উঠেছিলাম।

বাইরে হঠাৎ গিয়ে দেখি কৃষ্ণাচতুর্থীর ভাঙা চাঁদ উঠেচে—বাইরে জ্যোৎস্না। কল্যাণীকে ডেকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলুম। খুব বৌ-কথা-কও পাখি ডাকচে। বাঁশবনে রাতজাগা আর একটা কি পাখি ঠক্ ঠক্ শব্দ করচে। বাংলা পল্লীর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপ প্রাণ ভরে দেখি কত রাত পর্যন্ত বসে বসে।

খুকু নেই বারাকপুরে, বিয়ে হয়ে এখান থেকে চলে গিয়েচে কোথায় তার শ্বশুরবাড়ি—সেখানে। বহুদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

জীবনই এ রকম, এক যায়, আর আসে।

মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য, শাশ্বত—তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!

ভাল কথা, গত মাঘ মাসে কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার একটি খুকি হয়েচে, নাম তার রেখেছে রাখী, বেশ খুকিটি। সুপ্রভা আমার খুকুর কথা কত জিজ্ঞেস করলে।

রেণুর সঙ্গেও এবার কলকাতায় কথা, সে বেথুনে পড়চে সেকেন্ড ইয়ারে। বোমা পড়বার তৃতীয় দিনে তারা পালিয়ে গেল কলকাতা থেকে তাদের দেশে। এখনও ফেরেনি দেখে এলুম।

এখানে এসে জীবন আরম্ভ করেছি আট মাস পরে। আজ সকালে ইছামতীতে নাইতে নেমেছি, বেলা সাড়ে আটটা হবে, শান্ত নদীজল, ওপারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ ও ঝিঙে-পটলের ক্ষেত, এপারে ফণি চকত্তির জমির বাগান, সাঁইবাবলা

ও শিরীষ গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল-পালার সৌন্দর্য। কোকিলের ছেদহীন কূজন সকালের আকাশ যেন ভরিয়ে রেখেচে, প্রস্ফুট তুঁত ফুলের সুবাস বাতাসে। কালু মোড়লের ছেলে গনি ও নগেন খুড়োর ছেলে ফুচু ঘাটে নাইচে। গনি আমের চালান নিয়ে গিয়েছিল নফর কোলের বাজারে। একচল্লিশ দিন কলকাতায় ছিল, আজ এসেচে। দেশে এসেচি আজ চারদিন, এখনও এখানকার নতুনত্ব কাটেনি। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এরসাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকুতি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আকুতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্ম-প্রবৃত্তি।

আজ হাওড়া সঙ্ঘ থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এল।

কলকাতা থেকে ফিরেচি কাল বৈকালে। ইউনিভারসিটির মিটিং-এ সেখানে অনেকদিন পরে সুনীতিবাবু ও বহু পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে রাত ৯টার সময়ে বাণী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কলকাতার অন্ধকার ভরা রূপের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। গ্রামে ফিরলুম রবিবার বৈকালে, বেশ একটু মেঘবৃষ্টি দেখা দিলে, সামান্য একটু কালবৈশাখী বৈশাখের বিকেলে। তারপরেই আকাশে দেখা দিলে রাঙা মেঘস্তূপ, আমি বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে, গাছপালার কি চমৎকার সৌন্দর্য! মুগ্ধ করে দেয় আমাকে, চেয়ে দেখে সত্যিই বিস্ময় লাগে। কত কি গাছ, কত ধরনের পাতা! বিশ্বরূপের কত কি রূপ! যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজপোতার বাঁশের বনে কচু ঝাড়, বেত গাছের মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের ডগা নত হয়ে আছে—নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাঁড়ের শালবন করন্ধা পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্ণের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিরাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দাবুরুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে

যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।

পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়িতে রবীন্দ্রজন্মোৎসব সম্পন্ন করে। মাস্টার মশায় অতুল গুপ্ত, সজনী, বুদ্ধদেব, বাণী রায় সবাই এক সঙ্গে যাওয়া গেল। বেশ মজা করে মিটিং করা গেল—ভাটপাড়ার আশালতার সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পরে—প্রায় আঠারো বছর পরে। ঘটে গেল জিনিসটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, "আপনাকে আমার মা ডাকচেন।"

গেলুম একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি—রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের সামনে।

একটি মেয়ে এসে ঝুপ্ করে নীচু হয়ে পায়ের জুতোর উপর দুহাত বুলিয়ে বল্লে—"দাদা, কেমন আছেন? কি ভাগ্যি যে আপনি এলেন এখানে!"

"ও, আশা না?"

"হ্যাঁ দাদা। এখন বড়-মানুষ হয়ে গিয়েচেন—আপনি কি এখন গরিব বোনকে চিনতে পারবেন?"

ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেচি কি একটা কাগজে।

পরদিন ফিরলুম বনগাঁয়ে। স্টেশনে নেমে অম্বরপুরের একখানা গরুর গাড়িযাচ্চে—তাতেই চড়ে বসলুম—প্রথম শ্যাওড়া গাছ ভাঁট গাছ দেখে আমার কিআনন্দ!

এবার বিভূতিদের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম।

সিংভূমের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হা হঠাৎ এসে হাজির। পচা রায় ও আমি ওঁকে নিয়ে বেলেডাঙার পুলে গেলাম। চাঁদ উঠেচে, আজ পূর্ণিমা। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠে। কত ঝোপে ঝোপে পাকা বৈঁচি তুলে খেতে খেতে আমরা গেলুম। ক্লান্ত দেহে জ্যোৎস্নালোকে ইছামতীর জলে এসে নামি আমাদের বনসিমতলার ঘাটে। মিঃ সিন্‌হা সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে—তিনুও ছিল। উঠে মাধবপুরের সবুজ ঢেউ-খেলানো ঘাসের মাঠ দেখে এল ওরা। পরদিন

S.D.O.-কে আনালুম, হাট থেকে ফিরে এসে দেখি S.D.O. ও সুরেন বসে। তাদের চা খাওয়ানো গেল—নিগ্রোর প্রতিআমেরিকানদের অত্যাচারের কত কাহিনী বর্ণনা করেন মিঃ সিন্‌হা।

তার আগের দিন উষা চৌধুরী এসে হাজির। আমি নারায়ণদা'র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে সবে বসেচি—এমন সময় কল্যাণী চিঠি লিখে পাঠালে—মিসেস চৌধুরী এসেচেন। উনি এখনি চলে যাবেন। তখুনি এসে দেখি ঊষা সত্যিই খাটের ওপর বসে আছে। ওকে নিয়ে আমরা সবাই গেলুম নদীর ধারে। ঊষা নদী দেখে খুব খুশি—বালিকার মত খুশি।

অতএব বোঝা গেল বিদেশাগত দুটি লোকেরই ভাল লেগেচে আমাদের স্বচ্ছসলিলা ইছামতী—পুলিনশালিনী ইছামতী।

আবার কাল কলকাতা গিয়ে সজনীর সঙ্গে ঊষাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বহুকাল পরে অশ্বিনী—আমাদের ৬০, মির্জাপুর স্ট্রীটের সেই বাল্যবন্ধু অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা।

অনেকে গল্প করচি—ঊষারা কাল চলে যাচ্ছে লাহোরে—অনেকে দেখা করতে এসেচে—হঠাৎ ওর মধ্যে একটি লোক বল্লে—বিভূতি না?

অবাক হয়ে বললুম—চিনতে পারচি নে তো?

—তা চিনতে পারবে কেন? আমি অশ্বিনী।

তখনি আমি তার শার্ট ধরে টেনে আনতে আনতে বললুম—দাও দিকি আমার প্রথম বিয়ের সেই ঘড়িটা—।আজ ২৭ বছর পরে দেখা—সেই সময়ই ও আমার ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল—গৌরীর বাপের দেওয়া সেই পকেট ঘড়িটা। কত বছর আগে!

মহাদেব রায়কে নিয়ে গেলুম শ্রীমতী বাণী রায়ের বাড়ি। চা খেয়ে কত গল্প। বেশ ভাল বেলফুল ফুটেছিল, তুলে দিলেন ওঁরা। ওঁর মা সুলেখিকা গিরিবালা দুখানা বই উপহার দিলেন।

মহাদেববাবুর সঙ্গে পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ৬ই মে রওনা হবো হাওড়া থেকে।

রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠির মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম আমরা দুজনে। রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়,ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে। কি কালো জল! ভগবান যেন অত্যন্ত শান্ত রূপ ধরে আছেন—যেমন তাঁর অত্যন্ত অপরূপ মূর্তি দেখেছিলাম সেদিন নতিডাঙার মরাগাঙের ধারে বসে। পাশে নতিডাঙার প্রকাণ্ড বটগাছটা, ওপারে আরামডাঙার মাঠে আউশ ধানের কচি সবুজ জাওলা ও খেজুর গাছের সারি। সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।

আম কুড়োনো এ সময় একটা আনন্দের ব্যাপার। আজ সকালে নদীর ধারে যাচ্চি, তেঁতুলতলী আম গাছটার তলায় দেখি হাজারী জেলেনী আম কুড়ুচ্চে। আমি যেতে না যেতে খপ্ করে একটা আম তুলে নিলে তলা থেকে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। পাগলা জেলের মা আর হাজারী জেলেনী এই দুজনে আম কুড়ুবার উদ্বেগে বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় না—নইলে অত সকালে ওঠে কি করে? সেদিন পাগলা জেলের মা ওর ঝুড়ি থেকে একটা পাকা আম আমায় দিয়ে গিয়েছিল। এইমাত্র একটা মশা মারলুম।

আজ কল্যাণীকে নিয়ে ফুচু, হর, বুধো প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেরা নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেল বিকেলে, আমিও সঙ্গে গেলুম। অনেক দিন ওপারে যাইনি—মাঠ ছাড়িয়ে যে একটা পথ আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। সেই পথ পর্যন্ত গিয়ে একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে নেওয়া হোল দাঁতনের জন্যে। আমি নিজে নৌকো বেয়ে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম—যেমন ও-বেলা তেঁতুলতলা থেকে সাঁতার দিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘাটে। জলে নামলুম দুজনে, জল খুব বেড়েচে। আর বর্ষার আকাশে মেঘের দৃশ্য অদ্ভুত। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে রাঙা আলো। দেখে একটা অনুপ্রেরণা মনে জাগলো—বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি— এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীল কুঠির পুল থেকে শুরু করবো।

গত ৫/৬ দিন ভীষণ বর্ষার পর আজ প্রথম রোদ উঠেচে। এখনও অনেক আম—তেঁতুলতলীতে আম কুড়ুই রোজ। গাছতলায় পাকা আম কুড়ুই। আজ ভোরে মুখ ধুয়ে ফিরচি নদীর ঘাট থেকে, বাঁশতলীর একটি টুকটুকে আম টুপ্ করে পড়লো আমার সামনে—কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। কল্যাণী সেটি লক্ষ্মীকে দিলে।

বিকেলে শ্যামাচরণদা'র ছেলে হর বল্লে, নৌকোয় বেড়াতে যাবেন না? আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি বাঁশ-বাগানের পথে গাব গাছটার কাছে। অনেকদিন যাইনি নৌকোতে—কেবল যা গিয়েছিলুম কাল না পরশু। নলে জেলের নৌকো ছাড়া হোল।বেশ মেঘমুক্ত বিকেলটি, না গরম, না ঠাণ্ডা। দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারা লতা, বন্যেবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ—সবুজ, সবুজ, এত সবুজও আছে এদেশে; সবুজ সৌন্দর্যের ফুলঝুরি যেন চারিধারে। ক্রমে কুঠি ছাড়িয়ে গেল। নীলকুঠি এখন আর নেই, ভাঙা হাউজ ঘর আছে—এমন ঘন বন সেখানে যে দিনমানেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। ওই সেই ঝিনুকের স্তূপ নদীর ধারটাতে, গত ফাল্গুন মাসে ছেলেরা ঝিনুক তুলেচে—তার পচা গন্ধ আকাশ বাতাস ভরিয়েছে, কাছে যাওয়া যায় না। কুঠি ছাড়ালুম, আবার নদীর দুপারে ঘন সবুজ উলুবন, জলের পাড়ে জলজ ঘাস ও বন্যেবুড়োর গাছ, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, কুমড়োর ক্ষেত—শান্ত স্তব্ধ পল্লীশ্রী, এতদিনে ছোটনাগপুরের ঊষর কাঁকর ও পাথরের দেশে বাস করে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল।

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন যাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে, যেন এখনি বলবে—এই দ্যাখো সেই খোকা কত বড় হয়েচে! সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কাঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্ছে। একটি ছোকরা, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে, একখানা সাইকেল। ছোকরা বল্লে, আশুর হাটে তাদের বাড়ি। পাশেই মরগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে বাঁ ধারে আরামডাঙার বাঁশবন খেজুর বাগানের তলা দিয়ে ওই গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ, নীল-আকাশ, ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দূর্বাস্তৃত তৃণ-ক্ষেত্র—সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোনো ইটের দরগা। কত কাল এদিকে আসিনি, আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না—হয়তো কখনও আসিই নি—অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর, ভাল্‌কীর সেই ঘন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী, বামিয়াবুরু ও চিটিমিটি, রাঁচির পথে হির্নি জলপ্রপাত ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেস্ট। কোথায় দিল্লি, কোথায় আগ্রা, কোথায় চাটগাঁ, কোথায় শিলং, দার্জিলিং কোথায় না গিয়েচি! অথচ জীবনে কখনও আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দু মাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির মত সুন্দর, তীরতরুশ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে। একটা বড় শিউলিগাছ, আমগাছ, বড় এক ঝাড় জাওয়া বাঁশ ওপারের, সামনে ছোট্ট খালের ঘাটটি—হাত দশ-বারো চওড়া মরগাঙের খালের এপারেই বর্ষা-সতেজ উলুবন, দূরবিস্তৃত মাঠ বেলেডাঙার সীমানায় মিশে গিয়েচে। সূর্যাস্তের রাঙা রঙ আকাশে।

পরদিন বিকেলে গেলুম আরামডাঙার এপারে 'কলাতলার দোয়া'তে। নতিডাঙার বড় বটগাছটা ছাড়িয়ে ওপথে কতদূর গেলুম। এ পথে কত কাল আসিনি। ডাঁশাখেজুর তলা বিছিয়ে পড়ে আছে পথের ধারে খেজুর গাছের। মোল্লাহাটির পথে শুধুই ঝুরিনামানো প্রাচীন বটের ছায়া, ঘন পত্রপল্লবের আড়ালে পড়ন্ত বেলায় বৌ-কথা-কও ডাকচে।

আজ নৌকোয় বেড়াতে গিয়েছিলুম একেবারে মাধবপুর। অনেককাল আগে এই রকমই নৌকোয় বেড়াচ্ছিলুম আমি আর ভরত। বহুকাল আগে আমার বাল্যকালে, দিগম্বর পাড়ুইয়ের একখানা খেয়া নৌকোতে আমি ভরত হাটবারের দিন লোক পারাপারকরতাম রায়পাড়ার ঘাটে। এক মেঘাবৃত সন্ধ্যায় মাঠ ভেঙে গিয়েছিলুম মাধবপুরে পার্বতীদের বাড়ি। পার্বতী বিশ্বাস জাতে কাপালী, গোপালনগরের হাটে বেগুন বেচে, আমাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়তো। সেই আর এই।

তারপর কত জায়গায় বেড়ালুম জীবনে—এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরের মধ্যে কিন্তু মাধবপুর আর কখনও আসিনি। গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই গোয়ালপাড়া—একটা লোক গাড়ু হাতে পথে যাচ্চে, জিজ্ঞেস করতে বল্লে, ঋষি ঘোষের বাড়ি। একটা বড় কাঁঠাল বাগান, অনেক কাঁঠাল ঝুলছে, জেলি বল্লে— দেখুন দাদা, কত আম পেকে!

চাষা গাঁ মাধবপুর। সব খড়ের ঘর, ঝক্‌ঝকে তকতকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া চলে। গোলাপালা, ছোট ডোবা, বাঁধানো মনসাতলা ইত্যাদি মাটির পথের দুয়ারে। একটা চালাঘরে কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। সেটা নাকি গ্রাম্য পাঠশালা। কয়েকটি লোক সেখানে বসে আছে। একটি ছোকরার বাড়ি বসিরহাটে—সে নানু প্রসাদকে চেনে।

সামনে মনসা সিজের বেড়া দেওয়া একটা পুরানো কোঠা বাড়ি—নগেন রায় বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি। তিনি ছ বছর হোল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েচেন—তাঁর স্ত্রী থাকেন বাড়িতে, ছেলেপুলে নেই।

এই মাধবপুর, ক্ষুদ্র কৃষকদের গ্রাম মাত্র—কিন্তু আমার মনে চিরকাল রহস্যময় হয়ে ছিল। ভাল করে আজই দেখলুম এ গ্রামকে, বত্রিশ বছর আগে সেই যে ভরতের সঙ্গে এসেছিলুম, সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে এবং শুধু পার্বতীদের বাড়িতেই। গ্রামটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখলুম এত কাল পরে—আজ প্রথম।

মনে পড়লো সংসারের টানাটানি হলে বাবা আসতেন এই মাধবপুরে এক এক বিকেল বেলায় নৌকায় পার হয়ে আমার বাল্যকালে। বাবার পুণ্যচরণ-ধূলিপূত মাধবপুর!

পরদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরগাঙের ধারের সেই জালি ধানের ক্ষেতটাতে বসি। কি শান্তি, কি শ্যামলতা এই দৃশ্যটার। ওপারে আরামডাঙার মাঠ, খেজুর চারা—গরু চরচে, মরগাঙের ঘন সবুজ কচুরিপানার দামের ওপর শুভ্রপক্ষ বক বেড়াচ্ছে মাছ খুঁজে খুঁজে—পাশেই বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া একটা ঝিঙে ক্ষেতে হলদে ঝিঙের ফুল ফুটে আছে এই মেঘভরা বিকেলে। যিনি সূর্যে, নক্ষত্রে নিওন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাস ও নানা ধাতুর আগুন জ্বেলে রেখেচেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণতরু, এই সৌন্দর্যভরা পল্লীদৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন,তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত contrast! সূর্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম বনশোভার, এই তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্‌আয়োজন মাত্র। আগুন কেন? জল সম্ভব হবে বলে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করে আসচে। কালবৈশাখী নিশ্চয়—ছুটতে ছুটতে এক মাইল এসে নদীতে আমাদের বনসিমতলার ঘাটে নামি। কি চমৎকার নদীজল, পুণ্য-সলিলা ইছামতী প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় গত দশ-পনেরো বছর ধরে আমায় কত কি শিখিয়েচে। ভগবানের কত রূপই প্রত্যক্ষ করেছি ইছামতীতে সাঁতার দিতে দিতে এমনি কত নিদাঘ সন্ধ্যায়, বর্ষা অপরাহ্ণের বৃষ্টিধারামুখর নির্জনতায়। আজ দেখলুম, কুঠির দিকে কি অদ্ভুত কালো মেঘসজ্জা—উড়ে আসচে ভাঙা নীল কুঠিটার জঙ্গলের দিক থেকে আমাদের ঘাটের দিকে। কি সে অদ্ভুত রূপ। বিশ্বরূপের এ সব রূপ—এ পটভূমিতে, এমন অবস্থায় দেখবার সৌভাগ্য আমায় দিয়েচেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই দয়া করে যাকে দেখতে দেন, সে-ই দেখে।

সারাদিন কাটলো ট্রেনে। তিনবার অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম—একবার ব্রাহ্মণীনদীর সেতুর কাছে বিস্তৃত কটা রংয়ের বালুরাশির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় দ্বিধারা ব্রাহ্মণী বয়ে চলেচে—দূরে নীল পর্বতমালা, ঘন সবুজ বনানী। বাংলাদেশের বন অথচ তার পেছনে। আকাশের গায়ে সিংভূমের চেয়ে শ্যামলতর শৈলশ্রেণী। আর একবার এই রকম দৃশ্য দেখলাম কটকের এপাশে মহানদীর সেতু থেকে এবং ওপাশে কাটজুড়ির সেতু থেকে। ট্রেন যত পুরীর কাছাকাছি আসতে লাগলো বনবনানী ততই শ্যামলতর, নারিকেল কুঞ্জ ততই ঘনতর, দোলায়মান বেণুবনশ্রেণী ততই নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে অনেকদূর পর্যন্ত মাকড়া পাথরের মালভূমি বা টাঁড় এবং এক প্রকারের সাদা ফুলফোটা ঝুপি গাছের ঘন সবুজ বন। বাংলাদেশের চেয়েও শ্যামল এসব অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনানী। বনপুষ্পের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়লো না। বর্ষার দিন, ভুবনেশ্বরের এদিক থেকে বর্ষা শুরু হয়েচে, ক্রমে বৃষ্টি বাড়চে বই কমচে না। পুরীর ঠিক আগের স্টেশন হোল মালতীপাতপুর। উড়িষ্যার এই ক্ষুদ্র পল্লী যে একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যভুমি শুধু তার ঘন নারিকেলকুঞ্জ ও শ্যাম বনশোভায়—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পুরী স্টেশনে গজেনবাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকূল সমুদ্রের নীল জলরাশি! সে কি পরম মুহূর্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্সবাজারে—আর এই ২০/২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।

সন্ধ্যায় ৺জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্বশরীর মনে অবশ হয়ে গেল। আধ অন্ধকার গর্ভদেউলে বহু নরনারী দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করচে—ভক্তবৃন্দের মুখে হরিধ্বনি, নানা মন্দিরেরগর্ভগৃহ, সেখানে বাঁধা প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কত কি দেবদেবীর বিগ্রহ, জুঁই ফুল ও পদ্মমালার সুগন্ধ বাতাসে, বিরাটকায় পাষাণ দেউল, কোথাও সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হচ্চে পাণ্ডাদের মুখে—আমাদের সঙ্গী

পাণ্ডা বলচে এই নীলাচল, এখানে শুধু নীল মাধবের মন্দির তৈরি হয়েচে—বাইরের আনন্দবাজারে নারিকেলের তৈরি নানা রকম মিষ্টান্ন ভোগ ও তাদের সংস্কৃত নাম, প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ যেন এখানে বাঁধা পড়ে আছে।

সকাল থেকে দুর্যোগ চলচে। পুরীর বীরেন রায় একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তিনি এবং কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন গজেনবাবুর ওখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ধার্য হলো ওবেলা আমায় নিয়ে নাকি সম্বর্ধনা করবেন, সেকথা বলে গেলেন।

বেড়িয়ে ফিরবার পরেই অত্যন্ত বৃষ্টি শুরু হোল। এদিকে পাণ্ডাঠাকুরের ছড়িদার বলে গেল যে একটার সময় মহাপ্রসাদ পাঠাবে। ক্ষিদেতে নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে ভীষণ দুর্যোগ, মহাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো, প্রায় সাড়ে চারটে বিকেল—তখন 'কণিকা প্রসাদ' এল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করতে যাবার পূর্বে কল্যাণী আমি উমা সবাই মিলে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলুম। কল্যাণী বহু ঝিনুক কুড়ুলে। অনেক দিন আগে এই দিনটিতে বারাকপুরে খুকু আমার সঙ্গে নাইতে গিয়ে 'মাটি আনি' বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে ডাঙায় উঠে ছুট দিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটাতে কি দুঃখই হয়েছিল মনে। পায়ে হেঁটে চালকী চলে গিয়েছিলুম জাহ্নবীর ওখানে, মনে কষ্ট নিয়ে। আজ কোথায় জাহ্নবী, কোথায় সে খুকু, কোথায় বা সেদিনের মনের কষ্ট! জীবনে একদল যখন চলে যায়, তখন বড়ই কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, কিন্তু শীঘ্রই অপরদল এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে—তারাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কত প্রিয়।

গজেনবাবুদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখতে গেলুম। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ছিলেন আঠারো বছর—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস ঠাকুর যখন মারা যান, তখন তিনি নিজে ওঁকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসে এখানে সমুদ্রতটে বালুকা খুঁড়ে সমাধিস্থ করেন। কালক্রমে এখন সেখানে বড় বড় বাড়ি হয়ে উঠেচে চারধারে। স্থানটি অতি শান্তিপ্রদ, মনে একটি উদাস পবিত্র ভাব এনে দেয়। দুটি বালক শিষ্য হাতে ঝুলি নিয়ে মালা-জপ করচে, তারাই সব দেখালে।

সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বসলুম। ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠালগাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন ঊর্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?

গজেনবাবু কেবল বলে, বিভূতিবাবু, সভার সময় হোল। সাতটাতে সভা।

সুমথবাবু বল্লে—আপনাকে দেখচি ওঠানো দায়, সভার সব লোক এসে হাঁ করে বসে থাকবে—চলুন।

১৮০ শ্রী তীর্থপতি মহারাজ এই পুরুষোত্তম মঠের মোহান্ত। তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রচার করতে। তাঁর সঙ্গে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা হোল। বৈষ্ণবদের কি বিনয় ও ভক্তি। অত বড় পণ্ডিত বল্লেন হাত জোড় করে, আমি আপনাদের দাসানুদাস হতে চাই। আবার কবে দেখা পাবো?

ওখান থেকে এসে সবাই গেলুম সভাস্থলে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করলেন। আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমার রচনা সম্বন্ধে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেকে বল্লেন। গজেনবাবু ও মিঃ পালিত বল্লেন, আমার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নাকি রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর চেয়েও বড়।

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রে কল্যাণী, উমা, বীরেন রায়, গজেনবাবু, সুমথবাবু সবাই মিলে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে এলুম। উত্তাল সমুদ্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে, হু হু হাওয়া বইচে, যাকে বলে সত্যিকারের 'Sea breeze'বা ডাচ্'Zee brugge'অর্থাৎ সমুদ্রের হাওয়া।

রাত্রে আবার ভীষণ বৃষ্টি। সকালে উমা ও কল্যাণী সমুদ্রে স্নান করতে গেল। ওরা সমুদ্রে স্নান করে খুব খুশি হয়ে এল।

একটু পরে বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেশ রোদ উঠলো—উমাকে রেখে কল্যাণীকে নিয়ে আমি শ্রীমন্দির দর্শন করতে যাচ্ছি, পথে ছাতার মঠ ও রাধাকান্ত মঠ দেখে বার হচ্ছি, এমন সময় মহাদেববাবু পেছন থেকে ডাকচেন। সঙ্গে প্রতাপবাবু। আমরা গিয়ে এবার মঠ দেখি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মঠটি সবচেয়ে বিত্তশালী। কেমন নীচু-নীচু ঘরগুলি, দেওয়ালে নানারকম quaint ছবি আঁকা, পাথরের কাজকরা থাম, খাঁচায় টিয়া ময়না পাখি, শান্ত পরিবেশ—যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের

কোনো রাজপ্রাসাদ। তারপর গেলুম মন্দির দেখতে। গজেনবাবুর মা সেখানে উপস্থিত, তিনি বল্লেন, রত্নবেদী দেখবার দেরি আছে একটু, বৌমাকে নিয়ে একটু বোসো। একটি সাধু ভাগবত পাঠ করচেন, সেখানে খানিকটা বসি। তারপর মন্দিরের সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখলুম বেলা বারোটা পর্যন্ত। মন্দির তো নয়, পাহাড়। ওই আবার সেই কথা মনে পড়ে—প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ সেখানে যেন অচল হয়ে বাঁধা পড়েছে পাথরের বাঁধনে। গগনচুম্বী গম্ভীরা কি অসাধারণ শক্তি ও বিরাটত্বের পরিচয় দিচ্ছে! জগমোহনের কি গঠনভঙ্গি! নাটমন্দিরের সরল ও সহজ স্থাপত্যের মধ্যে একটি সখ্য ভাব জড়ানো। ভোগগৃহের সামনে সেই স্তম্ভ বর্তমান আজও, যে স্তম্ভটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন। পাণ্ডারা এক জায়গায় তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না যে সে তাঁর আঙুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি। শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে,ধর্ম-উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নামধর্মের মাহাত্ম যদি কেউ ভাল না বোঝে, তবে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?

মন্দির দেখতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা। কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোগ কিনে উমার জন্যে বাড়ি আনা গেল। ভোগ আসতে দেরি হয়, আজও হোল—বেলা সাড়ে চারটার সময় ভোগ এল।

আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ দিয়ে বহুদূরব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে। দুপুরবেলায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সে রূপ দর্শন করলুম। সুমথবাবু এসে বল্লে, চলুন চা খেয়ে আসি আর সস্তায় জুতো নিয়ে আসি মুচিপাড়া থেকে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ আবার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা। আর আমি যেতে পারলুম না কোথাও। অবাক হয়ে চেয়ে বসে পড়লাম। কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূরবিসর্পী নীল রূপের মধ্যে, উর্মিমালার সফেন আকুলতায়, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমির শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ। অবিশ্যি দক্ষিণ মেরু মহাদেশের তুষারাবৃত নির্জন ভূভাগের কথা তুলচি নে এখানে। নুলিয়ারা সেই বিক্ষুব্ধ বীচিমালা পার হয়ে ডিঙিতে মাছ ধরে আনচে—একটা Sword fish দেখলুম আনচে—প্রকাণ্ড করাতখানা ঝক ঝক করচে।

মুচিপাড়ায় জুতো দেখতে গিয়ে একটা দোকানে বসে সবাই গল্প করচি। একটি পথচলতি লোক এসে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি সে গালুডির সেই হরিপদ ডাক্তার। অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি হই। বল্লে—বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটাকে নষ্ট করলুম বিভূতিবাবু।

সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আড্ডা বসলো—অনেকগুলি ভদ্রলোক এলেন আড্ডা দিতে—যদু মল্লিকের পৌত্র বৃন্দাবন মল্লিক প্রভৃতি। জ্যোৎস্নারাত্রে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে কতক্ষণ গল্পগুজব করি।

সন্ধ্যায় আজ বীরেন রায়, বৃন্দাবন মল্লিক, গজেনবাবু, সুমথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চক্রতীর্থে সমুদ্রতীরে বালির ওপর গিয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর পড়ে তার তরঙ্গরাজির রূপ বদলে দিয়েচে, ধু ধু নির্জন বালুচরের গায়ে আছড়ে এসে পড়চে ঊর্মিমালা-চৈতন্যদেব চক্রতীর্থে সমুদ্রের এই রূপ দেখেই নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন—আজ ৪৫০ বছর আগের কথা। সেই সমুদ্র এখনও ঠিক তেমনি আছে, সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ, সেই নির্জন বালুতট, সেই ঝাউবনশ্রেণী, সেই উদাস অস্পষ্ট চক্রবালরেখা।

বীরেন রায় আজ সকালে প্রাচীন তোসালি নগরের অনেক পুরোনো পুঁথি, পোড়ামাটির খেলনা, পাথরের মালা ইত্যাদি দেখালেন। উড়িষ্যার প্রাচীন শিলা সংগ্রহইনি করে এসেচেন চিরকাল ধরে। কত টাকা নষ্ট করেচেন এদের পেছনে অথচ ক্লিভ্‌ল্যান্ড মিউজিয়ম থেকে যখন ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি কিনতে চাইলে, তখন উনি তাদের না দিয়ে সামান্য ছ'হাজার টাকা দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে দান করলেন। আজ গালুডির সেই হরিপদবাবু ভোরে আমার এখানেএসেছিলেন।

সবাই মিলে খুব আড্ডা দিয়ে চা খাওয়া গেল 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ—তারপর ওরা সব মুচিপাড়ায় গিয়ে জুতো দেখলে। বৃন্দাবন মল্লিক এসে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরিতে নিয়ে গেল। চক্রতীর্থে জ্যোৎস্নায় বেলাভূমির বালুর ওপর বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ফিরে এলুম আমার বাসায়। কত রাত পর্যন্ত সেখানে আড্ডা। বীরেন রায় একবার এক বড় বুদ্ধমূর্তি জঙ্গলের মধ্যে কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প করলেন। হঠাৎ বুদ্ধের ধ্যানীপ্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখে বলে উঠলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি। ঢেন্‌কানল স্টেটে এক প্রাচীন মন্দির

দেখতে গিয়ে উনি পড়েছিলেন king cobra-র হাতে। ভগবান সর্বভূতে আছেন ভেবে হঠাৎ নাকি মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন সর্প অদৃশ্য হয়েচে।

দুপুরের পরে গোবর্ধন মঠে গিয়ে একটি চমৎকার গোপালমূর্তি দর্শন করলুম। দোর বন্ধ রয়েচে দেখে আমি দোর খুলে গিয়ে মেজেতে চুপ করে বসলুম—কেমন একটি সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে পুষ্প ও চন্দনের। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে ঠাণ্ডা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে গোপালের মূর্তির সামনে বসে রইলুম কতক্ষণ।

সকালে উঠে সামনের ঘরের বুড়ো-বুড়িকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলুম ও পুরুষোত্তম মঠে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম-উপদেশ শুনলুম।

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী', সর্বদা জেগে থাকতে হবে। আলস্যই পাপ। আসবার সময়ে শঙ্কর মঠের শ্রীগোপাল বিগ্রহ দেখে চলে এলুম। ছোট্ট ঘরটিতে পুষ্প-চন্দনের সুবাস। আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে যাচ্ছি—একটি বাড়িতে কথকতা হচ্চে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-এর। অনেকক্ষণ বসে শুনলুম। মন্দিরের কাছে হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। ৫০০ বছরের পুরোনো বকুল গাছ আজও দাঁড়িয়ে! মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতার একটি সুন্দরী মহিলাকে 'মা' বলে মনটাতে বড় ভক্তি হোল।

আজ সকালে বীরেন রায়ের বাড়ি বসে তাঁর দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল, আজ না পয়লা আষাঢ়। চলুন গিয়ে কালিদাস উৎসব করা যাক। এমন সময় এল বৃন্দাবন মল্লিক, বল্লে—আপনি বলেছিলেন 'দেবযান' পাঠ করবেন লাইব্রেরিতে—অনেক লোক এসে বসে আছে।

গেলুম। যাবার আগে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ি 'রমা ভিলা'-তে গিয়ে খানিকটা বসলাম। ১৯২৩ সালে একবার সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ি থেকে এখানে আসবার কথাবার্তা সব ঠিক, আমি আমার মেস্ থেকে বাক্সবিছানা সব বেঁধেনতুন একটা শতরঞ্চি কিনে (যখন কিনি সুসার কাকা আবার তখন সেখানে উপস্থিত) মুটের মাথায় চাপিয়ে ওদের বাড়ি এসে দেখি সিদ্ধেশ্বরবাবুর জ্বর হয়েচে, যাওয়া হবে না। ১৯২৪ সালে পৌষ মাসে আর একবার ওরা পুরী আসে, আমি যাই ভাগলপুরে। নরেন এসেছিল আমার স্থানে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রভা ও তার বাবা যখন আসেন, তখনও আমার আসবার সমস্ত ঠিক, সুপ্রভা চিঠি লিখলে, আমি পুরীর টিকিট পর্যন্ত কিনে আনলাম। সমুদ্রস্নানের জন্যেএকটা কোমরবন্ধ পর্যন্ত কিনলাম কিন্তু আসা হোল না।

এতদিন পরে 'রমা ভিলা'-তে বসে সব পুরোনো কথাই মনে পড়ছিল। আজ আর কেউ নেই—কোথায় বা সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু, কোথায় বা অক্ষয়বাবু। এত সাধ করে 'রমা ভিলা'র সদর ফটক সেবার ১৯২৩ সালে করানো হোল—ওরা কোথায় চলে গেল। গেটটি আজও আছে দেখে এলুম।

লাইব্রেরিতে কালিদাস উৎসব সম্পন্ন হোল। প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন বক্তৃতা দিলেন। আমি কিছু বললাম সভাপতি হিসেবে। মনে পড়লো বারাকপুরে গ্রীষ্মের ছুটি অতিবাহিত করাবার সময়ে প্রতি বৎসর খুকুর কাছে বলতাম—আজ ১লা আষাঢ়, খুকু এসো কালিদাসকে স্মরণ করি। এতকাল পরে ভাল করেই স্মরণ করা হোল কালিদাসকে। বিকেলে আবার খুরদা রোড থেকে আমাকে নিতে এল—সেখানেও ওবেলা 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হবে। পুরী থেকে তো কাল চলেই যাবো। খুরদা রোড পর্যন্ত ফাস্ট ক্লাসে নিয়ে গেল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে, তুষারকান্তি ঘোষকে এবং আমাকে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, গুমট বেশ। ডাঃ সরকারের বাংলোর বাইরের মাঠে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হোল। রাধাকুমুদবাবু ও তুষারকান্তিবাবু ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন—রাত সাড়ে দশটায় সভা। আমার প্রথম বক্তৃতা—সবাই খুব হাততালি দিলে। মহাদেব রায়ের বক্তৃতা অতি চমৎকার হয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটার সময় থেকে সারাদিন ট্রেনে। মহানদী ও কাটজুড়ি নদীদ্বয়, দূরের নীল শৈলমালা, কাটজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুচর ও তার ধারে সুদৃশ্য কটক শহরটি বেশ লাগলো। সারাদিন চলেচে ট্রেন, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে পড়লাম। অমরদা' রোড স্টেশন থেকে কয়েকটি গোরা সৈনিক উঠলো এবং সারারাত গানে-গল্পে তাদের সঙ্গে বেশ কাটানো গেল।

ভোরে সাঁতরাগাছি। টিকিট নিয়ে নিলে এখানে এবং হাওড়া নেমেই সোজা শেয়ালদা' হয়ে বারাকপুরে চলে এলুম। এতদিন পরে ইছামতীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। কোথায় ভুবনেশ্বরের কুচিলা বন, খণ্ডগিরি উদয়িগিরির গুহাবলী, পাথার তীর্থ পুরীর নীলাম্বুরাশি—আর কোথায় নলখাগড়া বন্যেবুড়ো গাছের সারি ও ইছামতী নদী।

বিকেলে নদীর ধারে নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। শান্ত বর্ষা,শ্যামল গাছপালা। বিশ্বরূপের আর এক রূপ এখানে। কুঠির মাঠে সেই জায়গাটায় গেলুম যেখানে খুকুর আমলে একটা বালির ঢিবি ছিল, খেঁকশেয়ালীতে গর্ত করেছিল—আমি গিয়ে বসতুম।

বাদলা নেমেছে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ইন্দু রায় ও হাবু-ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যাই। হাবু ও ফুচুর সঙ্গে কালও গিয়ে কাঁচিকাটার পুলের নীচে কচুরিপানার জড়ো করা স্তূপের উপর বসে আরামডাঙার শ্যামল মাঠ ও খেজুর গাছের সারির দিকে চেয়ে মনে হলো এ যেন ঠিক সেই বিলিতি ছবিতে South-sea Island-এর দৃশ্য দেখচি। বর্ষা-সতেজ কচি ঢোঁচরা ঘাসগুলো জলের ধারে কেমন বেড়ে উঠেচে আর তার কি শোভা। একটা রাখাল ছোঁড়া মরগাঙের ধারের ক্ষেত থেকে কাঁকুড় তুলে খাচ্চে দেখে হাবু তাকে কেবল বলতে লাগলো—ও ভাই, একটা কাঁকুড় দে না তুলে ক্ষেত থেকে।

অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটা মাঝারি সাইজের কাঁকুড় তুলে নিয়ে আসতেই হাবু ফুচু সেটার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধালে। প্রবহমান ক্ষীণকায় তটিনীর কূলে বসে পুঁটিমাছ ধরা ছোট্ট ছিপ ফেলে মাছ ধরি আর কাঁচা কাঁকুড় খাই—বেশ লাগে এ জীবন।

আজ বেলা তিনটের সময় ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ঝড়। ঝড়বৃষ্টির কোনো কামাই নেই আষাঢ় মাস পর্যন্ত। দিনগুলি ঠাণ্ডা, সজল বাতাস বয় সারাদিন। আজ মেঘবৃষ্টির পরে বেড়াতে বার হই বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে নতিডাঙার সেই বটগাছটা পর্যন্ত। সেই বিশাল প্রাচীন মহীরুহ তার ঘন সবুজ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে মজা নদীর ধারে, দূর বিস্তৃত মাঠে আউশ ধানের জাওলা বেড়ে উঠেচে, যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন শ্যাম ভূমিশ্রী—আর সকলের ওপর উপুড় হয়ে আছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। কি নব নীল নীরদ-মালা, দেখে মনে হলো তখুনি বিশ্বশিল্পীর এ শিল্প আমি না যদি দেখি, তবে এ পাড়াগাঁয়ের কেউই আর দেখবে না। শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্চে এই অদৃশ্য সৌন্দর্যের অপরাজিত আয়তনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়া। মেঘের কোলে এক জায়গায় সাদা বক উড়চে—ঠিক বেলেডাঙার পুলটার কাছে। খেজুর গাছ আছে একটা সেইখানে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। অবাক হয়ে গেলুম উড়ন্ত বক দুটিকে সেই বর্ষার মেঘ থম্‌কানো অপরাহ্ণে কাজল কালো মেঘের গায়ে উড়তে দেখে। জগতে এত সৌন্দর্যও আছে! কোথায় এর তুলনা? ধন্যবাদ হে মহাশিল্পী, তুমি আজ আমাকে তোমার সৃষ্ট রূপজগৎকে দেখবার সুযোগ দিলে। এর ভাষা সৌন্দর্যের ভাষা, কি বলতে চায় এ মুখর প্রকৃতি—এই বন, মেঘ, তৃণাবৃত প্রান্তর, উড়ন্ত বক, খেজুর গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নীরব গম্ভীর ভাষায়, তা যে কান পেতে শুনতে চায় সে শুনতে পাবে। কিন্তু ওই যে বাগ্‌দিরা মরগাঙের ধারে বসে মাচা বেঁধে সারি সারি জলি ধান পাহারা দিচ্ছে—ওরা কেউ শুনতে চায়ও না, পায়ও না।

সকালবেলা আজ বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে গেলুম। নীল আকাশ,গাছপালার প্রাচুর্য, বনবিহঙ্গের কূজন আমার মনকে অপূর্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করে রাখলে। একস্থানে বসে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখি—কি চমৎকার অপরূপ সৌন্দর্য-শিল্প ভগবানের। কুঠির মাঠে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে বসলুম নরম সরস সবুজ ঘাসের ওপর গামছা পেতে। যেন কত বন, এমন সবুজ তেলাকুচা লতার তাজা সাদা সাদা ফুল ও ঝলমলে সূর্যালোকে প্রজাপতির আনন্দ নৃত্য দেখে দেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও আমার আনন্দ কখনও পান্‌সে হয়ে যাবে না—এই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের আনন্দ, এই তরুলতার শ্যামল রূপের আনন্দ, নীল আকাশের আনন্দ।

বিষম বর্ষা করেচে আজ ক'দিন। বিরাম-বিশ্রামহীন বর্ষা, মেঘমেদুর আকাশ। কাল আমরা (কল্যাণী তিনু ও আমি) বিকেলে কুঠির মাঠ দিয়ে মরগাঙের খাল পার হয়ে আরামডাঙা বলে ছোট মুসলমানের গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা বাড়িতে বৌয়েরা কল্যাণীকে খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান সেজে দিলে, একটা কাদের ছোট ছেলে এনে ওর কোলে দিয়ে আপ্যায়িত করলে। বেশ লাগলো ওদের সরলতা। মরগাঙের ধারে যখন বসেচি, তখন সবুজের কি বিপুল সমারোহ চারিদিকে! সামনে আরামডাঙা এদিকে বেলেডাঙা যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। যখন আমাদের ঘাটের কাছাকাছি এসেচি, তখন মেঘের ফাঁকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র একটু একটু উঁকি মারচে—মেঘভাঙা সেই জ্যোৎস্নাতেই আমরা নদীজলে স্নান করতে নামলুম। সন্ধ্যায় ট্রেন যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা রাত দশটার পর দেখা দিল সারাদিনের বৃষ্টিস্নাত আকাশে! বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখি আকন্দ পাতা, সজ্‌নে গাছ, বাঁশঝাড়, বনকাপাসের ডাল—এ সবের ওপর সেই অপূর্ব জ্যোৎস্নার কি শোভা—বিশ্বরূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করলুম সামনে। ছেলেবেলায় যখন পাঁচড়া হয়েছিল—তখন এ সময়ে দেশে ছিলুম, আর কখনও থাকিনি।

আজ বড় সুন্দর শরতের রোদ। নাইবার পূর্বে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি কুঠির মাঠে, প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। শ্যামল বনঝোপ কি সুন্দর চারিদিকে। কে যেন এসে পেছন দিকে থেকে চোখ টিপে ধরবে সব সময়েই মনে হয়। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না—কি সৌন্দর্য! ঘাটে এসে যখন স্নান করতে জলে নামি—তখন নদীর ওপারের নীল শোভা হৃদয় মুগ্ধ করে দিলে। কাল বনগাঁ থেকে জমি কিনে ফিরে আসবার পথে ইন্দু বারিক, আমি ও সন্তোষ খুব ভিজে গেলুম ঝড়-বৃষ্টিতে।

পরশু নুটু ধলভূমগড়ে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে সে দেশে এসেছিল—দিন চারেক ছিল। একদিন ইন্দুর সঙ্গে বেলেডাঙার ধারের সেই সুন্দর জায়গাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—একদিন মরগাঙে আমাদের কেনা জমিগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরশু বিকেলে ইন্দু, মধু কামার ও খুড়ো মাছ ধরচে—আমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়েহাজির। আকাশের এই অদ্ভুত রং ও রচনার তলায় দলে দলে মানুষে এই রকম মরগাঙের ধারের মত জাল ফেলচে, ছিপে মাছ ধরচে, যুগল ঘোষের মত গরু চরাচ্চে, তামাক খাচ্চে, পটলের ভুঁই নিভুচ্চে—এমনি ঝিঙের ক্ষেতে হলুদ ফুল ফুটচে, কত শত বছর থেকে ভরসন্ধ্যেবেলা—এমনি শান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা চলচে।

কাল ঊষার পত্র পেলুম লাহোর থেকে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে খবর দিয়েচে। সুখী হলুম খবর পেয়ে। সামনের শনিবারে পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের ছোট মেয়ে বুড়ির বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রিত আছি, যেতে হবে শনিবারে।

ক'দিন ভীষণ বৃষ্টির পরে আজ দুদিন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েচে। গত শনিবার ২৬শে শ্রাবণ অক্ষয়বাবুর ছোট মেয়ে বুড়ির বিয়ে হয়ে গেল—সেখানে রামজোড়, ছটুসিং, সরণপ্রসাদ, যুগল তাদের সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই আবহাওয়া যেন ফিরে এল। আগামী শনিবারে এখান থেকে ঘাটশিলা যাবো, নুটু চিঠি লিখেচে।

পরশু ফণি কাকা মাছ ধরতে গিয়েছিল সুন্দরপুরের নীচে মরগাঙে, আমি তার খোঁজে সুন্দরপুর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। ওপথে অত দূর অনেক দিন যাইনি। বনকলমীর ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়, চারিধার ভরপুর সবুজ, কি অদ্ভুত শোভা ঝোপগুলির। এই ঝোপ-ঝাপ এ অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য—এর সৌন্দর্য বর্ষাকালে যে দেখবে সে মুগ্ধ হবে। আর আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা। সেখানে ছোট ছোট পাতাওয়ালা ভ্যাদ্‌লাঘাস হয়েচে, যেন সবুজ মখমলের আসন বিছানো, মাথার ওপর নত হয়ে আছে পেয়ারা ডালটি। সুরেনদের বাড়ির পেছনে আর একটা ঝোপে বনকলমী ফুটেচে দেখে সেদিন আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। বিশ্বশিল্পীর এই অপূর্ব সৃষ্টির ও সৌন্দর্যের প্রকাশ মনের গভীর অন্তস্তলে সচেতন ভাবে গ্রহণ যে করতে পারে, এ পৃথিবী, ফুলফল, নীল আকাশ, উদার ভূমিশ্রী তার কাছে আপনরূপে ধরা দেয়।

কাল কলকাতা গিয়েছিলুম—সকালে গিয়ে রাত ন'টায় ফিরি। আজ ক'দিন থেকেই আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে যাই, কূলে কূলে ভরা নদীর ধারে বনঝোপ, সাঁইবাবলা গাছ, নীল আকাশ, শরতের রোদ, ঘুঘুর ডাক—সত্যিই যেন বহুকাল পূর্বেরই বিস্মৃত বাল্যদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলায় উঠি, তারপর নিভৃত বনচ্ছায়ায় একস্থানে একটি বনকলমী ফুলের ঝোপের কাছে বসে রইলুম, ওদিকে কি একটা গাছের মাথায় মাকাল লতা উঠে কেমন একটা চমৎকার ঝোপের সৃষ্টি করেচে। রোদ না থাকলে, নীল আকাশ না থাকলে কি শরৎ মানায়? এতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! গরম রোদ হবে, লতাপাতার কটুতিক্ত গন্ধ বার হবে, তবে শরতের স্বপ্নলোক নামবে নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির চন্দ্রাতপতলে।

আজ কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসি— গাছে উঠিও। গাছে উঠলে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে হয়—বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ যেন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিবারণের ভুঁই থেকে জলে নামলুম ও সাঁতার দিতে দিতে কত নল-খাগড়ার বন, ভাসমান কচুরিপানার দাম, কলমীলতার পাশ কাটিয়ে দোদুল্যমান কত বাবুই পাখির বাসা, নীল আকাশের তলায় শরৎ মধ্যাহ্নের শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এসে পৌঁছুলাম বনসিমতলার ঘাটে।

অভিলাষ জেলে ওপারে দোয়াড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলছে—বাবু ঘোলার গাঙে এমন ভেসে বেড়াচ্ছেন কেন? কত আপদ বালাই থাকে, বিপদের কথা কি বলা যায় বাবু? অমন বেড়াবেন না।

অপূর্ব শান্তি ও আনন্দ পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে এমনি ধারা মিশিয়ে দিয়ে।

বিকেলে আজ বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছটার ওপর উঠে বসলুম খানিকক্ষণ। দূরে বাঁওড়ের নির্মল জল, আমার চারিপাশে নিস্তব্ধ বনানী। এক জায়গায় কি অজস্র বনকলমী ফুলই ফুটেচে! জেলেপাড়ার ঠিক পেছনের মাঠটাতে। সাকারীপুকুরের রাস্তা দিয়ে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

আজ দুপুরে দুলা সাঁওতালদের সঙ্গে হেঁটে এলুম বরাজুড়ি। শরতের নীল আকাশ, দূরে দূরে নীল শৈলশ্রেণী, বাটাইজোড় পার হয়ে ঢ্যাংজুড়ি সারাডোবা প্রভৃতি সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম অবশেষে বরাজুড়ি বলে গ্রামে, খোলার অর্ডার দিতে। খোলা অর্থাৎ চাল ছাইবার খাপরা। কি সুন্দর গ্রামটি, ঢুকেই আমার ভাল লাগলো, ছায়া নেমে এসেছে শরৎ অপরাহ্ণের মৌলবনে ও শালবনে, দিঘিতে রক্তমৃণাল ফুটেচে, শ্যামা ধানের ক্ষেত ঠেকচে সুদূরের নীল শৈলমালায়। কার্তিক গোরাই বলে একজন দোকানদার আমাকে খাতির করে চা খাওয়ালে—বল্লে, ধানের জমি বড় সস্তা। দোকানে লোকে এ বিশ্বব্যাপী দুর্দশার দিনে ঘটি বাটি বাঁধা রেখে ছোলা, কলাই (এ দেশে বলে বিরি) নিয়ে যাচ্চে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম। তখন বেশ ছায়া নেমেচে, গুট্‌কে কেবলই মংলার নিন্দে করচে সারাপথ। আজ এসে পড়লুম সেই চমৎকার কথাটি—

"On the contrary, the wise man is conscious of himself, of God. If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discovered. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is neglected practically by all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare."

Ethics—Spinoza

"The really valuable things in human life are individual—What is of most value in human life is more analogous to whatall the great religious teachers have spoken of."

Power—Bertrand Russell

"The ultimate realities of the universe are at present quite beyond the reach of science, and probably are for ever beyond the comprehension of the human mind."

—Sir James Jeans.

"There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other. It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls."

—Max Planck.

ওপরের কথাগুলো সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, যে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরির নানা স্থানে নানা আকারে লিখেছি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্ণের নির্জনতায়, বনঝোপে ফোটা বনকলমী ফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবনরহস্যের মূল ঊর্ধ্বাকাশে, শাখাপ্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।

মিঃ সিন্‌হার মোটরে আমি ও কল্যাণী ধলভূমগড়ে নুটুর বাসায় এসে দেখি গুট্‌কে মংলা ও গোপাল উপস্থিত। ওখানে বিকেলের দৃশ্যটি বেশ চমৎকার হয়েচে; চা খেয়ে চলি আবার মোটরে, চাকুলিয়া থেকে বর্ষাস্নাত বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মান সমুড়িয়া হয়ে বহরাগড়া ডাকবাংলো পৌঁছে গেলুম। সেদিন কত রাত পর্যন্ত গল্প করি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল খাড়া মৌদা হয়ে বম্বে রোড দিয়ে দুধকুণ্ডী রিজার্ভ ফরেস্টের বাংলোতে। খড়ের ঘাটোয়ালি বাংলো, চারিধারে আম ও ফলবান বৃক্ষের কুঞ্জ। নিকটেই বন আরম্ভ হয়েচে, জানালা দিয়ে চোখে পড়চে—এতোয়া বৃষ্টিস্নাত বনভূমি থেকে বন্য শনের ফুল ও বন্য কলাফুলের মত কি ফুল নিয়ে এল। বৃষ্টি পড়চে—কল্যাণী রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়চে, আমি টেবিলে বসে ভাবচি, এ যেন আমার ক্রীত মৌজা, ওই বন আর এই ঘাটোয়ালি বাংলো যদি আমার থাকতো এমন নির্জন স্থানে তবে লিখবার কত সুবিধাইহোত। কতক্ষণ পরে মিঃ সিন্‌হা বন তদারক করে ফিরে এলেন, আমরাও একটা বনের মধ্যে যেতে যেতে বনবিভাগের রোপিত বোনা গাছ ও শিশুগাছ দেখলাম। বিকেলে বাংলোতে বেড়াতে এলেন হেডমাস্টার

মহাশয়। কাল এখানে মিটিং আছে। কি থই থই করচে space এখানে ডাকবাংলোর আশেপাশে, অস্ত আকাশের রং অতি অদ্ভুত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে দেখি আশ্রমটা একেবারেভেঙে পড়ে গিয়েচে, চালের খড় খসে পড়চে, আমরা সন্ধ্যার পরে আসবার সময় দুটি ছোকরাকে সেখানে দেখলুম—সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তারা কি করচে! ওরা নাকি ওখানে আমোদ করতে এসেচে। এই ভাঙা বাড়িতে এরা গল্প করতে বসে। আমাদের তখনই মনে সন্দেহ হোল—পরে শুনলুম ওরা ওখানে বসে গাঁজা খায়। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কতক্ষণ সাঁকোর ওপর বসে ভগবদ্বিষয়ে চর্চা করি। কত রাত পর্যন্ত গল্প করলুম বাংলোতে বসে।

সকালে মেঘ ও ঠাণ্ডা দিন। মোটরে কল্যাণী, আমি ও মিঃ সিন্‌হা চলে গেলুম কেশরদা বাঁশবনে। এই বিরাট বাঁশবনের রোপণ ইত্যাদি কাজ বনবিভাগ থেকে করা হয়েচে। নুরুল হক Ranger বল্লে—হুজুর, দু হাজার কাঁটালের চারা পোঁতা হয়েচে।

আমরা কেশরদা গ্রামে চলে গেলুম। এই গ্রামটি বাঙালি ও উড়িয়া অধিবাসীদের গ্রাম। কথার মধ্যে অনেক উড়িয়া শব্দ মেশানো। আমাদের মোটর যেতে অনেক লোক এল—বল্লে, এবার খাদ্যের অভাবে বড়ই কষ্ট হয়েচে লোকের। কল্যাণীকে নিয়ে গ্রাম্যদেবী স্বর্ণ বাউড়ির মন্দির দেখি। বহু পুরোনো মূর্তি—নাকমুখ ভাঙা, মন্দিরের আশপাশে অমন ছোট-বড় কত মূর্তি পড়ে আছে। কৃষ্ণা পাণ্ডা বলে ওই মন্দিরের পূজারীর বাড়ি আমরা গিয়ে বসলুম। ওরা কল্যাণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাটির ঘর, দেওয়ালে সুভাষ বসু ও গান্ধীর ছবি। একটা লোকের বোধ হয় জ্বর হয়েচে, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে—বল্লে, ম্যালেরিয়া নয়, কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর এখানে নেই। কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এল ২৫/৩০টি, এরা নাকি ডোমদের ছেলে, সারাদিন ভিক্ষে করে বেড়ায়; এক এক মুঠো সবাই দেয়। চিন্তামণি পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি নিয়ে ছেলেদের এক এক মুঠো মুড়ি সবাইকে দিলে, তারপর তারা কাঠ ও গরু চরানো নিয়ে দুঃখ করলে। আমাকে পাণ্ডাঠাকুর বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিঁড়ে, দই ও দুধ খাওয়ালে। একটা ঘরে নিয়ে গেল, বেতের ঝাঁপি যে কত রয়েচে সারি সারি—পুরীর দোকানের সেই বেতের ঝাঁপির মতো। কোনো ঘরে একটা দরজা জানলা নেই, অন্ধকার সব ঘর। বেলা একটার সময় ওখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে স্নানাহার সেরে নিই। তখনই একটা স্কুলের ছেলে ডাকতে সময় এলে আমরা গেলুম মিটিং-এ। হেড্‌মাস্টারের বাড়িতে চা-ও খাবার খেলুম সাহিত্য সভার পরে। গ্রীক যুবক হেলিওডোরাসের যেন আবির্ভাব হোল বহু শতাব্দী পরে।

সন্ধ্যার সময় কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখার এপারে বেনালি ঘাটে গিয়ে বসলুম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের শৈলমালা, বড় একটা শৈলমালার ওপর প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ ঝুঁকে পড়ে আছে। এপারে মাঠে নিসিন্দে গাছের বেড়ার ধারে বসে আছি। ভগবানের উপাসনা করলুম সেখানে। কল্যাণী গাইলে, যো দেবোহগ্নৌ যোইপ্সু ইত্যাদি উপনিষদের সেই গভীর বাণী।

জ্যোৎস্না উঠেচে—চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ। কিন্তু থই থই করচে মুক্ত space বহরাগড়া ডাকবাংলোর সামনে। কত রাত পর্যন্ত আমরা জেগে বসে থাকি রোজ রোজ। এমনদূরপ্রসারী space আর কোথায়? জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা বেড়াতে গেলাম সেই সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমটির কাছে।

সকালে বহরাগড়া থেকে বেরিয়ে ধলভূমগড়ে নুটুর মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলুম। সেখানে ভাত খেয়ে আবার মোটরে বার হই। একটা কুলির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েচে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে। কল্যাণী তাকে দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লো। ধলভূমগড়ের ক্যাম্পটি বেশ জায়গায়। সামনে দূরবিস্তৃত শালবন ও সবুজ ধানবন। আজ চাকুলিয়ার হাট, সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে বিক্রি করতে আসচে চাকুলিয়ার হাটে। কল্যাণী কেবল বলচে, ঝাঁটা কিনলে হোত!

ওখান থেকে এলুম ঘাটশিলা। বেলা ৫টার সময় চা খেয়ে আবার মোটরে বার হই এবং সুবর্ণরেখা সেতু পার হয়ে রাখা মাইন্‌স মিলিটারি ক্যাম্পে লেফ্‌টেনান্ট জহুরী ও বোসের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সকালে রাখা মাইন্‌স থেকে চা খেয়ে বার হয়ে কালিকাপুর রোড আপিসে এসে গল্পগুজব করি। সেখানে হেলিওডোরাসের গল্পটি পাঠ করি। বেশ জায়গা কালিকাপুর। চাঁইবাসা এলুম বেলা বারোটার সময়ে। দ্বিজুবাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে—খুব মিটিং হোল। সারারাত্রি কোলহান পার্কে রাত জেগে আবৃত্তি ইত্যাদি করা গেল ও শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চলে এলুম মোটরে চক্রধরপুর। দ্বিজুবাবুকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সেই অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে পোড়াহাট

পাহাড় ও বনানীর মধ্যে দিয়ে হেসাডি বাংলোতে পৌঁছলুম। মোটরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল আজ আমাদের দেশের হাটবার ছিল।

মোটরেই ঘুমিয়ে নিলাম। ভোর হোল—চা খেয়ে চলে এলুম হিড্‌নিfalls-এ। স্থানটির কি অপূর্ব গাম্ভীর্য। উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটি পড়চে—চারিপাশে ঘন বনানী, চুনা পাথরের ধ্বসে পড়া চাঁই। স্নান করার সময়ে রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আমি, সুবোধবাবু, মিঃ সিন্‌হা ও পরেশ সান্ন্যাল চলে এলুম। জলপ্রপাতের এপারে পাথরের আসনে বসে লিখচি। জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্চে যুগ-যুগান্তের বাণীর মতো। কি গভীর শোভা! একধারে বনে অসংখ্য Lantana Camera ফুটে আছে। কানের কাছে সুবোধ কেবল বলচে, চলুন, ফিরে যাই, চলুন ফিরে যাই। এই নির্জন বনের মধ্যে এই অপূর্ব গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে সেই সৌন্দর্য-স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করি। এই স্থানে বনের পরিবেশের মধ্যে বসে তাঁর কথাই আগে মনে পড়ে। ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে বনশ্রেণীর নির্জনতা—সত্যিই হরি রায়ের কথা, আমাদের গ্রামের বহু হতভাগ্যের কথা এখানে না মনে হয়ে পারে?

এবার এই কদিনের মধ্যে কত জায়গায় বেড়ালুম। বহরাগড়ার সেই মুক্ত space,কেশরদা গ্রামের সেই উড়িয়া পাড়ার বাড়ি, ধলভূমগড়ের মুক্ত সবুজ ধানের ক্ষেত ও শালবন, রাখা মাইন্‌স-এর মিলিটারি ক্যাম্পে চাঁদ ওঠা রাত্রে বোসের সঙ্গে গল্প করা। সকালে এলুম কালিকাপুর, সেখান থেকে চাঁইবাসা, আবার কল্যকার মত শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চাঁইবাসা থেকে ৪২ মাইল দূরবর্তী হেসাডি বাংলোতে মোটরে আগমন পোড়াহাট অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর আজ এই হিড্‌নি জলপ্রপাতে স্নান সকালবেলা!

চলার গান সার্থক হোক জীবনে। চরৈবেতি।

সামনে চেয়ে দেখি উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙাপাথর ও মাটির ক্ষয়িত পর্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বট অশ্বত্থের মত বনস্পতি, তার ওপরে শরৎ দুপুরের নীল আকাশ, পাশেই বিশাল হিড্‌নি প্রপাতের তুলোর বস্তার মত দ্রুত নীয়মান জলধারা, তার ডানপাশে আবার বন, তার নীচে ল্যান্টানা ক্যামেরার জংলী রঙিন ফুল। ছায়া পড়েচে মেঘের—অন্য কোনো শব্দ নেই, শুধু জলপতন ধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ্য আর বনবিহঙ্গ কাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এই কোয়ার্টজাইটের চাঁই বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা— এরাই বড়।

পরেশবাবু সেখানে বসে গান গাইছেন। মিঃ সিন্‌হা ডায়েরি লিখচেন—সুবোধ সর্বদা ব্যস্ত, সে চলে গিয়েচে মোটরে। কল্যাণীকে একবার আনতে হবে এখানে। কতদূর এখান থেকে বারাকপুর, কুঠির মাঠের আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা, কূলে কূলে ভরা ইছামতী ও তার তীরে কাশের ফুল ফোটা চরভূমি। সেই আমাদের নৌকো করে বনগাঁয়ে যাওয়া আজ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় না কি!

সত্যিই মনে হচ্চে কে যেন আমার হাত ধরে দেশে-বিদেশে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন নতুবা তো গ্রামে বসে বারিক মণ্ডল ও ফণিকাকার সঙ্গে ধান বোনার গল্প করতাম, হরিপদদার সঙ্গে মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র করতাম।

ভগবানকে এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর কি চমৎকার রাস্তা দিয়ে মোটরে এসে বসলুম। সুবোধবাবু যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাস্তা এটা নয়, এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া—এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। যেন ঋষির পবিত্র তপোবনের স্থান। তারপর চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শোভাও অদ্ভুত। মোটর চলচে কালকার রাত্রের বনভূমি ভেদ করে। বনকলমী ফুল আরও কত কি ফুল বনের মধ্যে ফুটেচে এই বর্ষাশেষে। ২০০০ হাজার ফুট উঁচু টেবো বাংলোর ধার দিয়ে গাড়ি চলেচে—পাশে বর্ষার উদ্দাম এক পাহাড়ি নদীর গৈরিক জলধারা। শিউলি গাছ মুকুলিত হয়েচে এ বনেও। সুবোধকে বলি—সাহিত্যিকদের জন্য আপনারা PW.D. থেকে এখানেএকটা বাংলো তৈরি করে দিন না। যেখান থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়, সেখানেই একথা উঠলো।জলতেষ্টা পেয়েছিল, রাঁচি রোডে নেমে নাক্‌টি বাংলোতে এসে গাড়ি থামিয়ে জলের সন্ধানে গেল ড্রাইভার। বেলা তখন একটা, কিন্তু ডাকবাংলোর চৌকিদারের টিকি দেখা গেল না কোথাও। তখন জলের আশা ছেড়ে দিয়ে চক্রধরপুরে এসে জল খাওয়া গেল, নগেনবাবুর ছেলে জল নিয়ে এল।

রাত্রে সুবোধবাবুর বাড়ি দু'চারটি ভদ্রলোকের সামনে গল্প পাঠ করলুম।

আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার। পরশু রাত্রে সারারাত্রি হই-হই-এর পরে খুব আরামের ঘুম হয়েচে। সুবোধ ও অবিনাশবাবু এসে চা খাওয়ার সময়ে গল্প করলেন—চালের দর, ট্রেনে ভীষণ ভিড়। প্রেমচাঁদের গল্প 'বেটিকা ধন' ও 'সুহাগ কী শাড়ি' দুটি হিন্দিতে পাঠ করা হোল চায়ের টেবিলে। এখানে বেশ সাহিত্যিক আবহাওয়া। মনে পড়চে কাল এ সময়ে সৌন্দর্যময় বনভূমির মধ্যে বসে ছিলাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র, রাঙা মাটি ও চুনা পাথরের ধ্বস্ নামা খাড়া দেওয়াল, সেই অজস্র Lantana পুষ্প। আজ আকাশ খুব নীল, হেসাডি ডাকবাংলোতে কাটানোর উপযুক্ত দিন যেন এগুলি।

সন্ধ্যায় সুবোধবাবুর বাড়িতে চায়ের আসরে আমার গল্প দুটি পড়া হোল—গ্রীক যুবক হেলিওডোরাস কি করে বাসুদেবের ভক্ত হোল ও 'ভিড়'। রাত্রে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোল্হান সুপারিন্টেডেন্ট মিঃ কে মিত্র, আরও কয়েকটি উকিল উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে উঠে আমি ও মিঃ সিন্হা চা খেয়ে হিন্দি সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের বই পড়ি। জগৎ সিং এসে 'ভাগ্তে ভাগ্তে' অর্থাৎ 'আমি বার বার বলচি' গল্পটি করলেন। এই গল্পটি ওঁর মুখে কতবার শুনেচি—যতবার শুনি, নতুন লাগে প্রতিবার। সুবোধবাবু এসে বল্লে—সে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কেম্পের গাড়িতে টাটা চলে যাচ্ছে। একটু পরে ঘাটশিলা থেকে মুকুল চক্কত্তি এল। তার পর আমরা মোটরে বার হয়ে ভবানী সিংহের বাড়ি যাই। গত ৩০শে চৈত্র এঁর বাড়িতে কম্পাউন্ডে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম চাঁইবাসার বাইরে অপুর্ব মুক্ত space-এর বাহার, একদিকে নীল শৈলমালা—বরকেলা ও সেরাইকেলা। আমার মনে হলো সেরাইকেলা শৈলমালাই বরাবর দিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরার পাহাড়ে শেষ হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। মস্ত বড় হাট বসেচেচাঁইবাসায়—বাসমতী চাল বিক্রি হচ্ছে ৩২্ টাকা মণ। কিন্তু অত সুন্দর চাল।

সেই সন্ধ্যায় ট্রেনে এসে টাটানগর পৌঁছে গেলুম ও বাদাম পাহাড়ের যে গাড়িখানা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তাতেই শুয়ে রইলুম। ছোটনাগপুরের অধিবাসী হয়ে গিয়েচি আজকাল। বরকাকানা ও মুরী থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস আসবে তারই সন্ধানে বার বার গাড়ি থেকে নামচি কিন্তু গাড়ি পেলুম না। ভোরে বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা পৌঁছুই। আসানবনী ছাড়িয়ে দূর থেকে আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশ দেখে মনে কি আনন্দ! বাড়ি এসেচি মনে হোল বহুদিন প্রবাস যাপনের পর। ওই সেই মিলিটারি ক্যাম্প রাখা মাইন্স-এর—শনিবার রাত্রে যেখানে লেফ্টেনান্ট জহুরী ও বোসের অতিথি হয়ে রাত কাটিয়েছিলাম। গালুডির বিষ্ণু প্রধান যাচ্চে এ গাড়িতে, সে নমস্কার করে বল্লে, কোথায় নামবেন? আমি বল্লাম, ঘাটশিলায়।

রেডিও বক্তৃতা দিয়ে বারাকপুর গিয়েছিলুম একদিনের জন্যে। শিউলি ফুল ফুটচে দেখে এসেচি। বেশ লাগলো একটা দিন। তবে ম্যালেরিয়াতে সবাই ভুগচে। ফণি রায় ও আমি একসঙ্গে বেলা দুটোর গাড়িতে চলে এলুম। ঘাটশিলা যেদিন এলুম, সেদিন সুরেশবাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

ক'দিন খুব জ্যোৎস্না। আজ চতুর্দশী, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত দ্বিজেন মল্লিকের বাড়ি বসে গল্প করলুম—তারপর মনে হোল আজ জ্যোৎস্নাটি মাটি করবো? কোথাও যাবো না? অত রাত্রে সেই অপূর্ব জ্যোৎস্নারাতে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলুম ফুলডুংরি।

রাত ন'টা। বেশি রাত্রির জ্যোৎস্না। আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে পাথরের ওপর গিয়ে যোগাসনে বসলুম। দূরে বুরুড়ি ও বাসাডেরা পাহাড় ও বনানীর মাথায় একটি নক্ষত্র অনন্তের হৃদ্স্পন্দনের মত টিপ টিপ করে জ্বলচে। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও ফুলডুংরি পাহাড়ের সে রূপে মন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠেচে। মুখে কথা বলতে পারি নে—এমন একটি অবশ, আড়ষ্ট ভাব। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যেদিকে চাই—জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রী যেন জন্মমরণ-ভীতি-ভ্রংশী কোন্ মহাদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের আনন্দে নিস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, নির্জন প্রান্তর—এত রাত্রে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি রাত্রে—মানুষের গলার সুর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যায় আমার। সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা এখানে বসলে ভয় হয়—এই বুঝি কোন্ কলকাতার চেন্জার বাবুরা পুত্রপরিবারসহ হাওয়া খেতে এসে পড়ে কলকোলাহল করতে করতে! এত

রাত্রে মন একেবারে নিরুদ্বেগ সেদিক থেকে। বেশ জানি এ সময় জনপ্রাণী আসবে না এদিকে। মন শঙ্কাশূন্য ও নিরুদ্বেগ না হোলে কি প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় ঠিকমত?

আমি ক'দিন ধরে ভাবচি এমনি সব নির্জন স্থানের কথা। সেদিন পাঠকবাবু বলছিল, রায়পুর (C.P.) থেকে ১৮৪ মাইল দূরে বাস্তার স্টেটের রাজধানী জগৎদলপুরের গল্প। ধাম্‌তারি ছাড়িয়ে (রায়পুর থেকে ৫০ মাইল দূর) ঘন বন পথের দুধারে—এমন এক বনের মধ্যে মানববসতি থেকে বহুদূরে খুব বড় বড় গাছের ছায়ায়শিলাসনে বসে আছি, সকাল বেলাটি, অসংখ্য পক্ষীকুলের কলরব, অদূরে স্নিগ্ধসলিলা গোদাবরী (ওখানে অবিশ্যি গোদাবরী নেই, আমার কল্পনা) কুলুকুলু রবে উপলবন্ধুর পথে বনপাদপের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেচে। নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ আমার শিলাসনের কাছে কাছে তৃণ আহরণ করচে—এমনি একটি ছবি প্রায়ই মনে আসে।

কাল বিকেলে ফণি এল—ওর সঙ্গে অমরবাবু এসেচেন কিনা দেখতে গেলুম। পথে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা—ব্রাউন বল্লে, অমরবাবু আসেনি। তারপর রেলের বাঁধের ওপর দুজনে বসলুম, বেশ চাঁদ উঠেচে। পরশু কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

আজ মিঃ সিন্‌হা চিঠি লিখেচেন তাঁর সঙ্গে সারেন্ডা বেড়াতে যাবার জন্যে। ৮ই তারিখে এখান থেকে চাঁইবাসা যাবো—সেখান থেকে সারেন্ডা রওনা হবো। সারেন্ডা বিখ্যাত অরণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি অপূর্ব। সিংভূমের বিখ্যাত বন। ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

ঘাটশিলা থেকে বন ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে রাত ১১টার গাড়িতে চাঁইবাসা রওনা হই। সঙ্গে রইল ওভারসিয়ার নসিরাম। বেশ শীত রাত্রে। সিন্‌হা সারেন্ডা বনের ভার পেয়েছিলেন এ মাসে। গোটা বনটা ঘুরে আসবেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরই আহ্বানে আসা।

চাঁইবাসাতে সুবোধবাবুর আপিসে বসে সকালে চা খেলুম ও অনেক গল্পগুজব হোল। কাল বেলা একটার সময় চাঁইবাসা থেকে রওনা হয়ে এলুম হাটগামারিয়ায় পরেশ সান্যালের ওখানে। তারপর বনপথে মোটর ছুটলো। টক্‌টকে লাল মাটির পথ ও দুধারে ঘন জঙ্গল। আগে নোয়ামুণ্ডী, পরে এলুম গুয়া। দুই জায়গাতেই টাটা ও আর একটি কোম্পানির লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েচে—লোহার পাহাড় কেটে লৌহপ্রস্তর টান টন গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। গুয়াতে একটি বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি চা-পানান্তে আবার ঘনতর জঙ্গলের পথে এলুম কুম্‌ডি বাংলোতে। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কারো নদী পার হয়ে অদ্ভুত বনশোভা—ফুটন্ত পিটুনিয়া ও বন্য কাঞ্চনের প্রাচুর্যের মধ্যে সন্ধ্যায় গাড়ি কুম্‌ডি পৌঁছে গেল। ডাকবাংলোর কাছেই বনের ভেতর দিয়ে কোইনা নদী কলকল শব্দে বয়ে চলেচে। আজ শুক্লা চতুর্দশী—কাল রাসপূর্ণিমা। জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পায়ে হেঁটে কোইনা নদী পার হয়ে বনের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। লোকালয় নেই কোথাও—গুয়া ছাড়িয়ে ষোল মাইল অবিচ্ছেদে অরণ্যপথ দিয়ে এসে বনবিভাগের এই বাংলো বনেরপথে বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম সেই বিরাট অরণ্যের প্রাচীন বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে শুক্লা চতুর্দশীর জ্যোৎস্নার রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত বিশাল অরণ্যানী যেন প্রাচীন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। এক-একটা গাছ নাকি ১৫০/১৬০ বছরের। আমার প্রপিতামহের শৈশবেও এ সব গাছ এমনিই ছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শিশির পড়চে। কারো নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে তারপর বাংলোতেফিরে এলুম। বন্য হস্তীর ভয়ে বেশিক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বসতে সাহস হোল না।

আজ বেলা ১২টার সময়ে মোটরে রওনা হয়ে মাইল চারেক গিয়ে এক বনের মধ্যে গাড়ি রেখে শশাংদা বুরু আরোহণ শুরু করলাম। শশাংদা বুরু সারেন্ডা অরণ্যের সর্বোচ্চ পাহাড়—উচ্চতা ৩০৩৮ ফুট। প্রায় কালিম্পং-এর উচ্চতা। মোটর ছেড়ে ৫/৬ জন লোক বনপথে পাহাড়ের গা কেটে বনবিভাগের তৈরি রাস্তা বেয়ে চলেচি। একদিকে শৈলগাত্রে নিবিড় অরণ্য, দুটি ঝর্ণা বনের মধ্যে কলধ্বনি করে নেমে চলেচে। বনের মধ্যে বন্য কদলী-বৃক্ষ—ঠিক যেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মত। একটা স্থানে এসে পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। খাড়া উঠেচে, অতি দুরারোহ শৈলগাত্র, নিবিড় বনের মধ্যে সোজা হয়ে উঠে চলেচে। একটা বনমোরগ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে বনের মধ্যে পালালো। বড় বড় মোটা মোটা শাল, ধ, রকম, আসান, লুদাস, পানজন; আন্দী; বন্য কাঞ্চন; টীহড় লতা আরও শ' দুশো রকমের গাছ ও লতাপাতা। ৬০-৭০ বছরের পুরোনো টীহড় লতা (Bohinia Vallai) গাছের কাছে ঠেলে উঠেচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের ও বনের ফাঁকে দূরের ছোট বড় পাহাড় চোখে পড়ে। চাড়্ডা গাঢ়া নামক পার্বত্য ঝর্ণার কলকল জলপতন ধ্বনি বনে বনে, স্তরে স্তরে যেন নেমে চলেচে নীচের দিকে—উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে এ গম্ভীর শব্দ একটি উদাত্ত সংগীতের সৃষ্টি করেচে। বড়

ক্লান্তি হচ্চে। এত দুরারোহ পাহাড়—শেষের দিক যেন আরও বেশি। পা যদি সামান্য একটু পাথরেও আটকে যায়—তাও যেন তুলে ফেলতে কষ্ট হচ্চে। ঘন ঘন হাঁপাচ্চি—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একরকম যন্ত্রণা হচ্চে। ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম। সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে সঙ্গের বনবিভাগের গার্ড কুড়ুল দিয়ে Bohinia Vallai-র একটা মোটা লতা কেটে দিল। Forest Officer ও রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্তকে একটি গল্প শোনালুম। দুজনে শুনে খুব খুশি। যেখানে চাড্ডা ঝর্ণা পড়চে—সেখানে নালা পার হবার সময়ে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—Take courage in both hands, দাদা। আমি বললুম—একটা হাত আটকানো—লাঠি ধরে আছি যে! প্রকাণ্ড আম গাছ বনের মধ্যে এই স্থানে দেখলুম। আজ গোপালনগরের হাট, এতক্ষণ হাটে চলেচে লোকে।

ওপরে উঠে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এলুম। সেখানে নরম কাদায় কত রকম পশুর পদচিহ্ন। হো ফরেস্ট গার্ডকে আমরা ডেকে বললুম—কি কি জঙ্গলের জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে দেখ। সে দেখে বল্লে—হুজুর হাতি, বাইসন, সম্বর, বুনো শূয়োর বেশি।

আমি বললাম—বাঘের পায়ের দাগ?

—নেই হুজুর। বাঘ এখন এখানে জল খেতে আসবে না। একটা গাছের ছায়ায় গাছের ডাল-পালা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। চা পান করে বেলা ৪টার সময় রাসবিহারীবাবু বল্লেন—চলুন, বড্ড হাতির ভয় বেলা পড়লে। তারপর এখানে কি ভাবেএকটা বাঘের গর্জন শুনেছিলেন, সে গল্প করলেন। হো কুলি বললে—বাবু রাৎ আনা—উনি বুঝতে পারেন না। শেষে দেখলেন কুলি পিছিয়ে পড়চে। তখন শুনলেন বাঘ ডাকচে বনের মধ্যে। আর একবার একটা হাতির হাতে পড়েছিলেন, কুলি ছিল সঙ্গে। সে ওঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর দিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। আসবার সময় আরও অদ্ভুত দৃশ্য। হল্‌দে রোদ্দুর পাহাড়ের মাথায়, আরণ্য-বনস্পতিশীর্ষে। নামচি, নামচি—সেই দুরারোহ পথে হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্তে। রোদ কমে এল। বনের ছায়া নিবিড়তর হচ্চে। এক জায়গায় barking deer ডাকচে, ঠিক কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে। বনের আমলকী পাড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে এলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ দেখলুম এক স্থানে।

নীচে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে এসে আমাদের মোটরের কাছে এলুম। গুয়া রেল স্টেশন থেকে শশাংদাবুরু প্রায় ১৬॥মাইল। এ অপূর্ব বনশোভা যদি কেউ দেখতে যান তবে হেঁটে তাকে আসতে হবে এই ১৬॥ মাইল পথ। কোথাও কোনো লোকালয় নেই—শশাংদাবুরু মালভূমি বা তার আশপাশে কোথাও একখানা বন্যগ্রাম পর্যন্ত নেই। পথে যথেষ্ট বন্য হস্তীর ভয়। আমরা মোটরে আসচি কুম্‌ডিতে শশাংদাবরু থেকে নেমে—হঠাৎ ফরেস্ট গার্ড হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—হাতি। হাতি!

আমরা সকলে চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে শৈলসানুর বনে একটা লাল রং-এর ধুলোমাখা হাতি বনের মধ্যে আমাদের দিকে পিছন ফিরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবলই ভাবছি শশাংদাবুরুর ওপরে কেউ যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশহয়।

আজ আবার রাসপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্চি—পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের মাথায়। গোপালনগরের হাট করে বাড়ি ফিরচে পঞ্চা মাস্টার ওর গরুর গাড়িতে। বাংলোটি চমৎকার স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন বন। পাশেই দিনরাত শুনচি কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর ধারে একটা শালগাছের শুক্‌নো গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলুম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। জল চক্ চক্ করচে জ্যোৎস্নায়।

আজ ভগবানের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেচি শশাংদাবুরুর শৈলারণ্যে—তিনিই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েচেন। প্রাচীন বনস্পতিতে তার গম্ভীর রূপ—আবার বন্য লুদাম, বন্য চিরেতার অতি সুন্দর পুষ্পে তার কমনীয় রূপ। তিনি অব্যক্ত, অনন্ত।

আমার মনে হয় সারান্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহু দিনের। তাই তিনিই দয়া করে যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই চাড়্ডা ঝর্ণার জলপতনধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ—সেই সুগন্ধি বন্য কুসুমরাজি—এ সব যদি আমি নাদেখতুম, মনের মধ্যে এর ছবি যদি না এঁকে রাখতুম—তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেত। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।

কি চমৎকার কমলালেবু কুমড়ি বনবিভাগের বাংলো-সংলগ্ন বাগানে। ফলভারে গাছ অবনত হওয়া বলে—সত্যিই তাই। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সকালে খেয়ে দেয়ে আমরা বনপথে থলকোবাদ রওনা হলুম। সারান্ডা অঞ্চলের বনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই—৩৩০ বর্গ মাইল (ছয় লক্ষ একর) ব্যাপী ছেদহীন নিবিড় অরণ্য। কোইনা নদী পার হয়ে কিছুদূরে বড় বড় শাল গাছ দেখা গেল। পথে বনে সত্যিই চাঁপাফুলের গাছ দেখা গেল—ভেড়্লেডিয়া নয়, সত্যিই চাঁপা। কোদালিবাদ নামক বন্য গ্রামে একটি বনান্তবর্তী ক্ষুদ্র কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ছিলেন ১৯২৬ সালে—যখন তিনি প্রথম বনবিভাগে ঢোকেন। আমরা সেই কুটিরে গেলুম—বন এসে পৌঁছেচে ঘরের উঠানে। চারিধারে বন ও পাহাড়। মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—অদূরে বনে barking deer ডাকতো—কত শুনেছি! বিকেল ৪টার সময় থলকোবাদ বাংলোতে এসে গাড়ি থেকে নামলুম। জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি এই অতি সুন্দর বাংলোটি অবস্থিত। আমরা পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউন্ডে বসে চা খাচ্চি, নিকটের শৈলারণ্যে কর্কশ স্বরে একটা পাখি ডেকে উঠলো। বিজয় আরদালী বল্লে—ময়ূর। সে এই সারান্ডা বিভাগে অনেকদিন আছে। তারপর একটা গম্ভীর শব্দ শোনা গেল মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বর। আমি বাংলোর পিছনে একটা নির্জন স্থানে গিয়ে খানিকটা বসলুম। পাথর বেরিয়ে আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। অজস্র বনতুলসীর গাছ। সন্ধ্যার আগে আমরা থলকোবাদ গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। আমি, রাসবিহারী গুপ্ত ও মিঃ সিন্‌হা। ঘন বন, অন্ধকারে ঝিঁঝি পোকা ডাকচে। ওঁরা প্রথমটা যেতে চাননি হাতির ভয়ে। সারান্ডা অরণ্য বন্যহস্তীতে পরিপূর্ণ। একজন কর্মচারি বলছিল বাংলোর কম্পাউন্ডে রোজ রাত্রে হাতি আসে। যেখানে সাইনবোর্ডটা আছে, সেখানে তিন দিন আগে হাতি এসে সাইনবোর্ডখানা উপড়ে ফেলেছিল খুঁটিসুদ্ধ। আবার পোঁতা হয়েছে। বনের মধ্যে আমরা বসে আছি, সেই ঘন-অন্ধকারে ভরা বনভূমির কি রূপ! ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে, এই সময়ে। চাঁদ উঠলো একটু পরে দূরে বনের মাথায়। রাসবিহারীবাবু বল্লেন—আজ দেখচি পূর্ণিমা। আমিও লক্ষ্য করলুম পূর্ণচন্দ্রই বটে। যদিও ভেবেছিলুম কালই পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল। দুটি লোক বনের মধ্যে সুঁড়িপথ বেয়ে অন্ধকারে আসছিল—আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো। কাছে এলে বল্লুম—কোথায় গিয়েছিলি? তারা বল্লে—বাজারে।

—কোথায় বাজার?

—বালজুড়ি।

—কতদূর?

—পাঁচ ক্রোশ বাবু। বোনাইয়ের মধ্যে।

শুনলুম এই অরণ্যের দক্ষিণে কেউন্‌ঝর ও বোনাই স্টেট্—পশ্চিমে গাংপুর। উড়িষ্যার বনপর্বত-সঙ্কুল দুটি রাজ্য। কি চমৎকার পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের ফাঁক দিয়ে। পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি বনের গাছের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত শোভা হয়েচে। এ বারাকপুরের বাঁশবন নয়—শ্বপদসঙ্কুল বন্যগজ-অধ্যষিত ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমি সারান্ডা। সিংভূমের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিবিড়তম ও ঘনতম অরণ্য।

কয়েকটি গাড়োয়ান Bengal Timber Co.-এর কাঠ বোঝাই করে থলকোবাদ গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় রেঁধে খাচ্চে। আমরা গিয়ে আলাপ করলুম। তাদের নাম রিকসা, নীলা, সল মাহাতো। বাড়ি জেরাইকেলা। দিন এক টাকা হিসাবে পায় গাড়িভাড়া বাবদ। ঘন-জঙ্গলের পথে প্রত্যেক মাসে তিনবার আসে ভাড়া বইতে। ছ'দিন করে থাকে।

আমরা বল্লুম—কি রাঁধচিস?

—ভাত আর দাল।

—আর কিছু?

—না বাবু।

বনের মধ্যে রওনা হবে শেষরাত্রে উঠে। এই ভীষণ শীতে শালগাছের তলায় মুক্ত হাওয়ায় শুয়ে রাত কাটাবে। বিছানা নেই—একখানা বন্য খেজুরের ছেঁড়া চেটাই ও আধছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথা সম্বল। শুনলুম পথে বাঘের উপদ্রব আছে। গত বৎসর চলন্ত গাড়ি থেকে বাঘে অনেক বলদ নিয়ে পালিয়েছিল। রাসবিহারীবাবু এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বলপুরের অরণ্যে সকাল আটটার সময় গরুর গাড়ি থেকে বলদ নিয়ে গিয়েচে বাঘে—তিনি জানেন, স্বচক্ষে দেখেছেন।

ভাবলুম—এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখপূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ি চালাবে—মজুরি কত, না দৈনিক এক টাকা।

অনেক রাত্রে বাংলোর বাইরে চেয়ার পেতে বসলুম। অদূরে গম্ভীর শৈলারণ্যের জ্যোৎস্নাস্নাত রূপ কি বর্ণনা করা যায়?ভগবানকে যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চাও, তবে এইখানে এই পটভূমিতে সেই বিরাটের রূপ ধ্যান কর—লোকালয়ের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমির প্রান্তে। এই হিমবর্ষী আকাশতলে ওই দরিদ্র গাড়োয়ানদের ছেঁড়া চেটাইতে শুয়ে রাত কাটাও—একটা প্রবন্ধ লিখব, প্রবন্ধটার নাম দেবো—'বনান্তে সন্ধ্যা'। ভগবানের সৌন্দর্য যে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই, সেদিকেই বিরাটের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর হাতের কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে। জয় হোক তাঁর।

এক জায়গায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে জনকতক লোক রেঁধে খাচ্চে সন্ধ্যাবেলা। ওদের হো ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারীবাবু। ওরা হো ভাষাতেই জবাব দিলে।শুনলাম ওদের বলে 'আরাকাশি', বোনাই ও গাংপুর স্টেট্ থেকে আসে আমের কাঠ চেরাই করতে। ওদের পাতার কুঁড়ের কাছে একটা বিরাট আট ফুট পরিধি-বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায়ও প্রায় ৫০/৬০ ফুট। বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে।

গভীর রাত্রি। আমরা বাংলোর বাইরে ত্রিশ গজ আন্দাজ গেলুম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথার ওপর উঠেচে। একটা উঁচু টিলা—অথবা সেটা এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া—সেখানে ঘাস নেই, শুকনো খটখটে জায়গা—মাঝখান দিয়ে পথ, দুধারে শাল ও আমলকী বন। আজ বৈকালে যেখানে গিয়ে বসেছিলুম সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোৎস্নার বর্ণনা নেই—এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও অদূরবর্তী শৈলমালার বর্ণনা নেই। কে দিতে পারে এর বর্ণনা? গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দঘন বনের কোথায় অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি। এ ধ্বনি বনের মধ্যে চাড্ডা ঝর্ণায় শুনেছি শশাংদাবুরু আরোহণের সময়, এ শব্দ শুনেছি কাল ও পরশু রাত্রে কোইনা নদীতে ঘন বনে—কুম্ডি বাংলোতে—আবার থলকোবাদ বাংলোতেও শুনচি। কোথায় একটা সম্বর হরিণ পূর্বদিকের পাহাড়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে। মাথার ওপরে দু-চারটা নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্চে।

টিলার দক্ষিণে যে শালবন, তার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করচে। ডাইনে একটা গাছের গায়ে বন্যহস্তী তাড়ানোর উঁচু মাচা। এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্তী অপরিচিত পাহাড়ি ঝর্ণার জলপতনধ্বনি ও দু-একটা নৈশপাখির কুজন দ্বারা দ্বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয়মন জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে। মুখে কিছু বলা যায় না। পনেরো মিনিট বাইরে ছিলাম এই পৌর্ণমাসী রজনীর মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে বাংলো থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বাংলোর সাদা বাড়িটা বা কোনো লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় একা আমি এই জনহীন গভীর বনভূমিতে এই গভীর রাত্রে আকাশ ও বনের দিকে চেয়ে আছি—এই পনেরো মিনিটে পনেরো বছরের জ্ঞান সঞ্চয় হোল। চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক।

সকালে উঠেচি—মিঃ সিন্‌হা ডেকে বল্লেন—ময়ূর দেখুন। পাশের উপত্যকায় মাঠের মধ্যে ছ-সাতটি বড় বড় ময়ূর দেখে খুশি হই। বেলা দশটার সময় মোটরে বার হয়ে আমরা 'কোদালিবাদ ১৫-এর' ঘন জঙ্গলে গেলুম। কায়াউলি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রথমে পেলুম। বড় বড় পাথর বাঁধানো জায়গা। পাথরের ওপর দিয়ে নদী বয়ে চলেচে। বনের পথে নামচি উঠচি—দুধারে শৈলশ্রেণী—আবার এক ঝর্ণা। তারপর কোইনা নদী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোইনা নদীর পাষাণময় তীরের ঘনবনের ধারে বসে আমি ১৯৩১ সালের ব্ল্যাকউড্স ম্যাগাজিনে 'Cast adrift in the woods'বলে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ঝোপ ও লতা দিয়ে তৈরি নিবিড় বন যেন বাংলাদেশের বনের পদ্ধতি-বিশিষ্ট—যেন কুঠির মাঠের বন—শুধু শাল আসান নয়। পথে তিন রকমের ফুল অজস্র ফুটে দেবকাঞ্চন, বন্য পিটুনিয়া ও ঈষৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক রকমের হলদে ফুল, বেশ দেখতে। কামিনী ফুলের গাছ জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট। সকালে চমৎকার আলোছায়ার খেলা জঙ্গলে—নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোক এসে পড়েচে, বন্য-পক্ষীর কূজন, কোইনা নদীর মর্মর কলতান, বামে নদীর ওপারে প্রায় দুশো গজ দূরে পাহাড়শ্রেণী কি সুন্দর লাগছিল। ভগবানকে মন থেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। আরও কিছুদূরে গিয়ে কোইনা নদী আর একবার ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়ল—এখানে একদিকের পাড় উঁচু ও প্রস্তরময়, নিবিড় বনাবৃত। এখানে অনেকক্ষণ বসলুম। কমলালেবু দিলেন মিঃ গুপ্ত। কি পাখির গান! কি বনানী-শোভা! ভূতধাত্রী ধরিত্রী অপূর্বরূপে সজ্জিতা এই ঘনবন পর্বতান্তরালে।

আজ সকালে উঠে ঘন বনের পথে মিঃ সিন্‌হা, মিঃ গুপ্ত ও আমি রওনা হই বোনাই স্টেটের সীমানা দেখতে। পথে গভীর অরণ্যের মধ্যে কোইনা নদী (যার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছে কুম্‌ডি বাংলোর পাশে) কুলুকুলু তানে বয়ে চলেচে, হঠাৎ আমার নজর পড়লো প্রস্তরবহুল একটি চমৎকার জায়গা কোইনা নদীর মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বনের মধ্যে যেখানেই এসব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে গতিপথে নানা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী, পদে পদে রমণীয় শোভা বিতরণ করতে করতে চলে। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, বিহঙ্গকাকলী, সুগন্ধি তরুচ্ছায়া, মর্মর জল-কলতান—যাকে বলে বিউটি স্পট্ (beauty spot) তার আর বাকি রইল কি? কিন্তু এ জায়গার বিশেষত্ব এই, এখানে নদীর মধ্যে যে চড়া সৃষ্ট হয়েচে,যেখানে বালি, বড় জোর পাথরের নুড়ি কি দু-দশখানা পাথরের চাঁই থাকা উচিত ছিল, সেখানে বহুদূর পর্যন্ত স্থান মাকড়া পাথর (Labrite) দিয়ে যেন বাঁধানো। কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোইনা নদী এমনি বয়ে চলে মাটি ক্ষইয়ে তুলে ফেলে তলাকার পাথর বার করে ফেলেচে, সে পাথরেরও নানাস্থানে মৌচাকের মত অসংখ্য গর্ত সৃষ্টি করেচে। তার প্রায় ৫০/৬০ হাত চওড়া, ১৫০ হাত লম্বা এক সমতল পাষাণের চত্বর-মত নদীর খাতের মধ্যে, কে যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচে। ঘন বন-এর উভয় পাশে, থলকোবাদ নিজেই বনের মধ্যে—সেখান থেকে ছ' মাইল এসেচি মোটরে ঘনতর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে— তারপর এই সুন্দর ছায়াভরা, পাষাণময়, জলকলতানমুখর, জনহীন স্থানটি। আরও কিছুদূরে একটি বন্যগ্রাম, নাম করমপদা, তার ওধারে নুয়াগাঁও ও বনগাঁও বলে আরও দুটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এসব নয়, বনবিভাগ থেকে এদের বিনা খাজনায় চাষের জমি দেওয়া হয়। ফসল ঘরে তুলতেপারে না বন্যহস্তী ও সম্বর হরিণের উপদ্রবে। বনগাঁও গ্রামের দৃশ্যটি ছবির মত। গাড়ি থেকে নেমে আমরা একটা ছোট্ট টিলার ওপরে বসলুম শালগাছের ছায়ায়, আমাদের সামনে ক্ষুদ্র কোইনা নদী সরু নালার মত বয়ে চলেচে, কারণ এই নদীর উৎপত্তিস্থান অদূরবর্তী বোনাই সীমান্তের শৈলমালা, এখান থেকে মাইল খানেক মাত্র দূর। নদীর ওপারে ঢেউ-খেলানো জমি পাহাড়ের মত উঠে গিয়েচে, তার গায়ে হরিবর্ণ ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরথীর ক্ষেত, দশটা খড় ও মাটির কুটির, গরু মহিষ চরচে মাঠে, মেয়েরা কাজ করচে ক্ষেতে, ওদের সকলের পেছনে কেউনঝর রাজ্যের ঘনবনাবৃত শৈলমালা। স্থানটি গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং চারিদিকে দূরে দূরে পাহাড়। আরও এগিয়ে গেলুম বোনাই রাজ্য ও সারেন্ডা বনের সীমান্তে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাঁচশ' ফুট জায়গা ফাঁকা, সব গাছ কেটে সীমা চিহ্নিত করা হয়েচে। তারপর আমরা নেমে গেলুম—ভাবলুম, বোনাই স্টেট্ একবার বেড়িয়ে আসা যাক না। রাস্তা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—কোনোই পার্থক্য নেই সারেন্ডা অরণ্যের সঙ্গে। মোটা মোটা লতা বড় বড় প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণীকে পরস্পর সংযুক্ত করেচে, ফাঁক রাখেনি কোথাও, কালকার সেই হলুদ ফুল পথের ধারে আলো করে ফুটে আছে, নিস্তব্ধতা তেমনি গভীর, যেমন কিছু পূর্বে সারেন্ডাতে দেখেচি।

নেমে যেতে আমাদের সামনে পড়লো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী দ্বারা ঘেরা। শুধুই বনস্পতির সমারোহ, শুধুই বনশীর্ষ, শুধুই সবুজের মেলা। একটা কুসুম গাছের তলায় আমরা বসলুম। বনের মধ্যে কর্কশস্বরে কি পাখি ডাকচে। ফরেস্ট গার্ডকে বললুম—ময়ূর? সে বল্লে—নেহি হুজুর, ধনেশ পাখি। বড় বড় ঠোঁটওয়ালা ধনেশ পাখি দেখেচি বটে, কিন্তু দেখেচি কলকাতায় খাঁচায় বন্দী অবস্থায়। এমন ঘন বনে তার আদিম বাসস্থানে, উড়িষ্যার বোনাই স্টেটের অরণ্যে ওর ডাক শুনবো, এ ভাগ্য কখনও হয়নি। ভেবে দেখলুম যেখানে বসে আছি, নিকটতম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল—এও জীবনে কখনও ঘটেনি! কলকাতায় যেতে হোলে এখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে গুয়া বা জেরাইকেলা গিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে।

বসে আছি, আমাদের সামনের সরু-পায়ে চলা পথ দিয়ে এক কৃষ্ণকায় তরুণ দেবতার মত যুবক, হাতে-বোনা খাটো মোটা কাপড় পরনে, এক হাতে তীরধনু, অন্য হাতে একটা পুঁটুলিতে কি বাঁধা—মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুলে কাঠের চিরুনি গোঁজা—ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে কোথায় চলেচে। আমরা ডাকলম ওকে। সে বল্লে গির্জায় যাচ্চে, বড় ব্যস্ত। হো ভাষায় বল্লে। মিঃ গুপ্ত তার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং সে কি বলচে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। নাম তার মসি, কি তার হাসি, কি তার মুখের সুন্দর ভঙ্গি। তাকে না দেখলে এই গভীর অরণ্য-প্রদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। প্রাচীন দিনের মৌন অরণ্য যেন মুখর হয়ে উঠলো ওর মুখের ভাষায়। ভাল লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দ-চঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। নিকটেই কুন্তী বলে একটা গ্রামআছে বোনাই স্টেটের। পথে টেতী নায়েক বল্লে—গাঁয়ের লোককে বাঘে মেরেচে, পাঁচ বছর আগে সে নাকি দেখেচে। এক বৃদ্ধ লোককে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলাম, তার নাম শামো, তার ভাইয়ের নাম কামো। উড়িয়া ভাষায় কথা বল্লে।

তারপর রাত্রে ও-বেলার সেই কোইনা নদীর সুন্দর জায়গাটাতে এসেচি। ঘন বনের মধ্যে চাঁদ উঠেচে, আমরা মোটরে এসে পৌঁছুলাম। শামো (কামোর ভাই—সে নিজের পরিচয় দিতে গেলে সর্বদাই ভাইয়ের উল্লেখ করে।) এবং কয়েকটি লোক এই বনের মধ্যে আগুন করে বসে আছে। আমাদের জন্যে তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমি। রাত্রি দেড়টা। বিশাল সারেন্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্বত্য কোইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেছে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই কলকলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে। কি সে অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য—এর বর্ণনার কি ভাষা আছে? যে কখনও এমন হাজার বর্গমাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য-নদীর পাষাণতটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গম্ভীর সৌন্দর্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্যহস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কোইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কোইনা নদীর এই সুন্দর স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এর অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে...ওপারের বিরাট বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয়নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শীকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই যে দু'চারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথ রাত্রে গভীর অরণ্যানীমধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীরঅরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্নালোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই অরণ্যশান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিতস্তব্ধতায়—নগরীর কলকোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্ছে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমন বয়ে চলতো। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল—তারও পূর্বে আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের দিনেও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুরবাজানো পা-দুটির মত নৃত্যভঙ্গিতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনও দেখুক না দেখুক—প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেচি, করুণাময় বিশ্বশিল্পী যেন প্রসন্ননেত্রে হাসিমুখে নীরবতার মধ্যে দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে বলচেন—কেউ দেখে না, কত যুগ-যুগান্তর থেকে এমনি সাজিয়ে দিই—প্রতি দিনে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে—আজ এলে তোমরা এতদিনে? বড় আনন্দ হচ্চে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহাদেবতার।

তারপর শামোর সঙ্গে কথাবার্তা বলি। ওর ভাই কামো কেমন আছে? সত্তর বছরের বৃদ্ধ, এই করমপদা নামক বন্য গ্রামেই তার জন্ম, আর কোথাও যায়নি—যাবেও না।পঞ্চাশ বছর আগে একবার চাঁইবাসা গিয়েছিল—রেলগাড়ি জীবনে কখনও চড়েনি। তাকে আমরা মোটরে জাতিসিয়াং পর্যন্ত নিয়ে এলুম।

তারপর সেই নিবিড় অরণ্যের শিশিরসিক্ত গাছপালায় গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নালোক পড়েচে—সে কি চমৎকার রূপ! মোটরে ফিরবার সময় চেয়ে দেখি কত গাছ, কত পাথর, কত নিবিড় বনঝোপ—আমার ঠাকুরদা যেদিন ছেলেমানুষ ছিলেন—এসব বনে তখনও ঠিক এমনি জ্যোৎস্না পড়তো—হে প্রাচীন অরণ্যানী, এই অঞ্চলের যে ইতিহাস তুমি জাননা, কেউ তা জানে না।

পরদিন সকালে চা পান করে মোটরে বেরুলাম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। সুন্দর পাহাড় ও বনের পথে খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এক জায়গায় বনের মধ্যে B.T.T.কোম্পানি রেলওয়ে স্লিপার চেরাই করচে। আজই সকালে একদল ময়ূর দেখেছিলুম থলকোবাদ বাংলো থেকে। লৌহপ্রস্তর ছড়িয়ে পড়ে আছে বনের মধ্যে, কোনো-কোনোটি বেশ ভারী, প্রায় ৫০ ভাগ লোহা আছে শতকরা। ওখান থেকে আর এক জায়গায় এসে শৈলচূড়ার ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—দূরে দূরে

আরও পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু নেমে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে আর কিছুই দেখতেপাইনে, বড় বড় গাছে চোখের দৃষ্টি আটকেচে। কমলালেবু খেলুম বসে। একটা পাইথনের খোলস পড়ে আছে পথে, মুড়ে দিলেন কাগজে মিঃ গুপ্ত। তারপর দূর দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাশের চওড়া বনাবৃত উপত্যকাভূমির দিকে চোখ রেখে নামচি—ওপর থেকে দেখতে পাচ্চি পথ নেমে চলেচে এঁকেবেঁকে পর্বতের গা দিয়ে। হঠাৎ একটি সুন্দর স্থানে এলুম, বাংকিগাড়া বা ওরেপুরা বলে একটি নদী বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে। ওপরের টিলার বড় বড় শালগাছের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটির। পথে একটা শালগাছ দেখেছিলুম একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো, দশ ফুট বেড় গুঁড়ির।আমার ঠাকুরদাদা যখন জন্মাননি, প্রপিতামহ ঠাকুর যখন যুবক, তখন এই শাল ছিল ক্ষুদ্র চারা, কি শক্তি ছিল ওর মধ্যে যে এই ক্ষুদ্র দু ইঞ্চি চারা এই বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েচে, এখনও নাকি বাড়চে। ব্রহ্মশক্তি রয়েচে বিশ্বের সব তাতে। এই সব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে। উপলব্ধি করা চাই। ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই। বাবুডেরাতে চা পান করে আমরা রওনা হলুম—বেলা সাড়ে তিনটা। তারপরেই ঘন বনের পথ, নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন, ডিকেনড্রাম ফুল ফুটে আছে—ফুল নয়, কচি পাতা, দেখতে ফুলের মত। একদিকে ওরেবুরা বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে। আসাম অঞ্চলের মত অরণ্য। ধনেশ পাখি ডাকচে বনে। একস্থানে মোটরের পথে আবার এই সুন্দরী পর্বতদুহিতা আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। কুলুকুলু-তানে ওর সানুনয় অনুরোধ, আমাকে ভাল করে দেখ। চলে যেয়ো না। এই স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, নদীর মধ্যেই। সুনিবিড় বনস্পতিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটির বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার ওপর বসে ভগবানের সৌন্দর্যসৃষ্টি মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমনই সুন্দর, নিভৃত, শান্ত বনঝর্ণার তীরের কুটিরে পার্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বনকুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উচ্ছ্বাসময়ী বন্য নদীর নৃত্যছন্দের নূপুর-ধ্বনি ও বিহঙ্গের কলতানের মধ্যে বসে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপাসনা আপনাআপনি সরল ও সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই তাঁর পূজার অর্ঘ্য। এই স্থানটির নাম দিলুম বনশ্রী।

জেরাইকেলা থেকে আট মাইল এ স্থান, সোজা রাস্তা চলেচে জেরাইকেলা স্টেশন।

আবার চলেচি, পথে জেরাইকেলা থেকে পাঁচ মাইলে পড়লো সাম্‌টা নালা। এমন চমৎকার নদীগুলির নাম এদেশে মোটেই সুন্দর নয়—বড় কর্কশ নাম দেয় হো ভাষায়। আমাদের বাংলা দেশের অনেক বাজে নদীরও নাম এদের চেয়ে কত ভাল। এই সাম্‌টা নালা পার হয়েই এক রাস্তার মোড়—এক রাস্তা গিয়েচে থলকোবাদ তিরিলপপাসি হয়ে। সাম্‌টা নালা বেয়ে কিছুদূর এসে গাছপালার প্রকৃতি যেন বাংলা দেশের মত। ঘন নিবিড় বনানী, বনকলা গাছ, ঝোপঝাপ লতাপাতা, ঠিক যেন বাংলা দেশ। আমার ভিটেতে বারাকপুরে যে গাছ আছে, যার চটি জুতোর মত ফল হয়, এখানে ছোটনাগপুর ইন্‌ডাস্ট্রিস থেকে যেখানে গাছ কেটেচে সেখানে অবিকল এমনি গাছপালা। শালগাছ নেই, বাংলার মত আরণ্য গাছ। দশ মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর উচ্চ স্থান থেকে ঠিক যেন হিমালয়ের দৃশ্য—সামনে সংকীর্ণ উপত্যকায় সাম্‌টা সাপের মত দুটি কুণ্ডলী দিয়ে বেঁধে কুণ্ডলীর বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেচে—সামনে স্তরে স্তরে পাহাড় উঠেচে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেচে—দূরে একটি কুঠি দেখা যাচ্চেউপত্যকার ওপারে সবুজ বনানীর মধ্যে ডুবে আছে। শুনলাম নিকটেই কোথায় বনের মধ্যে একটি জলপ্রপাত ও একটি গুহা আছে। 'In the mountain fastnesses of Hazaribag'ভাগলপুরের সেই উকিলবাবুর কথা মনে পড়লো। সে পার্বত্য দৃশ্য দেখবার বাসনা ১৯২৬ সাল থেকেই আছে, তহশিলদারের ভাইয়ের মুখে সাতনামা পাহাড়ের বর্ণনা শুনে যা দেখবার বাসনা জেগেছিল। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এসব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেচেন যুগে যুগে—তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোক-লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, চিরজীবী হোন।

ফরেস্টার বুড়িউলি হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই হেন্দেকুলি B.T.T. কোম্পানির কুলির তাঁবু। আমরা চলে এলুম পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে শুধু বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে হেন্দেকুলি তাঁবুতে। এখানে বনবিভাগের একটা ছোট্ট বাংলো আছে পথের পাশের উঁচু টিলাতে। নিচেকার জমিতে সাম্‌টা নালার ধারে অনেক কুলি মেয়ে-পুরুষ সন্ধ্যায় সারি

সারি আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধচে। ওরা গাঙপুর স্টেট থেকে এসে 'আরাকাশি' অর্থাৎ কাঠ চেরাইয়ের কুলির কাজ করচে। সেই বনের মধ্যে ঘন ছায়ায় জন কুড়ি-ত্রিশ মেয়ে-পুরুষকে ভাত রেঁধে খেতে দেখে এমন ভাল লাগলো! ওপরে পাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করি আগুনের পাশে বসে। ওদের টিলার বাংলো থেকে সামনের পাহাড়ের ও চারিপাশের বনের দৃশ্য অতি গম্ভীর। এই হেন্দেকুলি ক্যাম্প জেরাইকেলা স্টেশন থেকে দশ মাইল। বেড়াতে এসে এখানেও একদিন থাকা যায়। হেন্দেকুলি ছাড়িয়ে জঙ্গল আবার নিবিড়তর, সাম্‌টা নালার দিকে পথ ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো হেন্দেকুলি থেকে—ক্রমেই ঘন জঙ্গল, এখানে দুটি-তিনটি রঙিন বনমোরগকে পথের এপাশ থেকে ওপারে জঙ্গলের মধ্যে উড়ে যেতে দেখলুম—তখন সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্ধকারে অরণ্যপথ নিবিড় হয়ে গম্ভীর শোভা ধরেচে। ফরেস্টার বলচে, এ পথে বড় বাঘ আর হাতির ভয়। গাড়োয়ানদের গরু প্রায় বাঘে মারে। হাতি তো এখন এই সন্ধ্যায় বার হয়। বাঘও এই সময় পাওয়া যায়। দুদিকের কালো অন্ধকারে ঢাকা বন যেন চেপে ধরেচে ক্ষুদ্র মোটরখানা। ভয় করচে দস্তুরমত। আমরা অবিশ্যি থলকোবাদ পৌঁছবার আগে একটা Barking deer (কোৎরা) ছাড়া আর কিছুই দেখলুম না। চা খেয়ে বাংলোতে আগুনের ধারে বসে গল্প করলুম, তারপর আমার বাংলোর কাছেই অন্ধকারে একটু বেড়িয়েও এলুম। কাল সারারাত্রি কেটেচে জাতি সিরাং-এ কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভে। আজ ঘুমুতে হবে সকাল সকাল। কোৎরা ডাকচে গভীর বনে। ভাঙা চাঁদ উঠেচে বনের মাথায়। রাত ভোর হোল ঘুমিয়ে।

পরদিন সকালে উঠলুম। খুব ভোর। অদূরবর্তী শৈলচূড়ার বনানীশীর্ষে এখনও প্রাতঃসূর্যের আলো পড়েনি। যেখানে জল গরম হচ্চে, সেখানে আগুন পোয়াতে গেলুম। Ada Cambridge-এর 'The Retrospect'বইখানা পড়লুম রোদে বসে। আজ এখুনি থলকোবাদ থেকে চলে যাবো তিরিলপোসি। কল্যাণীকে ও মন্মথদাকে পত্র দিয়েছি। কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে।

ভাবলুম, ওকে আনলে হোত। এই দৃশ্য দেখে কি খুশিই হোত।

বারাকপুরের লোক এখন কি করচে? আমাদের মোটর বারান্দার সামনে এনে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দুপুরবেলা। ১২॥টা হবে, সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্বত্য অরণ্যের পটভূমিতে শুভ্রকাণ্ড শিমুল গাছটার দিকে চেয়ে কত কথাই মনে হয়। বারাকপুর, সেই ইছামতী-তীরের বনঝোপ থেকে এ সময় বনমরচে ফুলের সুগন্ধ উঠচে—কত দিন দেখিনি। বিরাট সারেন্ডা অরণ্যানীর মধ্যে বসে প্রকৃতির মনোহর রূপ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য, এই বনানী, এই শৈলমালা দেখতে দেখতে বহুদূরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির সেয়াকুল-ঝোপের কথা কেন বার বার মনে পড়চে। কেন পড়চে কে বলবে?

থলকোবাদ বাংলো থেকে বের হয়ে বাংলোর সামনে পয়োপ্রণালী দেখতে ঢুকলুম জঙ্গলের মধ্যে। এমন জঙ্গল যে ভয় হোল এই দুপুরেই বুঝি বাঘে ধরে। মোটর ছেড়ে গিয়েছিলুম, আবার চলে এলুম গাড়িতে। ছোট্ট যে পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্চে থলকোবাদের সামনে, জেলার গেজেটিয়ারে তার উল্লেখ আছে। সারেন্ডার ও সাধারণত সিংভূমের সব পার্বত্য নদী ও ঝর্ণা সম্বন্ধে কর্নেল ডালটনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : —"In the reserved forests the wooded glens and valleys, traversed by river and hill streams, have a peculiar charm. Here will be found pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

থলকোবাদ বাংলোর নিকটে যে ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলুকুলু শব্দে বনের নীরবতা ভগ্ন করে আপন মনে নেচে চলেচে, তার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। যদিও ওরেবুরা ও সাম্‌টা নালা সম্বন্ধে এবং কোইনা নদী সম্বন্ধে একথা বেশি খাটে।

কর্নেল ডাল্‌টনের উক্তি আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে পড়ি বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। তখন থেকেই সারেন্ডা ফরেস্ট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কে জানতো তা এভাবে পূর্ণ হবে একদিন, ন বছর পরে সারেন্ডা অরণ্যের মধ্যে তিরিলপপাসি বন্য গ্রামের বনবিভাগের বাংলোতে বসে একথা লিখবো।

আরও কিছুদূর এসে এক জায়গায় বনের মধ্যে ঢুকে আমরা শিশিরদা একটা জলাভূমি দেখতে গেলুম। সুনিবিড় বনানী, ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় ভীষণ চিৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে কি জানোয়ার ডেকে উঠলো। সঙ্গের ফরেস্টার বল্লে—কোৎরা অর্থাৎ Barking deer—কিন্তু সামান্য হরিণে যে এত শব্দ করতে পারে প্রথমে এ বিশ্বাসহচ্ছিল না। বনের চেহারা দেখে ভয় হয়ে গেল। ডানদিকে পাহাড়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্য, বাঁয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জলাভূমি, শুধু দাম দলে পূর্ণ, জল দেখা যায় না—অজস্র কাশফুল ফুটেচে—এই পাহাড়ি পাথরের দেশে এমন জলাভূমি আর কোথাও দেখিনি—সারা সিংভূমে আছে কিনা সন্দেহ। সারেন্ডাতে তো নেই-ই।

আমরা পাঁচ-ছজন যাচ্চি—মিঃ সিন্‌হা, তিরিলপোসির ফরেস্টার, একজন হো, দুজন গার্ড। কিন্তু ওরাই বলেচে বুনো হাতির বড় ভয় এখানে, যেতে যেতে জলার ধারে হাতির পায়ের চিহ্ন দেখলাম অনেক জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড আমগাছকে কি একটা শক্ত লতায় এমনি জড়িয়ে ধরেচে যে দেখে কেন যেন বিস্ময় বোধ হোল। কখনও দেখিনি এমন, আমগাছের পাতা দেখা যায় না নীচের দিকে, যা কিছু পাতা সবই সেই লতাটার। তারপর একটা নরম মাটিওয়ালা জমি পড়লো। সেখানকার বড় গাছগুলো কাটা হয়েচে বনবিভাগ থেকে—ফলে এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ হয়েচে আমাদের দেশের ওক্‌ড়া ফলের মত। পা রাখার স্থান নেই এতটুকু।

ফরেস্টার বল্লে—এই জায়গায় একটা 'খো' আছে পাহাড়ের গায়ে।

—'খো' কি?

—কেভ্‌।

আমরা তো তখনি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। দেখতেই হবে গুহা। মিঃ সিন্‌হা একবার বল্লেন—চলুন, বেলা যাচ্ছে, জায়গাটা ভাল নয়। ফরেস্ট গার্ড কিছুক্ষণ আগে হাতির গল্প বলছিল। একজন ফরেস্টারকে কি ভাবে বেলা চারটার সময় তিরিলপপাসি থেকে আসবার সময় হাতিতে তাড়া করেছিল, কি ভাবে সে সাইকেল ফেলে পালালো। এই বনের মধ্যে এ গল্প সাহসপ্রদ নয় একথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনো হাতি ও বাঘের গল্প সারেন্ডার সর্বত্র এ ক'দিন শুনে শুনে খানিকটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি।

বল্লুম—চলুন, দেখেই আসা যাক একবার।

সেই কাঁটাওয়ালা ফলগুলো কাঁটার মত কাপড়ে ও জামায় বিশ্রীভাবে বিঁধে যেতে লাগলো। এক জায়গায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় নরম মাটিতে কি দেখে ফরেস্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ। বড় বাঘ।

—ঠিক তো?

—একেবারে ভুল নেই—বড় বাঘের পায়ের দাগ। আর দেখুন, হুজুর, এগুলো বাইসনের—

—তা বলে তো ফেরা যায় না। বল্লুম।

এক জায়গায় বন্য অশ্বগন্ধার পাতা তুলে দেখালে ফরেস্টার। আর একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়ে বল্লে—সম্বর এখানে রোদ পোয়ায়। সম্বরের পায়ের দাগ দেখুন কত—

সত্যি, অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ বটে। সম্বর কিনা জানি না, গরু বামহিষের পায়ের দাগের মত—তবে তার চেয়ে কিছু ছোট। বাইসনের পায়ের দাগ ঠিক মহিষের মত।

ফাঁকা জায়গা পার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। স্থানটি অতীব wild—তিনদিকে বনাবৃত পাহাড়ে গোল করে ঘিরেচে, জলাভূমির দিকে সংকীর্ণ ফাঁক। লোহা-চোঁয়ানো রাঙা জলের একটা ঝর্ণা ফাঁকা মাঠ দিয়ে জলাভূমির দামদলের মধ্যে প্রবেশ করলো। রাস্তা থেকে অনেক দূর, প্রায় এক মাইলের বেশি। লোকালয়ের তো চিহ্নই নেই এসব অঞ্চলে। তার ওপর কাঁটাওয়ালা ফলের নীচু আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বাইসন, হাতি ও বাঘের পায়ের দাগ। বেলা পড়ে এসেচে। জানোয়ারে তাড়া করলে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু গুহা না দেখে ফিরচি না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম মাঠ পেরিয়ে—সামনে যে পাহাড় তারই নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গুহা, মুখের দিকে প্রায় মাটি থেকে ন' ফুট উঁচু, লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি লোহা-চোঁয়ানি রাঙা জলের ঝর্ণা বেরুচ্চে। ভেতরের দিকে উচ্চতা ক্রমশ কমে কমে এক-ফুট দেড়-ফুট দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে রাঙা ঝর্ণা বেরুচ্চে সেখানে।

কি গম্ভীর দৃশ্য!

ঘন ছায়া বনে, ঘন অন্ধকার গুহার ভেতরের দিকে। গুহা ওখানে শেষ হোল না, ভেতরের দিকে আরও আছে, দেখাই যায় না। গুহার সামনে ঠিক গুহার ছাদ ছুঁয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ধওড়া ও আমগাছ।আমগাছ ও ধওড়া গাছে কাছির মত লতা উঠেচে জড়িয়ে জড়িয়ে—গুহার মধ্যে বসে শুধু দেখা যাচ্চে সামনের নিবিড় সুপ্রাচীন জঙ্গল। অন্ধকার নামচে বনস্পতির ভিড়ে। রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনায় কবি বাল্মীকি প্রাচীন ভারতবর্ষের বনের যে চিত্র দিয়েচেন, সেই

বর্বর অরণ্য-আকৃতি এই গুহার সামনে, আশেপাশে, সর্বত্র বহু মাইল নিয়ে। দেখলে ভয় হয়, কৌতূহল হয়, বিস্ময় হয়—আবার কি জানি কেন শ্রদ্ধাও হয়।

হঠাৎ ফরেস্টার বল্লে—পাশে আর একটা গুহা আছে—

—কতদূরে?

—এই পাশেই হুজুর।

দুর্গম লৌহপ্রস্তরের boulder ও জলা, নরম মাটি ঘন জঙ্গলে। জমি উপরের দিকে উঠেচে। পাশের পাহাড়ের ছাদটা ক্রমনিম্ন হয়ে এসে এই গুহা তৈরি করেচে বেশ বোঝা যাচ্চে। কিন্তু পাহাড় ক্ষইয়ে গুহা তৈরি হোল কি ভাবে? ওই লোহা-চোঁয়ানো ঝর্ণা কি এর হাতিয়ার?

পাশেই সে গুহা দেখলুম। ঢুকলাম তার মধ্যে। এটা আরও বড়, বাঁদিকে উঁচু ঢিবিমত, লোহা-চোঁয়ানি জল রাঙা পলি ফেলে আন্দাজ লক্ষ বৎসরে এই মাটির স্তূপ তৈরি করেচে। ফরেস্টার দেখালে—আবার একটা বাঘের পায়ের দাগ দেখুন হুজুর—

সত্যি, ঠিক গুহার মুখে লোহা-চোঁয়ানো রাঙা মাটিতে।

—আরও দেখুন, শাহী আর হরিণের পায়ের দাগ—বহুৎ।

—শাহী কি?

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—পর্কুপাইন—

ভাবলুম বাঘ আর অন্যান্য বন্য-জন্তুর আড্ডা তো হবেই এমন গুহাতে। এরও সামনে তেমনি ঘন জঙ্গল, খুব মোটা একটা জংলি আমগাছ। নিবিড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিপাশে।

কত কথা মনে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক মানব কি এ গুহায় বাস করতো? মেঝের মাটি খুঁড়লে বোধহয় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কত লক্ষ বছরের মৌন ইতিহাস এই গুহার মেঝেতে আঁকা আছে—, ওই সব বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। কতকাল আগে, পৃথিবীর কোন্ আদিম শৈশবে যে গুহা তৈরি হয়েচে আপনা-আপনি—কোন্ আদিম মানববংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখানে বাস করতো, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর দূরে মন চলে যায় মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বেশি ভাবতে পারা যায় না। ওই বনানী-শীর্ষে রাঙা রোদ যেমন আজ, তেমনি কত লক্ষ কোটি সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেচে এই সুপ্রাচীন পার্বত্য-গুহা—যার তুলনায় বেদ-গাথা রচয়িতা ঋষিরা, উপনিষদের কবি-দার্শনিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলাবস্তু, অশোক, কলিঙ্গযুদ্ধ—কালকার কথা।

আচ্ছা, কেউ থাকতে পারে এখানে রাত্রে একা? উপনিষদের ঋষিরা কি এমনি নিবিড় বনের গুহায় একা থাকতেন? এখনও কি সাধুসন্ন্যাসীরা ঠিক এমনি নির্জন অরণ্যে এমনি গুহায় একা থাকেন?

এসবের উত্তর কে দেবে? মাথা ঘুরে ওঠে যেন ভাবলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে জাগে। মানুষের যাতায়াত নেই এ গুহায়, তাই এত অদ্ভুত লাগচে, ভয় হচ্চে। এস্থান যদি লোকালয়ের মধ্যে হোত, রেল স্টেশন থেকে এক মাইল হোত, সাধুসন্নিসিরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন, দেওঘরের তপোবনের গুহার মত—তবে কি এমন অদ্ভুত লাগতো? মোটেই না।

ফরেস্টার বল্লে—চলিয়ে হুজুর। বহুৎ জানোয়ার রহতাহ্যায় হিঁয়া—চলিয়ে হিঁয়াসে—

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—বেলা প্রায় চারটা, চলুন, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না—

আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফলের জঙ্গলের মাঠ ও নিবিড় বন পার হয়ে তিরিলপোসি—থলকোবাদ রোডে গাড়ির কাছে এলুম। আসবার সময় আবার হাতির গল্প উঠলো—কে যেন বল্লে এখানে হাতি তাড়া করলে পালাবার পথ নেই—সত্যিই বাটে। একদিকে জলা, অন্যদিকে পাহাড়ি ঢাল, বনে ভরা। পেছনে সেই কাঁটাওয়ালা বীচির জঙ্গল। কি একটা বোঁটকা গন্ধ পেলুম এক জায়গায়।

ফরেস্টার বল্লে—সেও পেয়েচে বটে। যাবার সময় এত ভয় হয়নি, আসবার সময় বোধ হয় বাঘ আর হাতির পায়ের দাগ দেখবার দরুনই মনের মধ্যে এই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে বিশেষ সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেলা সাড়ে পাঁচটায় তিরিলপাসি বাংলোয় পৌঁছে গেলুম।

আজ সকালে চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূর গেলুম পায়ে হেঁটে। সিংলুম নালা বলে একটি অতি চমৎকার ঝর্ণা বা পাহাড়ি নদী থেকে খানা কেটে জল আনা হচ্ছে তিরিলপোসি গ্রামের শস্য-ক্ষেত্রে। সেটা দেখতে গেলুম আমরা। সিংভূম বা সারেন্ডাতে যেখানে বনের মধ্যে পাহাড়ি ঝর্ণা সেখানেই সৌন্দর্য—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুন্দর পাথর বিছানো ঠাণ্ডা জায়গায় জলে পা ডুবিয়ে নিবিড় বন-ছায়ায় বসে ঝর্ণার মর্মরধ্বনি শুনতে লাগলুম একা একা। চোখে পড়চে শুধু গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য, যেদিকে চাই। বেলা বারোটায় ফিরে এলুম। বিকেলে বোনাই স্টেটের বালজুড়ির দিকে যে রাস্তা গিয়েচে পর্বত ও অরণ্য ভেদ করে সেদিকে চললুম। সামনে ঘোর জঙ্গলের দিকে রাস্তা নেমে গিয়েচে দেখে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সন্ধ্যে হয়েচে, আর এখন জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই তো জানোয়ারদের বেরুবার সময়। যদি হাতি তাড়া করে, ওপরের দিকে উঠে পালাতে গেলেই হাতিতে ধরবে, বড় বিপজ্জনক। মাকড়সার জাল বনে সর্বত্র।

সুতরাং ফিরলুম। একটা বড় পাথর বিছানো স্থানে গাছের তলায় বসলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, সামনের জমি ঢালু হয়ে গিয়ে সিংলুম নালার খাতের দিকে চলেচে। তার ওধারে ঘোর বনে সমাচ্ছন্ন শৈলমালা, অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা গাছের ডাল মাথার অনেক ওপরে নত হয়ে আছে। মন এ সব স্থানে সম্পূর্ণ অন্যদিকে যায়। কত ধরনের চিন্তা মনে আসে। জীবনের রহস্যের গভীরতার দিকে আপনাআপনি ছুটে চলে।

কল্যাণীর কথা আজ সারাদিন মাঝে মাঝে মনে হচ্চে। হয়তো আমার চিঠি ও পাবে কাল।

ঠিক সন্ধ্যায় হয়তো বনগাঁ লিচুতলা ক্লাবে যতীনদা, মন্মথদা, সুবোধদা সব বসে গল্প করচে, আজ বিশ বছর রোজ যে ভাবে গল্প করে, তার ব্যতিক্রম নেই।

খুব ভোরে উঠেছিলুম, বেশ জ্যোৎস্নায় নীরব, সামনে পর্বত ও অরণ্য। শুকতারা জ্বল জ্বল করচে পূর্বদিকের আকাশে। থলকোবাদ থেকে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ির দল শেষরাত্রি আড়াইটায় উঠে চলেচে জেরাইকেলা। এখন পাঁচটা হবে। সকালে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে বসি, বড় বড় শালগাছ, ওদিকে বনাবৃত পর্বত, চারিদিকেই পাহাড় ও বন মাঝে ফাঁকা ক্রমনিম্ন একটু মাঠমত—সেখানে মোটা মোটা শালগাছ ও শালচারা। ঘন বনে ঘেরা পর্বতের পটভূমিতে শৈলচূড়ার একটি বড় গাছ ছোট্ট দেখাচ্ছে। বিশ্বদেবের উপাসনা এখানেই সার্থক ও সম্পূর্ণ।

চা-পানান্তে অপূর্ব বনপথে গাংপুর স্টেট্ ও সারেন্ডার সীমানায় অবস্থিত টিকালিমারা নামক গ্রামে চললুম। এ পথ তৈরি হয়ে পর্যন্ত বোধ হয় কখনও মোটর আসেনি, গরুর গাড়িও চলে না, সবুজ ঘাসবনে ঢাকা রাস্তা, কোন্‌টা বন কোন্‌টা রাস্তা চিনবার জো নেই। মনে হচ্চে যেন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেচে। দুধারে নিবিড় বন, অনেক ভাল দৃশ্য থলকোবাদ থেকে জেরাইকেলা রাস্তার চেয়ে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ নেই পথে, জন নেই, প্রাণী নেই, সকালের আলো এসে পড়েছে সুদীর্ঘ ও প্রাচীন শাল, আমলকী, পাঠডুমুর, ধওড়া গাছের শীর্ষভাগে—কোথাও মোটা মোটা লতায় জড়াজড়ি করে বেঁধেচে ডালে ডালে, গুঁড়িতে গুঁড়িতে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটেচে, সর্বত্র শিউলি গাছের তো জঙ্গল, এত শিউলি গাছ এদিকের বনে যে এমন অন্য কোথাও দেখিনি, কোথাও ফলে ভরা আমলকীর ডাল পথিপার্শ্বের বিশাল গাছ থেকে রাস্তার ওপরনত হয়ে আছে ছবির মত, কোথাও পাহাড়ি ঝর্ণা বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে ছায়ানিবিড় সুঁড়ি-পথে কুলুকুলু বয়ে চলেচে, কোথাও বা একটা বন-মোরগ মোটরের শব্দে রাস্তার ওপর থেকে ওপাশের বনে উড়ে পালালো, কোথাও রাস্তা ক্রমে নামচে, নামচে, সামনে উচ্চ-বনাবৃত শৈলমালা—আমরা ঠিক যেন চলেচি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারবার জন্যে বলে মনে হচ্চে, কোথাও রাস্তা ও মোটর একেবারে ডুবে যাচ্চে গভীর বনের মধ্যে সমতল উপত্যকায়, সেখানে চারিদিকে বন ও পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল, কিছু দেখা যায় না—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে উঠে চলেচি, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতিশ্রেণী ছায়াভরা বনবীথির সৃষ্টি করেচে, গাছে গাছে চীহড়ের লতা দুলচে।

অবশেষে আমরা বিটকেলসোয়া গ্রামে পৌঁছে গেলুম। চারদিকে উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট ছেলে-পিলে মোটরের শব্দ শুনে উঠে এল। প্রেমানন্দ নামে একজন মুণ্ডা খ্রিস্টান আমাদের সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা কাঠের ও খোলার ঘরে গ্রাম্য গীর্জা। শুনলাম এ গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী মুণ্ডা খ্রিস্টান। মনোহরপুর থেকে জন নামে এক 'প্রিস্ট' (এখানে পাদ্রিকে এই বলে) এসে রবিবারে এদের উপাসনা করায়। প্রেমানন্দ এক সময়ে প্রচারকের কাজ করবার জন্যে এই গ্রামে এসে এখানেই রয়ে গিয়েছে। বেশ বড় খোলার বাড়ি করেচে, লাউ কুমড়া লতা উঠিয়েছে। একটি গৃহস্থের নাম

ফিলিপ টোপনো। ঘন্‌শা মুচির মত চেহারা। এত খ্রিস্টান এখানে কেন?এ কথার উত্তরে ফরেস্টার খুন্টিয়া বল্লে—পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রিস্টান হয় মিশনারিদের প্ররোচনায়।

বাঘের বড়অত্যাচার এই সব বন্য গ্রামে। তিন মাস আগে একজনকে বাঘে ধরেছিল। ওরা গরু চরাচ্ছিল বনের ধারে, বাঘে এসে ওকে ধরে। সঙ্গের লোকেরা টাঙি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেয়। বেলা বারোটার সময় ওকে বাঘে ধরে। লোকটার নাম সাময়েল মান্‌কি। আমাদের বারাকপুরের গ্রামের বাসানে পাড়ার যে কোনো মুসলমান ছোকরার মত চেহারাটা। গাছের ছায়ায় বসে লোকটাকে দেখে আমরা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলুম—কত বড় বাঘ রে?

—খুব বড় বাঘ হুজুর।

—তোর কোনো হুঁশ ছিল?

—না, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা বাড়িতে মস্ত বড় একটা শুকনো পাতার টোকা ঝুলছে। দেখতে চাইলাম, নিয়ে এসে দিলে। বোহিনিয়া ভ্যালাইয়ের বড় বড় পাতা দিয়ে করে।

এক স্ত্রীলোক পাতার কুঁড়েঘরে বসে কাঁদচে। তার স্বামী মারা গিয়েচে শুনলাম। তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। মানুষের দুঃখের প্রকাশ যেমন বাংলাদেশে, এখানেও এই সুদূর বন্য গ্রামেও তেমনি। কোনো তফাত নেই।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ওপারে গাংপুর স্টেট্‌। দক্ষিণ-পূর্বে বোনাই স্টেট্‌। যে রাস্তায় আমরা এলুম এই রাস্তা চলেচে বোনাই স্টেটের বালজুড়ি গ্রামে, এখান থেকে পাঁচ মাইল। নিভৃত বনের মধ্যে বালজুড়ির পথে এক জায়গায় খ্রিস্টান মুণ্ডা কুলিরা কাজ করচে, তাদের হাজিরা নেওয়া হোল ঘন বনের ছায়ায় বসে। এই পথে আজ মাস দুই আগে প্রকাণ্ড নরখাদক রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র একটি মানুষ মেরেচে।

কুলীদের নাম :— নান্দী কুই

সুনি কুই
রাইমতি কুই
চাম্পু কুই
রাহিল কুই
ক্রিস্টিনা কুই
যশোমনি কুই
বোবাস মুণ্ডা
ইলিসাবা কুই

বাইবেলের বহু চরিত্রই এই বনজঙ্গলে মাটি কাটচে, সবাই মেয়েছেলে। ‘কুই’ এদেশে হো ভাষায় কুমারী মেয়ের নামের শেষে বলে।

বর্ষাকালে দুমাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বলে “কান্দা”। নানারকম মিষ্ট কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলি আম, বেল ও কাঠডুমুরের পাকা ফলও বনে মেলে। কাঠডুমুর (Ficus cunsia) বাংলাদেশে নেই—এই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখিনি—প্রেমানন্দ গ্রামের মুণ্ডারি বা সর্দার। বল্লে—এখানে চালের বড় কষ্ট, বোনাই স্টেটে /৬ সের চাল টাকায়, কিন্তু এখানে আনতে দেয় না হুজুর। পথের মধ্যে বোনাই আর সারেন্ডার সীমানায় সিপাই বসিয়ে রেখেচে।

চলে এলুম। একটা ঝর্ণা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বইছে—এর নাম বিটকেল-সোয়া নালা। আসলে এই গ্রামের নামেই এর নাম। স্বচ্ছন্দগতি নৃত্যপরায়ণা বন্য নদীর নাম আর বাঘের ভয় বনে। এই একমাত্র লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার নাচতেনাচতে ঢুকে পড়লো বোনাই স্টেটের অরণ্যভূমিতে। তার এই নাম!

বেলা বারোটা। আমরা ফিরলুম, চমৎকার শান্ত গ্রামখানি। এই ঘন বনের মধ্যে এর জন্ম ও মরণ। বিস্‌রার বাজার থেকে চিনি, আটা, তেল আনে। বিস্‌রষোল মাইল দূর এখান থেকে। মহুয়ার তেল খায়, ও নাকি ঘি'র মত, স্যামুয়েল মান্‌কি বল্লে। খ্রিস্টান হয়েচে বটে কিন্তু অসুখ হোলে বনে গিয়ে লুকিয়ে বোংগা পুজো করে।

ফিরে এলুম বনের পথ দিয়ে। স্নান করে খেয়েই তখুনি আবার মোটরে বার হই টোয়েবু নামে একটি নিবিড় বনে অবস্থিত জলপ্রপাত দেখতে। তিরিলপোসি বাংলো থেকে থলকোবাদের পথে চার মাইল গিয়ে গাড়ি রেখে হেঁটে চল্লুম বনের মধ্যে। সঙ্গে ফরেস্টার খুন্টিয়া, দুজন ফরেস্ট গার্ড, মিঃ সিন্‌হা। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষত সেদিনকার সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলুম। এমন বনের চেহারা এই সারেন্ডাতেও আর দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য সে ঘোর বনের। বিশাল বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রামের সাদা পাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্চে, এ লতা যে অত উঁচুতে উঠতে পারে তা জানতাম না। একস্থানে সুঁড়িপথের দুধারে নদী কাঁঠান নামক এদেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় আমগাছ, শালগাছ, মোটা মোটা লতা ডালেপালায় জড়িয়ে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেচে বনভূমি। ভয় হয় এ বনে ঢুকতে, বিশেষত যে রকম হাতি আর বাঘের ভয় বনে। এক এক স্থানে সুঁড়িপথটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখা যায় না। চলেছি, পথ আর ফুরোয় না। ওকড়া জাতীয় শুকনো ফল সারা গা এমন কি মাথায় চুলে পর্যন্ত আটকে যাচ্চে। কোথাও নিবিড় সেগুন বন, কোথাও জলাভূমি, কোথাও কাঁটাবন, পথ নেই বল্লেই হয়। এক স্থানে নরম মাটিতে মস্ত বড় বাঘের পায়ের থাবা আঁকা। হাতির নাদ আর পায়ের দাগ তো সর্বত্র। বাইসনের পায়ের দাগও আছে। এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড দুটি দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আপনাদের মধ্যে কি বলতে লাগলো। কি ব্যাপার? বাঘ দেখেচে নাকি, না হাতি? মিঃ সিন্‌হা ধমক দিয়ে বল্লেন—আরে ক্যা হায় বোলো না? ওরা বল্লে—বানর, হুজুর।

ক্রমে একটা প্রস্তরময় স্থানে এলুম। একটি পাহাড়ি ঝর্ণা পাথরের ওপর দিয়ে চলেচে। আমি ভাবলুম, এই বুঝি সে জায়গা! কিন্তু ফরেস্ট গার্ড থামে না। চলেচে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, শুধু তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্চি। এই সরু বনপথ নাকি বোনাই স্টেট্ থেকে আসবার শর্টকাট্—তাই ওদিকের বালাজোড় প্রভৃতি স্থান থেকে এ পথে পথিক লোক আসে। কিন্তু কেমন সে পথিক যে এই বন্যগজ ও ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত নিবিড় ও দুর্ভেদ্য বনপথ দিয়ে শর্টকাট করে সোজা সড়ক ছেড়ে, কত বড় তার বুকের পাটা তো বুঝতে পারলুম না। আবার কিছুদূর গিয়ে আর একটি প্রস্তরময় স্থানেও পাহাড়ি নদী। এখানে ক্ষুদ্র একটি cascade-এর সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি চলেচে বয়ে। বেশ জায়গাটি, ভাবলুম, পৌঁছে গিয়েছি বুঝি—এই সেই টোয়েবু ঝর্ণা। দু-চারটি বন্যঘাসে ছাওয়া কুটির এখানে রয়েচে বনস্পতিদের ছায়ায়, বনবিভাগের কুলিরা গত বর্ষাকালে লতা কাটতে এসে এখানে ছিল; তারাই তৈরি করে রেখেচে—এখন কে আর থাকবে এখানে?শুনেছিলুম মাত্র দু'মাইল, অথচ তিন মাইল এসে গিয়েচে, আন্দাজে মনে হচ্চে, এক ঘণ্টা ধরে অনবরত হাঁটচি, অথচ টোয়েবু জলপ্রপাতের শব্দও তো শুনচিনে কোথাও। আবার পাহাড়ের মত উঁচুপথে পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ের পথে উঠি, উৎরাইয়ের পথে নামি—একস্থানে ফণি-মনসার গাছ অনেক, কালো পাথরের রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট জন্মেচে। এবার বাঁদিকে জলের শব্দ পেলুম—আমাদের হাত-পাঁচেক নীচে অনেকখানি স্থানে পাথর বেরিয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। এ ছাড়িয়েও ফরেস্ট গার্ড চলে যাচ্ছে।

আমরা বলি—আর কতদূর?

—এই হুজুর, তবে নামতে হবে নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলুম উপত্যকার সমতলে। কাঁটায় ও কণ্টকময় বনফলে এই চার মাইল আসতে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রি রি করে জ্বলচে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব সৌন্দর্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে, সেই বাঘের পায়ের থাবা-আঁকা ঘোর জঙ্গলের পথে না হেঁটে এলে, সেই জনমানবের চিহ্নহীন বনানীর গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীর-দর্শন জলপ্রপাতের কথা কি করে বোঝাবো?

অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, তারই একটার ওপরে গিয়ে বসলুম। বেলা তিনটা বাজে, এখুনি সেখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার সামনে একটা জলাশয়, ঘন কালো ঈষৎ সবুজাভ তার জল। এই জলাশয় নাকি অত্যন্ত গভীর, জলের চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় বটে—'টোয়েবু' মানে 'মোচড়ানো ঘাড়ে'। এক হো জাতীয় লোক ওখানে মাছ ধরতে এসেছিল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মাছ ধরে ধরে সে স্ত্রীকে ডাঙার দিকে

ছুঁড়ে দিচ্ছিল, স্ত্রী লুফে লুফে নিচ্চে—একবারে হঠাৎ বিস্মিতা স্ত্রীর হাতে এল তার স্বামীর সদ্য-মোচড়ানো ঘাড়টা। সেই থেকে বন্য অপদেবতার ভয়ে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। অথচ মাছ নাকি খুব আছে।

আমাদের সামনে জলাশয়ের ওপারে প্রায় সত্তর-আশি ফুট লৌহ-প্রস্তরের (Hematite quartzite) অনাবৃত দেয়াল খাড়া উঠেচে, তার শীর্ষে অপরাহ্ণের হলদে রোদ, তার গায়ে গাছের মোটা শেকড় ঝুলচে। বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাঁই জায়গায় জায়গায় যেন মোটা শেকড়ের বাঁধনে আটকে আছে ফাটলের গায়ে। এই পাহাড়ের দেয়ালের বাঁদিকে প্রায় সাত-আট ফুট চওড়া জলধারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সশব্দে প্রায় ২৫ ফুট ওপর থেকে নীচের বন্য অপদেবতার লীলাভূমি সেই সরোবরটাতে পড়চে। এই স্থানটি নিবিড় বনে ঘেরা, একটা সংকীর্ণ গহ্বরের বা বড় ইঁদারার মত—যেন ইঁদারার মধ্যে বসে মাথার দিকে চেয়ে আছি। বড় বড় আম, গাচাকেন্দু বা গাবগাছ, বেত, ফার্ন, লম্বা লম্বা তৃণ, লুদাম, করণ্ড আরও অসংখ্য বন্য গাছে ছায়ানিবিড়। জলপতনধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিতসেই গম্ভীর আরণ্য নিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, অন্তরের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে, সমাহিত মনে শুনতে হয়। এই রকম জলাশয় সম্বন্ধেই কর্নেল ডলটনের সেই উক্তিটি খাটে :— "Pools, shaded and rockbound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

অনন্তের মৌন ইতিহাস এখানে আঁকা আছে পাথরের দেওয়ালের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য ঋষিদের আমলেও এই ঝর্ণা ঠিক এমনি পড়তো ঘোর বনের মধ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার হয়েচে, বন্যজন্তুর বংশের পর বংশ নির্ভয়ে জলপান করেচে—রেল হবার আগে, বনবিভাগের সৃষ্টি হওয়ায় আগে বন্য লোক ছাড়া অন্য কারও চোখেই পড়েনি এ সৌন্দর্যভূমি। কে আসবে মরতে পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করত কে? এই বিংশ শতাব্দীতেও এ স্থান নিকটবর্তী রেলস্টেশন থেকে বনপথে একুশ মাইল। তার মধ্যে তেরো মাইল নিবিড় বনানী, শেষের চার মাইল নিবিড়তর বন, যার মধ্যে দিয়ে কোনো সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথপ্রদর্শক না নিয়ে আসা উচিত নয়। পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, একবার পথ হারিয়ে গেলে জনমানবের চিহ্নহীন এই ঘোর জঙ্গলের মধ্যে বন্যহস্তীর পদতলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখে প্রাণ হারাতে হবে। অথচ কি সৌন্দর্যভূমিই লুকিয়ে রেখেচে প্রকৃতিদেবী মানবচক্ষুর অন্তরালে। হলদে রোদ রাঙা হয়ে আসচে, আর থাকা ঠিক নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিবিড় পথে চার মাইল গিয়ে মোটরে উঠতে হবে। এই পড়ন্ত বেলাতে হাতি বাঘ বেরিয়ে থাকে সাধারণত। রওনা হয়ে ঝর্ণার ওপারের দিকটাতে চওড়া পাথরের ওপর অনেকটা বসলুম। কতদূর লৌহপ্রস্তরের তৈরি ঢালু পর্বতগাত্র বেয়ে ঝর্ণাটা নীচে নেমে ওই জলপ্রপাতের ও ঝর্ণার সৃষ্টি করচে। এ আর একটি অপূর্ব স্থান কিন্তু আর বসা চলে না। আবার সেই দুর্গম পথে রওনা হলাম। পথে সেই ঘাসের কুটিরগুলির স্থানে এসে মনে হোল বড় চমৎকার, এখানেই থেকে যাই। সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে নরম মাটিতে আমি একটা নরম পায়ের দাগ দেখিয়ে বল্লাম—দেখুন আর একটা।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—বহুৎ বড় পায়ের দাগ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার—

তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বনানী অন্ধকার হয়ে এসেচে—হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমাদের দেশে গোপালনগরের হাট, পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়ো পানের দোকানে পান বিক্রি করচে। ওরা সেই ক্ষুদ্র স্থানে জন্মে চিরকাল ওখানেই আনন্দে আছে, জগতের কী-ই বা দেখলে?

এক জায়গায় বড় বড় আমগাছ, কি ফুলের সুগন্ধ বাতাসে, ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবাতাসে বনানী থেকে বারাকপুরের পল্লীপ্রান্তে এ সময় যেমন সুগন্ধ ওঠে তেমনি পাচ্চি। রাধালতার ফুল এখানেও দেখলাম ঝোপের মাথায়। ঝন্দী কাঁটালের কালো পাতার রাশি অন্ধকার আরও কৃষ্ণতর করে তুলেচে। ওই ফুটন্ত বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘন গম্ভীর দৃশ্য বনানীর। সন্ধ্যায় সারেন্ডা ফরেস্টের নিভৃতবনপথ দিয়ে যাওয়া, এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।

ফরেস্টার এক জায়গায় এসে বললে—ঠিক এখানে মল্লিকবাবু ফরেস্ট রেন্‌জার মস্ত বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিল—রাস্তা পার হয়ে বনের দিক থেকে ওদিকেই যাচ্ছিল, মল্লিকবাবু বলে—চাকরি ছেড়ে দেবো, সারেন্ডায় আর চাকরি করবো না।

প্রতি পদে ভয় হচ্ছে। একবার ফরেস্ট গার্ড বনের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো—কি রে! দাঁড়ালি কেন? সে বল্লে—জংলী মোরগ হুজুর।

ধড়ে প্রাণ এল যেন—চলো বাপু। বন-মোরগ দেখে আর এখন কাজ নেই। এই সুনিবিড় অরণ্যে হাতি ও বাঘ হায়েনা চলাফেরা করচে, মানুষ মারচে—তার গল্প থলকোবাদে শুনেচি, কুম্‌ডিতে শুনেচি, বনগাঁয়ে শুনেচি, আবার আজ বিটকেলসোয়াতেও শুনেচি। নিজের চোখে দু-তিন দিন বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম মাটিতে—এবং তা হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের। আজই দেখেচি এক জায়গায় হাতি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েচে তার দাগ। হাতির বাইসনের ও সম্বরের পায়ের দাগ তো সর্বত্র—ওর হিসেব কে রাখে। সুতরাং বন পেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

ফরেস্টার বলচে—কাছেই এসেচি মোটরের দু'রশি আছে। তখন একবার বনের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে নিলুম। কি গম্ভীর দৃশ্য অরণ্যানীর, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কত উঁচুতে রাধালতা আর কম্‌প্রিটাম লতার কচি পাতা। ঘন বনে অন্ধকার হয়ে এসেচে। লোকালয় থেকে বহুদূরে সারেন্ডা ফরেস্টের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়িয়ে গোপালনগর হাটের কথা ভাবচি।

বাড়ি এসে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই ডায়েরি লিখচি। খেয়েদেয়ে একবার বাইরে গেলুম, কি ঝক্‌ঝক্ করচে নক্ষত্রগুলি পাহাড়ের মাথায়, অনন্ত ব্যোমে মহারুদ্রের জ্যোতিঃত্রিশূলের মত Orion জ্বলছে—এখানে ওখানে কত তারা, বিরাট ছায়াপথ জ্বলজ্বল করচে—বিশ্বদেবের ভাণ্ডারে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি beauty spot—তাঁর অনন্ত দৃষ্টি কি করে আমরা বুঝব—শুধু মনে মনে তাঁর জয়গান করেই বিস্ময়ের অবসান করি।

রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে, কালকের মত শুকতারা জ্বলজ্বল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাড়ি, বাবা-মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা—আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষরাত্রে। জীবন কি অপূর্ব! কি অমৃতময়! জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্যে দিয়ে শত বৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আসি-যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, তাঁরঅনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার চোখ যেন পাই।

সকালে শালবনে বেড়াতে গেলুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় কাল যেমন দেখেছিলুম একটা গাছ—বড় বড় বনস্পতি চারিধারে, বনের শান্ত শ্যামল সমারোহ। প্রাণভরেদেখি। চেয়ে থাকি।

শেষরাত্রে কালীর বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য, পুঁটিদিদি যেন মার মত স্নেহে আমায় কি খেতে দিলেন। অল্প বয়সের পুঁটিদিদি।

আজ সকাল ন'টায় তিরিলপপাসি থেকে স্নানাহার করে বার হয়েচি। সারেন্ডা অরণ্যে ফাঁক কোথাও নেই—শুধুই চলেচে জঙ্গল। এক জায়গায় নেমে আমরা পাতলা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, সেখানে কাঠকয়লার ভাঁটা করে কয়লা পুড়ুচ্চে। তারপর কিছুদূর এসে এক জায়গায় দীঘা নামক বন্যগ্রাম। তার প্রান্তভাগে 'বিরহোর' নামক যাযাবর বন্য জাতির আবাস, নেমে দেখতে গেলুম। অনেক ছেলেমেয়ে ও পুরুষ রোদে বসে চীহড় লতার দড়ি পাকাচ্চে। এই ওদের উপজীবিকা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেচে দড়ি, শিকা—সব তৈরি করে চীহড়ের বাকল থেকে। খুব শক্ত দড়ি হয়। এক গ্রামে সপ্তাহ দুই থাকে, তারপর অন্য গ্রামে চলে যায়। কোথাও নির্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। একটি রূপী বাঁদর নিয়ে এল বিক্রি করতে। আমরা নিলাম না। বেশ সুন্দর পাথরে-খোঁদা চেহারা ওদের।

দীঘা ছেড়ে সামটা গ্রামের পথে আমরা চললুম। আবার জঙ্গল, পাশে একটা ঝর্ণা ও গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হয় সরু পথে গাড়িগুলি উল্‌টে যাবে। তেমনি গভীর অরণ্য। এপথে অনেক বন্য বাঁশ দেখলুম পাহাড়ি ঢালুর জঙ্গলে, এক জায়গায় বন্যকদলীও দেখা গেল।

সামটা গ্রাম বনের বাইরে। খ্রিস্টান ও হিন্দুর বাস, তবে হো-দের বাসই বেশি। একটি ছেলে নাম বল্লে, চন্দন তাঁতি। একটু সভ্য কাপড় পরা ওরই মধ্যে। বল্লাম—তুমি খ্রিস্টান?

—না, আমি হিন্দু।

—কালী-দুর্গা পূজা কর, না বোঙ্গা পূজা কর—

—বোঙ্গা পুজো করি।

একটা গাছের নীচে এরা মুরগি বলি দেয় ও আতপ চাউল নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। সিংবোঙ্গা এদের পরম দেবতা—সূর্যদেব। আরও বিভিন্ন বোঙ্গা আছে—এক এক রোগের এক এক বোঙ্গা।

সামটা থেকে এলুম জেরাইকেলা। এখানে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল Range আপিসে। বাড়ি খুলনায়, এখন এখানেই দু-তিন বৎসর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে বাস করচে। রেঞ্জ আপিসে দেখা করতে এল—শুনলাম এখানে বেশ ম্যালেরিয়া।

জেরাইকেলা থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল যেতে গভীর অরণ্য শুরু হোল। একদিকে গভীর অরণ্যভরা নদীখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। পোঙ্গা পর্যন্ত সমানেই অরণ্য। এক্সপোর্ট নাকা নামক বনবিভাগের কর্মচারির আবাসস্থানের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, একজন লোককে ডুলি করে নিয়ে যাচ্চে, জঙ্গলে B.T.T. কোম্পানির কাজ করছিল, ম্যালেরিয়া ধরেচে।

আবার জঙ্গল। পোঙ্গা এলুম বেলা আড়াইটাতে। আগে এখানে B.T.T. কোম্পানির আপিস ছিল, এখন কিছু নেই। পোঙ্গা থেকে মনোহরপুরের পথে রওনা হই। মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বনবিভাগের শিক্ষানবিসি করতে এই পথে একা সাইকেলে আসেন, অতি দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ—এর আগে বনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। কিভাবে একা এখানে এলেন, আজ তাঁর মুখে শোনা পর্যন্ত এই পথ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল—এবার সে পথও দেখলুম এবং কোলবোংগা নামক গ্রামে যে কুটিরে তিনি রাত্রি কাটিয়েছিলেন, সেটাও দেখলুম। কুলিরা সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে আর তাঁর জিনিস নিয়ে যেতে চাইল না। এখন সে কুটিরের অনেক পরিবর্তন হয়েচে, পূর্বে আঠারো বছর আগে বন এখানে ঘনতর ছিল। কোলবোংগার প্রান্তে এক পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট কুটিরে এক গোঁসাই জাতীয় কৃষক বাস করে। বৃদ্ধ গোঁসাই ধান ঝাড়চে পাহাড়ের ওপরে খামারে। সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে এবং খুব কাছে উঁচু পর্বতমালা ও শিখরদেশ। সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা গেল এর পরে, ঘিনডুং নামক স্থানে—এক্সপোর্ট নাকার আপিসের সামনে কয়েকটি বালক স্কুল থেকে আসে। তাদের কাছে ডাকলুম, ওরা মনোহরপুর ইউ.পি. স্কুলে পড়ে, ছ' মাইল দূরবর্তী কোলবোংলা গ্রাম থেকে রোজ মনোহরপুরে পড়তে যায়।

মনোহরপুর এলুম—দূর থেকে রেলের ধোঁয়া দেখে মনে আনন্দ হোল। কোইনা নদী পার হয়ে মনোহরপুর বাজারে এলাম—চায়ের দোকান, খাবারের দোকান—কি আশ্চর্য জিনিস যেন। চোখে চশমা ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াচ্ছে, এ যেন এক নতুন দৃশ্য আজ আট-ন'দিনের জঙ্গলের গভীর নির্জনতার পরে। দোকান বলে জিনিস আছে দুনিয়ায়, সেখানে পয়সা দিলে তুমি সিগারেট, খাবার, চা কিনে খেতে পারো—ডাকঘর আছে, ইচ্ছামত চিঠি লিখে ফেলতে পারো, এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা।

মনোহরপুর বাংলো স্টেশনের কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে। বেলা পাঁচটায় সেখানে পৌঁছে গেলাম। চারিদিকের দৃশ্য ও দূরের শৈলশ্রেণী দেখা যায় এই পাহাড়ের ওপরে বসে। সূর্য অস্ত যাচ্চে, আমি বাংলোর কম্পাউন্ডে দাঁড়িয়ে ভাবচি ওই ঘন শৈলারণ্য থেকে এসেচি, ওরই মধ্যে কোথায় সেই শিশিরদা জলাভূমি, গুহা, ওরই দুর্গম প্রদেশে সেইঅপূর্ব-সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, জাতিসিরাং, বাঘের থাবা আঁকা সেগুন বন।

বনের দেবতা মারাং বোঙ্গাকে প্রণাম।

আজ সকালে উঠে একটু বেড়াতে গেলুম। বাঙালির মুখ অনেকদিন দেখিনি। মনোহরপুর বাজারের পথে সুধীর ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠলুম। তার বাড়ি খুলনায়। আনন্দ হওয়াতে তিনি চা খাওয়ালেন, ভাত খেতে বল্লেন। বড় ভদ্রলোক। সেখানে বসে সারেন্ডা ফরেস্টের গল্প করলুম। এসে চা খেয়ে 'দেবযান' লিখতে বসি। মিঃ সিন্‌হা আফিস তদারক করতে গেলেন। রেন্‌জ্‌ অফিসারের নামসুলেমান কারকাটা, হো খ্রিস্টান। রোদ পিঠে দিয়ে বসে লিখলাম অনেকক্ষণ। তারপর তেল মাখলুম রোদে বসে। মনে পড়চে নদীর ধারের কথা বারাকপুরের, হয়তো ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে এতদিন। ফণিকাকা তামাক খেতে খেতে গল্প করচে বারিকের সঙ্গে। সামান্য বিশ্রাম করলাম খাওয়ার পরে, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শ্যামাচরণদা'র বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন মায়ের মত যত্ন করচে। কল্যাণীর কথা ভাবচি, এতক্ষণে সে কি করচে?

বাইরে চেয়ে দেখচি, রোদ পড়েচে পাহাড়ের শালগাছের গায়ে। বিকেলের রোদ, হঠাৎ মনে পড়লো বাসান গাঁয়ে মোহিনীকাকার চণ্ডীমণ্ডপের কথা। কে আছে সেখানে এখন? কি করচে তারা? মুরাতিপুরে আমার মামার বাড়ির সেই ছাদটি, সেই শৈশবের লীলাভূমি কলামোচা আমতলা—এত স্থানে বেড়ালুম, এখনও যেন মামার বাড়ির পিছনের বাঁশবন রহস্যময় মনে হচ্ছে। শৈশবের মতই বারাকপুরের তেঁতুলগাছটার তলায় আমাদের বাড়ির পাঁচিলের পিছনে কখনও যাইনি, বাগানে, পাড়ার বহুস্থানে কখনও যাইনি আমাদের গাঁয়ে। উঠে পাহাড়ের ওপরে রোদে একটা পাথরে বসলুম। বাংলোর

ঠিক পিছনেই পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশ। তার একটু নীচের অংশে আমাদের বাংলো। এক মিনিটেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসলুম। আমার সামনে বিস্তৃত সারেন্ডা ও কোলহান শৈলমালা, আংকুয়া লৌহখনি লাল দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায়। সারেন্ডা পর্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে সারেন্ডা টানেলের মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চলে গিয়েচে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে। ওই পর্বতমালার ওপারে বহুদূরে ঘাটশিলা, যেখানে কল্যাণী রয়েচে। তারও বহুদূরে ওপারে বারাকপুর, আমার উঠানে ছায়া পড়েচে, কুঠির মাঠের সেই জলাভূমিটি, তিনু যেখানে ধান করেছে, যার ধারে জেলেরা জমি চষেচে এবার দেখে এলাম—ওদের কথা মনে পড়ে গেল। ওই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ওইদিকে কোথায় সেই বনমধ্যস্থ গুহা, ওইদিকে কোথায় সেই অতি সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, কোথায় সেই বাঘের পায়ের থাবা আঁকা সেগুনবন,কোইনা নদীর গর্ভস্থ পাষাণময় স্থান জাতিসিরাং, দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা। বিশ্বদেবের উপাসনা এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক।

চা খেয়ে বেড়াতে বার হই। গিরিনবাবুর সঙ্গে দেখা, দেবীবাবুর শ্বশুর। অনেকদিন আগে পোসোইতা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ইনি আমায় জঙ্গল দেখাবেন, একসময় ধারণা ছিল। হরজীবন পাঠক এখানকার একজন লক্ষপতি কাষ্ঠব্যবসায়ী। মোটা মোটা শাল কাঠ পড়ে আছে বহুদূর পর্যন্ত স্টেশন ইয়ার্ডে। বনস্পতি উচ্ছেদ করে এ ব্যবসা আমার পোষাবে না। যিনি বনস্পতিতে আছেন, আমি তাঁকে মানি। মনে হবে প্রাণীহত্যা করচি। অরণ্যের সৌন্দর্য নষ্ট করচি। তবে কথা এই B.T.T. কোম্পানি জঙ্গল উজাড় করে পয়সা লুটে ইংলন্ডে পাঠাচ্চে। আমাদের দেশের লোক হরজীবন পাঠক কিছু খায় তো ভালই।

কোইনা ও কোয়েল নদীর সঙ্গমস্থান দেখতে গিয়ে বেলা গেল। প্রকাণ্ড বড়খ্রিস্টান মিশন নদীর ধারে। তারপর নৃসিংহদাস সাধুজীর আশ্রমে গিয়ে বসলুম; বেশ শান্তিপূর্ণ স্থান, দক্ষিণ কোয়েল নদীর তীরে। নৃসিংহদেবের মূর্তি আছে মন্দিরে, সাধুজীর এক চেলা এখন মোহান্ত, উনি মারা গিয়েছেন এক-দেড় বৎসর। আরা জেলার এক পণ্ডিতজী—বড় দীন, বিনয়ী—হরজীবন পাঠককে খুব খাতির করলে। জী সরকার, বৈঠিয়ে, জী সরকার, দেখিয়ে।

এত ভাল লাগলো কেন পণ্ডিতজীকে? বল্লে—সাধুজী যব রহতে তব মেজাজ একদম গদ্‌গদ্ হো যাতা। বহুৎ রঙ্গিলা সাধু থে। পণ্ডিতজী খোশামোদ করচে পুনঃপুনঃ লক্ষপতি ধনী হরজীবন পাঠক ও মোহান্তজী দুজনকেই। রোজ সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত সম্ভবত আশ্রমে এসে বসে, গল্প করে, প্রসাদ-ট্রসাদ পায়।

নৃসিংহদাস সাধুর ইষ্টদেবতা এক রুদ্র শিলামূর্তি। তিনি নাকি সব বাড়ি বাগান তাকে করে দিয়েচেন। সুন্দর ফলের গন্ধ বেরুচ্চে বাগানে। চাঁপা, মল্লিকা, আম, হেনা, দারুচিনি, এলাচ—সব গাছ আছে এ বাগানে। সাধুজী আমাদের পানজেরি ও কলা দিলেন প্রসাদ স্বরূপ। পানজেরি কখনও খাইনি, দেখলুম ধানের গুঁড়ো আর চিনি। আশ্রমটি সত্যিই ভাল লাগলো।

বাড়ি এসে উঠলুম, রাত আটটা। মন্মথদা আজ আমার চিঠি পেয়েচে, কল্যাণীও পেয়েচে। মন্মথদার বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চয়ই সব বসে গল্প করচে, আমার চিঠিখানা পড়চে।

আজ সকালে উঠে রোদে বসে খানিকটা লিখি 'দেবযান'। তারপর কোলবোংগার পথে যেতে পাঞ্চেমগুটু বলে একটি গ্রামে পাহাড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসলুম। সুলেমান কারকাট্টা ও মিঃ সিন্‌হা বস্তি তদারক করছিলেন, সেই সময় আমি পাশের পাহাড়টাতে গাছের ছায়ায় বসি। সামনে বেশ সুন্দর দৃশ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা গাছ ঠিক চাঁপাগাছের মত, কিন্তু একটি ছেলে বল্লে ওতে ফুল হয় না, ছোট ছোট বীচিমত হয়—অর্থাৎ Mendcandia exerta, এই গাছ এ দেশে সর্বত্র, দেখতে চাঁপা গাছের মত। ছেলেটির নাম দিবাকর দাস, হিন্দিতে কথা বলে, জাতে তাঁতি। এদেশে হিন্দু হোলেই তাঁতি হবে, নয়তো গোঁসাই হবে। বাকি সব হো আর মুণ্ডা। ভাষা হো ছাড়া আর কিছু নেই—তবে একটু শিক্ষিত লোকে হিন্দি জানে। ছোকরা চাকুরি চায় এক্সপোর্ট নাকার গার্ড। বলে দিলুম চাকুরির জন্যে। যদি ওর হয় বড় আনন্দ হবে আমার।

কোলবোংগা গ্রামে সেই গোঁসাই-এর বাড়িটা ওই পাহাড়ের মাথায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর গেলুম। সেদিন যে নদীগর্ভে বসে চা খেয়েছিলুম পাথরের ওপর, তার নামটি বেশ ভাল—'মহাদেব শাল'। ওটা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে ঘন লতাদোলানো নিবিড় জঙ্গলের পথে আবার দুটি নদী পার হলুম—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গভীর বনচ্ছায়ায় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। সকালে কত কি পাখি ডাকচে বনে বনে। নিস্তব্ধ বনানী, একই দৃশ্য সারেন্ডার ঘনজঙ্গলে। সাড়ে পাঁচ মাইলমাত্র দূর মনোহরপুর স্টেশন থেকে, অথচ কি নিবিড় বন। ধলভূমে এমন বন নেই কোথাও।

ফিরে আসতে কোইনা নদীর ধারে একস্‌পোর্ট নাকার অপিসে তদারক করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে স্নান করে কিছু বিশ্রাম করলুম। পাহাড়ের ওপর বাংলোর পিছনে গিয়ে বসি রাঙা রোদভরা বিকেলে। চারিদিকে স্তরে স্তরে ঘননীল শৈলশ্রেণী, একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে আর একটা, থই থই করচে শুধুই পাহাড়। ডাইনে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে রাঙা লৌহপ্রস্তর বার হয়ে আছে—ওই হোল চিড়িয়া খনি। বেঙ্গল স্টিল কোম্পানি ওখান থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে এনে ছোট রেলযোগে মনোহরপুর এনে ফেলচে স্টেশনের পাশে। কত কথা মনে পড়লো পড়ন্ত রোদে দূরের শৈলশ্রেণীর দিকে চেয়ে। কল্যাণী রয়েচে কতদূরে, কি এখন করচে, ওর জন্যে মন হয়েছে ব্যস্ত। আর পাঁচদিন কোনোরকমে কাটলে হয়। গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, 'যতবার আলো জ্বালাতে যাই' সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধ হয় আজই হবে। আজই আবার গোপালনগরের হাট, এতক্ষণে পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়োর দোকানে লেগেচে ভিড়। সেই ছায়াভরা বনপথে ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে হয়তো। ১৯৩৫ সালে আজকার দিনে আশুতোষ হলে কবি নোগুচির বক্তৃতা শুনেছিলুম আর ভেবেছিলুম গ্রামের নাজন হয়তো নদীর ধারে মাঠে কলা-বেগুনের ক্ষেতে গরু চরাচ্চে। আজও তাই ভাবচি, দূরে গেলেই দেশের কথা আমার মনে পড়ে। কল্যাণী দেশে যেতে চায়, ওকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে মিঃ সিন্‌হা, আমি ও হরজীবন পাঠক আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। সুন্দর লতাবিতান, কত ফুল-ফলের গাছ। নদীর ধারে নিভৃত কুটির-মধ্যে বিশ্রামের জন্য বেদী, হেনা ফুলের সৌরভ। পবিত্র পুরনো তপোবনের শান্ত পরিবেশে। খাঁটি ভারতীয় সভ্যতা ও আবহাওয়া। নৃসিংহদাস বাবাজির সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেচে, সেখানে তাঁর চেলা বসে গাঁজা খাচ্চে সন্ধ্যায়। নদীর ধারে লতাকুঞ্জমধ্যে ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়ে যায় এই জায়গায় এসে। সাধুজির কাছে বসলুম, তিনি আসনে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়চেন, ধুনি জ্বলচে সামনে। ইনিই বর্তমান মোহান্ত।

ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীর চাটুজ্যের বাড়ি এলুম আমরা সবাই। সুধীরবাবু অতি বিনয়ী, আমরা গিয়েচি বলে বড় খুশি। চা এনে দিলেন, ঘন ঘন পান ও সিগারেট দিলেন। সরল, অমায়িক ভদ্রলোক—আমাদের দেশের মত কথার টান। বল্লেন— একসঙ্গে বসে দুটি খাবো বড় ইচ্ছে ছিল, তা হোল না। আপনি দয়া করে আমার এখানে এসেচেন।

অনেকদূর পর্যন্ত উনি আর হরজীবনবাবু আর একটি ছোকরা সঙ্গে এলেন। সুধীরবাবু পানিতরের কথাও জানেন, আমার প্রথম শ্বশুরবাড়ি। বল্লেন—'পান্‌তর', বাবা যেমন বলতেন। কতকাল পরে ওই গ্রামের ওই উচ্চারণ শুনলাম এতদূরে বসে।

বিশ্বদেবের জয় হোক।

সকালে মনোহরপুর থেকে এখানে আসবো, হরজীবন পাঠক ও সুধীরবাবু এসে খুব গল্পগুজব করলেন। আমি আর কখনও মনোহরপুর আসি না আসি, বাংলোর পেছনের পাহাড়টাতে উঠে বসে রইলুম পুবদিকে চেয়ে।

খেয়ে বেলা দুপুরের পর মোটরে উঠে কোলবোংগার পথে পোংগা আসবো, এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড আমাদের অতি দুর্গম ও ভীষণ কাঁটাজঙ্গলের পথে বাঁশবন দেখাতে নিয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে লুবড়া নালা ভ্যালিতে। অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে পৌঁছে আমি বনের মধ্যে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসলুম, মিঃ সিন্‌হা, রেন্‌জার সুলেমান কারকাট্টা ও ফরেস্টার—ওরা সব নীচে চলে গেল। সুলেমান বল্লে—বহুৎ steep নালা, আপ তো উতারনে নেহি সকঙ্গে—

আমি বসে দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা দেখচি সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে। এমন সময় ওরা ফিরে এল, আমার জেদ ধরে গেল যে ওরা যা কোরেচে আমিও তা পারবো। এই জেদ থেকেই সারেন্ডা পর্বতারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর এমন কি সুন্দরতম স্থানের আবিষ্কার করা সম্ভব হোল।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—আসুন, আসুন—দেখুন কেমন সিনারি। আমি গিয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। মাত্র চল্লিশ ফুট নেমেচি যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে। একখানা চওড়া পাথর যেন শূন্যে ঝুলচে, তার নীচে আরও কয়েক থাক প্রস্তরের সোপান, মাত্র হাত ছ-সাত—তারপরেই প্রায় ন'শো ফুট খাড়া নীচু উৎরাই—পাথর ফেলে দেখলুম চার-পাঁচ সেকেন্ড পরে তবে প্রথম পতনের শব্দ পাওয়া যায়, তারপরে গুরুগম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যে কোন্ অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা হয় না, মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ওই অত্যন্ত নীচে উপত্যকার মেঝেতে,

যেখানে বন্য বাঁশঝাড়, আরও কত কি গাছের মাথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখা যাচ্চে। আমাদের এই পাহাড়টার উচ্চতা ২২২৬ ফুট, ১৫০ ফুট আর উঠতে হয়তো বাকি, সবটুকুই উঠেচি তা ছাড়া। সামনে ৯০০ ফুট খাড়া নীচু উত্রাই সরল রেখায় নেমে গিয়েচে আমাদের সামনে ১৬৫৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা—আমাদের নীচে একটু ডানদিকে ঘেঁষে। সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ, মেষলোমের মত বৃক্ষশীর্ষে ভর্তি। তার ওপারে স্তরে স্তরে উঠেচে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত। আমাদের এই Vantage point-টি একটি খাঁজে অবস্থিত...দুদিকে চলে গিয়েচে বনাবৃত দুই শৈলবাহু বহুদূর পর্যন্ত। বাঁদিকের বাহুতে অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে বহু স্থানে, একটা বটগাছ হয়েচে, আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলচে। ওই একটা শিববৃক্ষ আমাদের কত নীচে ডানদিকে, ওই মনোহরপুর টাউনের অস্পষ্ট সাদা সাদা বাড়িগুলি দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাচ্ছে, কোলবোংগার পাহাড়টা সমতলভূমির সঙ্গে মিলে সমান হয়ে গিয়েচে এতদূর থেকে।বনভূমি নিনাদিত হচ্ছে ময়ূরের কেকারবে, নিম্নের উপত্যকার জঙ্গলে। এই নির্জন গহনারণ্যে ময়ূরের কেকারব ওপরে দ্বিপ্রহরের নীলাকাশ, বহু বহু নিম্নে সংকীর্ণ উপত্যকায় পার্বত্য ঝর্ণা লুবড়া নালার কালো খাত—আমাদের আশেপাশে বিশালবনস্পতিশ্রেণী, আমলকী গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত প্রস্তরময় অংশ, চীহড় লতা, রামদাঁতনের কাঁটা লতা, শূন্যে ঝোলা একটি কি গাছ আমাদের সামনে—এক ধরনের লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল পর্বতসানুতে, যেন এক বিরাট চিত্রকরের বিরাট ছবি। কি অপূর্ব দৃশ্য চোখের সামনে মুক্ত হলো! না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য কিছুই বোঝানো যাবে না। আমাদের কত নীচে বাঁশবনে পাখি উড়ছে একদল। ন'মাইল এ স্থান মনোহরপুর থেকে। তারপর অতি কষ্টে বহু দুর্গম কাঁটাবন ভেঙে আবার মোটরের কাছে এসে পৌঁছলাম। পথ-প্রদর্শক না থাকলে অসম্ভব নামা পুনরায় পথে। ফরেস্ট রেন্‌জার পথ হারিয়ে গেল। আমরা অন্যদল অন্যপথে ভুলে চলে গেলুম। নামচি, নামচি—রাস্তা আর আসে না। তেমনি রামদাঁতনের কাঁটালতা সর্বত্র—পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল কাঁটায়। এই স্থানে কখনও কেউ আসেনি আমি বলতে পারি।

মিঃ সিন্‌হা এ পথে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে—ঠিক এমনি সময় কোলবোংগা থেকে সাইকেলে। যতই অগ্রসর হই বোংগার দিকে, সেই ঘোর জঙ্গলের মূর্তি দেখে মনে হয় এ দেখচি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই পথে একটি তরুণ যুবক একা কি ভাবে এসেছিল তাই ভাবি। তিনি তখন নব বিবাহিত, পথের চেহারা দেখে ভয়ে উইল করতে চাইলেন, এক এক স্থানে এমন জঙ্গল যে চারিধার থেকে চেপে ধরচে ঘোর জঙ্গলে। ঝর্ণার জল খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে এই পোংগায় এসে পৌঁছোন। এক দিকে একটা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর—অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলুম একটা খোলা জায়গায়। সুরগুঁজার ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে দেখে মনে হোল লোকের বাস দেখচি রয়েছে এখানে। এইখানে B.T.T. কোম্পানির করাতের কারখানা ছিল আগে। জায়গাটার নাম হোল পোংগা। এই ব্রিটিশ কোম্পানি সিংভূমের এ অঞ্চলের বনভূমির যাবতীয় কাঠ কেটে চালান দিচ্চে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। এদের শেয়ার-হোল্‌ডারদের মধ্যে পার্লিয়ামেন্টের মেম্বার পর্যন্ত আছে। একটা খুব বড় চালাঘরে এদের ফরেস্ট ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার থাকে। কেরানীদের থাকবার জন্য একটা ধাওড়া ঘর আছে। দু-একজন বাঙালি মেয়েকে যেন দেখলাম, তবে ঠিক বলতে পারি না।

তারপর মাইল খানেক এগিয়ে এসে আমরা উসুরিয়া বলে একটা জায়গায়, মিঃ সিন্‌হা যে ঘরে থাকতেন ১৯২৫ সালে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে বসবাস নেই। কিন্তু অপূর্ব সুন্দর স্থান। উসুরিয়া বলে একটি পাহাড়ি নদী বয়ে যাচ্ছে খুব শব্দ করে, বেশ চওড়া নদী—অসংখ্য পাথর ছড়ানো। একদিকে কি সুন্দর বনেরবড় বড় গাছ ও পাষাণময় উচ্চ তীর। অপরাহ্নের ছায়া পড়ে এসেচে, রোদ হলদে হয়েচে—পানিতরের তেতলা বাড়ির ছোট্ট ঘরটা যেন এখান থেকে দেখা যাচ্চে। অনেকক্ষণ নদীর ধারে বসে রইলুম, কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গী। যেদিন ভারতে প্রথম বেদগাথার উদাত্ত সুর ধ্বনিত হয় উসুরিয়া ঝর্ণা তখন বহু বহু প্রাচীন। বেদপারগ ও রচয়িতা ঋষিদের অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের শৈশবেও এএমনি বয়ে চলতো ঘনতর বনানীর মধ্যে, আপনাতে আপনি মত্ত, চপল খুশিতে ভরা বন্য মেয়ের মত প্রাণোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে ছুটে ছুটে, আজকার দিনের মত তখনও তারদুধারে ফুটতে দেবকাঞ্চনের ফুল, বন্য-শেফালী, পাষাণের তটে কত শরৎ ও হেমন্ত সকালে ঝরা ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিতে আজও যেমন দেয়, কত চাঁদ উঠেচে, কত পাখি গেয়েচে ওর দুধারের শৈলারণ্যে। সে কি প্রাণ-মাতানো কুহুকুহু ধ্বনি, বাঁদিকের বাঁকে বড় বড় গাছের মাথায় কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার কচিপাতায় হল্‌দে রোদমাখা সে কি সৌন্দর্য, কি শান্তি, কি নিস্তব্ধতা—কাদা নেই, ধুলো নেই— শুধু পাষাণময় তীর, উপলবিছানো নদীগর্ভ। এইসব স্থানে প্রাচীন দিনে তপোবন ছিল নইলে আর কোথায় থাকবে?

এরই কাছে ঘন বনের মধ্যে বনবিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে (Preservation plot) ১৮০/২০০ বছরের পুরানো শালগাছ দেখলুম। আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তার আগে থেকেও এ গাছ এখানে রয়েচে তবে তখন ছিল চারা মাত্র।

বনস্পতিদের যারা দেখেনি, তারা উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্র 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' এ কথার মর্ম বুঝবে না। সন্ধ্যার আগে আমরা অপূর্ব সুন্দর বনপথে ছোটানাগরা এলুম। সামনে গুয়ায় উঁচু পাহাড়, আগে ভেবেছিলুম সলাইয়ের চিড়িয়া খনির। রাঙা পাথর বার করা জায়গাটা যেমন মনোহরপুর বাংলোর পাহাড় থেকে দেখা যায় তেমনি। সুন্দর জায়গাটি—স্টেশন থেকে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে, চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বনে ঘেরা স্থানটি—তবে একটা বন্য গ্রাম আছে, তারা বাজরা সরগুঁজা ইত্যাদি বুনেচে ক্ষেতে। পোংগা থেকে ছোটানাগরার এই রাস্তাটির অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, একদিকে বড় বড় পাথর ও নির্জন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পদে পদে সৌন্দর্যভূমি সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেচে উসুরিয়া নদীটি—বাঁদিকে ঘন বন, কম্‌প্রিটাম ডিকেনডামের মোটা মোটা লতা গাছের মাথায় ঠেলে উঠে এদিকে ওদিকে নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে দুলচে, যেমন উসুরিয়া নদীর দুধারে উঁচু মাস্তুল-সমান বনস্পতিদের মাথায় এমনি লতা দুলছিল, সাদা সাদা কচি পাতার সম্ভার নিয়ে, যেন সাদা ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে গুয়া পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদিক দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসে পড়েচি। এই পাহাড়ের ওপারে গুয়া, steep রাস্তা দিয়ে উঠে বনের মধ্যের পথে সাড়ে ছ' মাইল মাত্র, কিন্তু মোটরের রোড দিয়ে বাইশ মাইল।

আমি বললুম—তবে শশাংদাবুরু এখান থেকে কেন দেখা যাবে না? তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—সেদিন শশাংদাবুরুর মাথা থেকে আমরা ছোটানাগরা দেখেছিলুম—এখান থেকে কেন শশাংদাবুরু দেখা যাবে না?

গুয়ার সমশ্রেণীতে যে পাহাড় টানা চলে গিয়েচে—তারই এক জায়গায় শশাংদাবুরু খুব উঁচু—আমরা ঠিক করলুম।

সন্ধ্যায় একটি ঝর্ণার ধারে নিবিড় অন্ধকার বনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে বসি। সারেন্ডার সব স্থানই ভাল, কত সহস্র beauty spot যে এর মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো—তা কে বলবে? আমার আবার সব জায়গাই ভাল বলে মনে হয়, সুতরাং চারিদিকেই beauty spot-এর ভিড়ে দিশাহারা হয়ে আছি। নক্ষত্র উঠেচে অন্ধকার আকাশে বনস্পতিশীর্ষে। চলে এলুম তাড়াতাড়ি, কি জানি হাতিটাতি আসতে পারে।

বড় শীত। আগুনের পাশে বসে সারদানন্দের 'রামকৃষ্ণদেবের জীবনী' পড়ি।

আজ সকালে উঠেচি খুব ভোরে। সূর্য তখনও ওঠেনি। বেশ শীত। চা খেয়ে বসে লিখচি। তার পরে সালাইয়ের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের গায়ে হেন্দেসিরি পাঠকজীর saw-mill দেখতে গেলুম। কাছেই একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, নির্জন বনে ঘেরা beauty spot তার মধ্যে ছোট্ট কারখানাটি। একটা পাহাড়ের ওপরে মালিকের জন্যে এক ছোট্ট বাংলো করে রেখেচে, মাটির মেঝে গোবর দিয়ে রেখেচে। এখানে বসে লেখাপড়ার কাজ বেশ চলে।

বেলা একটার সময় ফিরে তেন্‌তারি ঘাটে গিয়ে কোইনা নদী পার হওয়া যায় কিনা দেখে এলুম। কোইনা নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে, প্রত্যেক বাংলোতে থাকতে। কেবল দেখা হয়নি তিরিলপপাসি থাকতে। অপূর্ব শোভা এই বন্য নদীর, তেন্‌তারি ঘাটেও তাই, বড় বড় পাথর বাঁধানো তটভূমি বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে। এক জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম।

Range Officer বল্লে, ছোটনাগরা নামের অর্থ এখানে একটা লোহার নাগরা বা ঢোল আছে বনের মধ্যে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষের চামড়া দিয়ে ঢাকা হোত এবং বাজানো হোত।

পথে আসতে মোটরের স্প্রিং ভেঙে গেল, বেলা তখন দুটো। এসে স্নানাহার করে কিছু বিশ্রাম করলুম। 'দেবযান' লিখি।

তারপর বেলা পড়লো—পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়ালে সূর্যদেব অস্ত গেলেন, চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা জায়গাটার কি চমৎকার শোভা হোল। আমরা একটু বেড়িয়ে এলুম পথ দিয়ে। একটা ঘাসওয়ালা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কাপড়ে ঘাসের বিচি লেগে গেল।

বাংলার পেছনে ছোট্ট টিলাটার পাথরের ওপরে বসলুম সন্ধ্যায়। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, বনের মাথায়, পুবদিকে গাছের আড়ালে পড়েচে সেই জ্বলজ্বলে নক্ষত্রটা, ফুলডুংরি থেকে সেদিন রাত্রে যেটা দেখেছিলুম। পশ্চিম আকাশে বনের পাথরে পাহাড়ের মাথায় অস্তদিগন্তের রাঙা আভা।

অসীম নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি। একমনে বসে যোগাসনে সেই বিশ্বস্রষ্টারকথা যাঁরা চিন্তা করেন, এইসব সন্ধ্যায়, এই সব বনানীর শান্ত পবিত্রতায়—তাঁরা সাধু, যোগী। তাঁদের কথা জানি না, তবে চারিদিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় মন ভরে

উঠলো বটে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। দূরের ক্ষুদ্র বারাকপুর গ্রামে এখন নদীতীরে ছায়া পড়েচে, দূর মাঠে পড়েচে, লিচুতলা ক্লাবে মন্মথদা ও যতীনদা বসে গল্প জুড়েচে—কল্যাণী ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্চে, কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

জীবনের কত অদ্ভুত রহস্য—অদ্ভুত পরিবর্তন! এমন স্থান এমন সময়ে জীবনটাকে ভেবে দেখবার অবকাশ পায় ক'জন? কর্মকোলাহলমুখর শহুরে মানুষ নিজেকে বুঝতে জানতে পায় না। এই নিস্তব্ধ গভীর বনপ্রান্ত, ওই শৈলমালা, অগণ্য নক্ষত্রদল মাথার ওপরে, সন্ধ্যার মায়া-আলো-মাখানো দিগন্ত, বনশীর্ষ, শৈলচূড়া, ঝিঁঝির ডাক—সবই মনকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে।

আজ শীত কম। অনেকক্ষণ বসে রইলুম পাহাড়টাতে। তারপর অন্ধকার ঘনীভূত হলো। মিঃ সিন্‌হা বাংলোর টেবিলে বসে লিখচেন দেখতে পাচ্ছি, হাতির বা বাঘের ভয়টা তত নেই এখানে।

উনি ডাকলেন—দাদা—

আমি বল্লাম—যাই—

আজ সকালে উঠে আমরা মোটরে সলাই বাংলোতে এলুম। পথে ছোটানাগরা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা লতা-ঝোপের মধ্যে দুটি লোহার ঢোল পড়ে আছে। একটা ছোট, এক ফুট ব্যাস বিশিষ্ট, অন্যটি আড়াই ফুট ব্যাস বিশিষ্ট। এই জঙ্গলে এক রাজা ছিল—তার নাম অভিরাম টুং। তার আমলে এখানে বাড়ি ছিল। ছোট ঢোলটা মানুষের চামড়া দিয়ে ছাওয়া হোত ও বাজানো হোত।

সলাই বাংলোটি বড় চমৎকার স্থানে অবস্থিত। বামে, সম্মুখে, অতি নিকটেই ঘন বনাবৃত পর্বতমালা দু'হাজার ফুট উঁচু। পর্বতের পটভূমিতে সামনেই খুব বড় মোটা প্রায় দশ ফুট ব্যাসযুক্ত গুঁড়িওয়ালা এক শিমুলগাছ। তার পেছনে অসংখ্য বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গিতে শাখাবাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েচে। প্রভাতের শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতপ্রকার বনবিহঙ্গের অদ্ভুত কূজন। বারান্দায় চেয়ার পেতে শুনচি একটা পাখি টুং টুং টুং টুং করে ডাকচে, আর একটা পোষা টিয়ার মত যেন বুলি বলচে, চোখ বুজে কান পেতে শুনুচি ও পক্ষীকুলের কলতান। বাম দিকের খুব উচ্চ পাহাড়ের এক জায়গায় অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে সামনের পর্বতগাত্রে—যেন মনে হচ্চে নীচেকারবনে বুঝি কেউ আগুন দিয়েচে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে পাহাড়ের গায়ে। বাঁদিকের পাহাড়ের নীচে কোইনা নদী বইচে পদে পদে সৌন্দর্যভূমি রচনা করে। ট্রলি করে লো যেতে যেতে ঘন বনের ডান দিকে দু জায়গায় এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় নদীগর্ভ বনের ফাঁকে চোখেপড়লো। তার ওপারে কম্‌প্রিটাম লতার ফুলফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর শোভা! সিংভূমের ও সারেন্ডার বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্যভূমি ভগবান যে ছড়িয়ে রেখেচেন, কৃপণের মত দু'একটাকে গুনে গেঁথে রাখেননি—ধনী দাতার মত দু'হাত পুরে ছড়িয়েছেন হাজারে হাজারে। এই পথ দিয়ে ট্রলিতে সন্ধ্যার পূর্বে ফিরবার সময় রাঙা রোদ মাখানো পর্বত ও বনানীশীর্ষে সামনের দুইয়া লৌহখনির অনাবৃত রক্তবর্ণ লৌহপ্রস্তরের পর্বতগাত্রে বহু উচ্চ শৈলশিখরে মোটা মোটা লতা দোলানো, অসংখ্য দেবকাঞ্চন ফুলফোটা, ময়ূর ও ধনেশ পাখির ডাকে মুখর অরণ্যানী দেখতে দেখতে ওই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে ঘন ছায়া পড়েছে বনে বনে, চারিধারে পাহাড়ের ছায়া—কোনো, অজানা বনপুষ্পের সুবাস অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে। আমি মিঃ সিন্‌হাকে বল্লুম—কিসের বেশ গন্ধ পেয়েছেন? Range Officer সুলেমান কারকাট্টা ছিল ট্রলিতে, সেও কিছু বুঝতে পারলে না। আংকুয়া জংশন থেকে চিড়িয়া মাইন্‌স পর্যন্ত একটা লাইন গিয়েচে, একটা গিয়েচে দুইয়া মাইন্‌সে। এ দুটিই বেঙ্গল আয়রন ও স্টিল কোম্পানির খনি। মনোহরপুর থেকে এই পনেরো মাইল এরা ঘন বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট লাইন পেতেচে এ দুই লৌহপ্রস্তরের পর্বত থেকে ore নিয়ে যাবার জন্যে, মনোহরপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ। কলকাতার ক'জন এই সুন্দর রেলপথটির খবর রাখে? আংকুয়া জংশনে একটা সেলুন পেলুম, তাতে চিড়িয়া মাইন্‌সের বড় সাহেব মিঃ মেরিডিথ যাচ্ছে। তার সঙ্গে গল্প করতে গেলুম। সে বল্লে, চিড়িয়াতে ফুটবল আছে, টেনিস আছে, রেডিয়ো আছে। আবার চলেচি ছোট্ট ট্রেনে বনপথে, বাঁদিকে হামশাডা নদী বনের পথে মর্মর শব্দে বয়ে গিয়ে কোইনাতে মিশেচে। চিড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সামনের বহু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া রেলপথ উঠেচে পর্বতশিখরে। Skip উঠেচে মোটা তারের বন্ধনে—রাঙা ধুলোমাখা হো কুলি মেয়েরা সর্বত্র কাজ করচে। আমাদের Skip দিয়ে ওপরে ওঠবার সময়ে বেশ লাগলো, কখনও

উঠিনি—কিন্তু ভয়ও করলো খুব। কল্যাণী কখনও উঠতে পারতো না এ পথে—ও যা ভীতু! ওপরের শিখরে উঠে নীচে চেয়ে সমতলভূমির অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। ১৪৩০ ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে দেখচি এমন ভাবে, ঠিক যেন একটা উঁচু বাড়ির ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে আছি। এ সব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

এই লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলমালা লেদাবুরু, অজিতাবুরু ও বুদ্ধাবুরু এই তিনটি নামে অভিহিত। এর সর্বোচ্চ শিখর হোল বুদ্ধাবুরু ২৭০০ ফুট উঁচু। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলগাত্র সেদিন পনেরো মাইল দূর মনোহরপুর বাংলো থেকে দেখেছিলাম। সৃষ্টির আদিম যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরি হয়েছিল কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল—কে বলবে! মাথা ঘুরে যায় এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় পর্বতাকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখলে। কি সে মহাশক্তি, কোন্ সে মহাদেবতা—এই সব বস্তুপিণ্ড যিনি লীলাচ্ছলে সাজিয়ে গিয়েচেন, কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েচে, এসবভূতত্ত্ববিদেরা বলবেন, আমরা শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েই আছি।

আমরা চলেচি আসলে 'আংকুয়া ২৯' নামক বনবিভাগের চিহ্নিত অংশে, একটি নাকি জলপ্রপাত আছে, তাই দেখতে। খনির খাদ হচ্ছে পাহাড়ের ওপারে, আমাদের সামনে আবার প্রায় ৪০০/৫০০ ফুট উঁচু খাড়া রেলপথে Skip উঠেচে আরও উচ্চতর পর্বত শিখরাঞ্চলে। রাঙা লৌহপ্রস্তরের ধূলিমাখা হো কুলি মেয়েরা হাসিমুখে কাজ করচে। এদের মধ্যে অনেকে দেখতে বেশ সুন্দর।

মাইল দেড় খনির করা Workings-এর মধ্য দিয়ে হাঁটবার পরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম—এসব রিজার্ভ ফরেস্ট। ধনেশ পাখি ডাকচে বনে। সেই যে একপ্রকার কাঁটাওয়ালা ফল, ওকড়া ফলের মত, যা কাপড়ে লেগে সেদিন টোয়েবু যাবার পথে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তা এখানেও লাগতে লাগলো। অতি দুর্গম পথ—একটি নালা ধরে নালার খাতের পাষাণ বাঁধানো—একদম লৌহপ্রস্তর বাঁধানো—গর্ভ দিয়ে বড় ছোট পাথর ডিঙিয়ে নামচি, নামচি, নামচি। ফরেস্ট গার্ডকে বলচি আমরা, ও Falls কেত্না দূর?

সে প্রথমে বল্লে—এক মাইল। এখন বলচে দেড় মাইল। তারপর পথ যতই দুর্গম হয়ে আসে, ও ততই বলে, দু'ফার্লং।

কিন্তু একেবারে বিরাট Wilderness-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ি ঝর্ণার পাষাণময় গতিপথ বেয়ে নামচি, নামচি—আশেপাশে চেয়ে দেখচি তৃণ, পান্জন, বট, আসান, শিববৃক্ষ (Sterculia urens) পান, আরও কত মোটা মোটা লতা, কম্প্রিটাম লতা, বন্যকন্দ, বন্য অশ্বগন্ধা—কত কি গাছপালা। এক জায়গায় বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, ঝর্ণার জল পড়ে একটা গর্ত-মত সৃষ্টি করেচে পাথরের ওপর। ছোট্ট একটি গুহাও।

ফরেস্ট গার্ড একটা জায়গায় এসে বল্লে—আওর তিন ফার্লং।

সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েচে। নালাটা হঠাৎ চল্লিশ ফুট ওপর থেকে নীচে পড়ে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি করেচে এবং গভীর থেকে গভীরতর খত কেটে ক্রমনিম্ন খাড়া ঢালু পথে বহু, বহুদূরে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—দূরে জলপতনধ্বনি শুনতে পেলুম বটে।

অদ্ভুত, গম্ভীর এই স্থানের দৃশ্য। বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখলুম আরও তিন ফার্লং গিয়ে আজ ফিরতে পারবো না। চিড়িয়া খনির Skip বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুর্গম ঢালুপথে হেঁটে নিচে নামবে কে?

ফরেস্ট গার্ড বল্লে—জলপ্রপাত ওখান থেকে দেখা যাবে না। ঢালুপথে অনেকটা নামতে হবে—তিন ফার্লং গিয়ে, তবে দেখা যাবে।

তিনটে বেজেছে—'আংকুয়া ২৯'Falls মাথায় থাকুক্। ১৭৬০ ফুট পর্বতশিখর যেখানে বসে আছে, পার্বত্য ঝর্ণা সেই গভীর খাতের একেবারে প্রান্তে। সুলেমান কারকাট্টা বল্লে ম্যাপ দেখে—এ জায়গাটা ১৭৬০ ফুট উঁচু।

সেখানে বসে টিফিন বক্স থেকে বার করে পুরী, কাটলেট, কলা ইত্যাদি খেলুম। ফরেস্ট গার্ড দুটি খড়কুটো জ্বালিয়ে চা করলে। মহিষের দুধের মাখন জমে গিয়েচে শীতে, মাখন-চা হোল।

এ খেয়ে সেই বনের পথে আবার ফিরলুম। কি ভীষণ নিস্তব্ধ জনহীন Wilderness। যে এসব না দেখেচে, তাকে এর গাম্ভীর্য কিছুই বোঝানো যাবে না। সারেন্ডা অরণ্যের অন্তরালে হাজারো সৌন্দর্যভূমি ছড়ানো—আমি আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলুম বন দেখতে! আবাব সেই কাঁটাওয়ালা ফল—এদেশী নাম 'মিন্ডো জোটে', কাপড়ে জামায় লেগে ভারী হয়ে

গেল। উঠচি, উঠচি—চড়াইয়ের দুর্গম পার্বত্যপথ। অতি কষ্টে চলেচি, ঘন ঘন হাঁপাচ্চি। কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের বন-মোরগ পালিয়ে গেল।

খনিতে এলুম, বেলা পড়েচে, কি সুন্দর সমতলের দৃশ্য। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের শৈলগাত্রেরই বা কি ভীমদর্শন চেহারা। এক জায়গায় অনেকখানি কোয়ার্টজাইট পাথর বেরিয়ে আছে অনেক ওপরে—যেমন নিচের ঝর্ণার দুধারে অনেক জায়গায় অতি অদ্ভুতভাবে ছিল। Skip দিয়ে একটি তরুণী হো মেয়ে উঠে এল বেশ শান্তভাবে। যারা কখনও Skip-এ ওঠেনি তাদের মূর্ছা যাওয়ার কথা। আমরা নামচি, অনেকগুলি রাঙা ধূলিমাখা কুলি মেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখচে, এঞ্জিন ড্রাইভারকে বলচে—ঠারো, ঠারো।

নামবার সময়ে ঢালুর দিকে চেয়ে ভয় করলো—যেন কোন্ নরকে নেমে চলেচি। যদি শেকল ছিঁড়ে যায়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ট্রেনে এলুম আংকুয়া জংশন—ট্রলিতে সেই অপূর্ব বনপথে এলুম সবাই। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে সামনে থেকে ট্রলির বেগে, বনপুষ্পের সুবাস বাতাসে, দুপাশে বনে বনে অজস্র দেবকাঞ্চন (Bohinia purpuria) ফুল ফুটে। ধনেশ পাখি ডাকচে বনে। বাঁদিকে কোইনা নদীর ওপারে পর্বত-শীর্ষে ও বনস্পতি-শীর্ষে রাঙা রোদ। সলাই বাংলো তিন মাইল, ওখানে আমাদের মোটর আছে।

ওই সামনে দুইয়া খনির শিখরদেশ দেখা যাচ্চে রাঙা দগ্‌দগে ঘা'র মত সবুজ শৈলগাত্রে—ঠিক সবুজ নয়, ধূসর শৈলগাত্রে।

এ বনে যজ্ঞডুমুর ও শিমুল, আম ও পানজন গাছ অনেক, আলোকলতা ও চটিজুতোর মত ফলবিশিষ্ট সেই গাছটাও যথেষ্ট। শেষোক্ত গাছটা আমাদের বারাকপুরের ভিটেতে আছে।

মনেও পড়লো বারাকপুরের কথা—কুঠির মাঠে শীতের অপরাহ্ণ নেমেচে, আলকুশীর লতা দুলচে বনে ঝোপে, ইন্দু রায় তার বাড়িতে বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করচে—বেশ দেখতে পাচ্চি।

সলাই থেকে তখনি মোটর ছাড়া হোল। সুলেমান কারকাট্টাকে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলুম—নতুবা সাইকেলে এই সন্ধ্যায় সলাই থেকে ছোটানাগড়া সাড়ে সাত মাইল ভীষণ বনের পথে যেতে হবে। হাতির বড় ভয় এ সময়। বাঁদিকে সেই সুউচ্চ প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু পর্বতমালার দিকে চেয়ে আছি। মোটর ছুটচে বেগে, কখনও ঘনবনে ঢুকচে কম্‌প্রিটাম লতার সাদা কচি পাতা দোলানো ঝোপের মধ্য দিয়ে, কখনও উঠচে, কখনও নেমে পার্বত্য নদী পার হচ্চে। আমি দেখচি বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাও খানিকটা অনাবৃত পর্বতগাত্র, কোথাও একটা গাছ। এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্চে, ওকে হয়তো কাল দেখবো।

অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ির ওপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না—যে ছিল, অনেক কাল আগে সে কোথায় গিয়েচে। গৌরী—তার কথা মনে হচ্চে আজ সন্ধ্যায়। এই সময়ে সে মারা গিয়েছিল আজ বিশ বৎসর আগে। ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুদিকের বন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিড়তর দেখাচ্চে, সেদিনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি পার হলুম, যার ধারে লতাকুঞ্জে রাজা অভিরাম টুংয়ের ঢোল পড়ে আছে।

অনেক রাত্রে একবার আমি বাইরে এলুম, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নক্ষত্রসমূহ ঠিক হীরকখণ্ডের মত জ্বলচে, গুয়ার পাহাড়ের মাথায় একটা নক্ষত্র দপ দপ করচে, একবার নিবচে আবার জ্বলচে যেন। আকাশে নক্ষত্রসমূহের এমন দীপ্তি বাংলা দেশে তো দেখিই নি, এমন কি মনে হয় ঘাটশিলাতেও দেখিনি।

একটা সারেন্ডা বা সিংভূম দর্শনেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অমন কত অনন্ত কোটি beauty spot ছড়ানো রয়েচে, ওই সব নক্ষত্রে নক্ষত্রে কি বিচিত্র জীবনধারা, আত্মার অনন্ত গতিপথে ওদের নিয়েও তাঁর লীলা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বন পাহাড়ের মাথার ওপরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলা, শুধু তার কথাই মনে আনে।

সকালে উঠে দেখি খুব কুয়াশা হয়েছে, সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশার রাশি উপত্যকা থেকে উঠচে ওপরে, গুয়ার পাহাড় ঢেকে দিলে। বড্ড শীত। পাহাড়ের নীচে বনশ্রেণী কুয়াশায় ঢাকা, ধীরে ধীরে সূর্য উঠলো। সূর্যদেবকে প্রণাম করলুম।

আজ এখান থেকে চলে যাবো। সারেন্ডা অরণ্যের কাছে বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বৎসর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিনে দেখে ধন্য হয়ে

গেলাম। আজ ষোল দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেচি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েচি শহরের কলকোলাহলের পরে, তোমাকে প্রণাম করি। কত দেবকাঞ্চন ফুল, কত লুদাম, কত অপরিচিত নাম-না-জানা ফুল, কেকাধ্বনি, জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি জনহীন গহন বনে, সেই গুহা দুটি, কত বন্যলতার অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি, ধনেশ পাখির কর্কশ চিৎকার, ক্ষুদ্র barking deer-এর ঘেউ ঘেউ শব্দ, বন্য বানরের ডাক (যেমন কাল ডাকছিল আংকুয়া জলপ্রপাতের বনে), অপূর্বদর্শন বনাবৃত শৈলমালা, লৌহপ্রস্তরের বিশালকায় খনি—এ সব দেখবার শুনবার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্লভ তা আমি জানি। সেইজন্যে ভগবানকেধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এখানে এনেচেন।

আজ সকালে চা খেয়ে মোটরে রওনা হই গুয়াতে। গাড়ির স্প্রিং ভেঙে গিয়েচে বলে জিনিসপত্র কুলির মাথায় পাঠানো হোল গুয়াতে। মোটর ছেড়ে আসচি, পথে ঝর্ণার পথে কিছুদূরে আমাদের পাচক বিরশা চলেচে হেঁটে। কার্ডিনাল উল্‌সির কথা মনে হোল ওকে দেখে। আজ বনের পথে মোটর চলেচে। আমি ভাবচি প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে চাঁইবাসা গিয়ে ট্রেন ধরে আজই হয়তো রাত একটা-দেড়টায় বাড়ি পৌঁছে যাব। খুব আনন্দ হচ্চে আজ সারা পথটি। তেনতারি ঘাটে কোইনা নদী পার হলুম। এখানে সাত-আটজন কুলি আমাদের গাড়ি ঠেলবার জন্যে অপেক্ষা করচে।

ঘন জঙ্গলের পথে যাবার দিনের সেই কুম্‌ডি রাস্তার মোড়ে এলুম। বরাইবুরু বলে যে গ্রামটি কারো নদীর ধারে সেটি ছাড়ালুম। গুয়া এলুম মিঃ রাসবিহারী গুপ্তের বাড়ি, সেখানে মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা দেবী ও আরও কয়েকটি মহিলা দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। মিসেস্ গুপ্ত পরিতোষ করে আমাদের খাওয়ালেন। অনেকদিন পরে যেন সভ্যজগতে এসেচি বলে মনে হচ্চে। আমরা তিনটের সময়ে মোটরে রওনা হই, বরাইবুরুতে কারো নদী পার হয়ে জামদার পথে চল্লুম হাটগামারিয়া। আজ হাটবার গোপালনগরের, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সেকথা মনে পড়লো। পঞ্চা মাস্টার বেগুন বিক্রি করচে ইঁদারার ওপরে বসে। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। পিছনে দেখা যাচ্চে কেউন্‌ঝর রাজ্যের পাহাড় ও বন, বামে কোল্‌হান ও সারেন্ডার শৈলমালা। হাটগামারিয়া এসে পরেশবাবুর আপিসে আমরা চা খেলুম—তারপর কেঁদ্‌পোসি স্টেশনে এলুম ট্রেন ধরতে। আমি এখান থেকেই যাব ঘাটশিলায়। আজই যাবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন। মণীন্দ্র নন্দীর নাতি আলাপ করলেন। তিনি এখানে চীনামাটির খনির ম্যানেজার। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাকি তার খুব ভাল লেগেছে।

ট্রেনে উঠলুম, লেখা আছে ইন্টার ক্লাস, কিন্তু কাজে সেকেন্ ক্লাস, বেশ আরামে বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' পড়তে পড়তে এলুম—মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে ভাবি। এতক্ষণ হাট শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সব বাড়ি ফিরচে। লিচুতলায় আড্ডা বসেচে। বিরশার সঙ্গে আবার দেখা চাঁইবাসা স্টেশনে। ডাক-আরদালি কামরায় এসে সেলাম করে বকশিশ চাইলে।

বড্ড দেরি করে ট্রেন টাটায় এল। রাঁচি এক্সপ্রেস ছেড়ে গিয়েচে—সারারাত্রি ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে কাটালুম। নৈহাটির এক গার্ড এখানে কি করচে, তার সঙ্গে সারারাত গল্প করি। দুজন ছোকরা ওয়েটিং রুমে আমায় চিনতে পেরে বসবার জায়গা করে দিল।

রাত শেষ হয়ে গেল। ৬টায় ট্রেন এল, ভীষণ শীত। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাটশিলায় এলুম। মনে খুব আনন্দ। ষোল দিন পরে বাড়ি ফিরচি, ঘি ও ধুনো হাতে ঝুলিয়ে চলেচি। শান্ত এসেচে বম্বে থেকে, প্ল্যাটফর্মে দেখা। ও গেল পুঁটুর কাছে। কল্যাণীরা ঘি দেখে খুব খুশি। বাড়ি আসতে সবাই খুশি।

উষা চিঠি দিয়েচে কাশ্মীর থেকে, অজিতবাবু চিঠি দিয়েচেন রাঙামাটি (চট্টগ্রাম) থেকে—বাড়ি এসে পেলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় শচীন ও ফণির সঙ্গে বসে বসে চালভাজা খাচ্ছিলাম। সারেন্ডাতে কত ভাল জায়গা দেখেচিতার একটি তালিকা ওদের কাছে বল্লাম। প্রথমে ধরি কুম্‌ডির পাশে কোইনা নদী; ২য়, শশাংদাবুরু; ৩য়, থলকোবাদ বাংলো; ৪র্থ, জাতি-সিরাং (Matrock);৫ম, ভানগাঁও ও বোনাই সীমান্ত; ৬ষ্ঠ, বাবুডেরা; ৭ম, বনশ্রী ও বাবুডেরা থেকে সাম্‌টা তেমাথার পথ; ৮ম, হেন্দেকুলি ক্যাম্প ও তৎপূর্বে সামটা নালার loop;৯ম, শিশিরদা জলা ও গুহাদ্বয়; ১০ম, থলকোবাদ বাংলো থেকে বনপথে কোইনা নদী ও তীরবর্তী বনভূমিতে কোইনা নদীর loop;১১শ, টোয়েবু জলপ্রপাত ও সেখানে যাবার বনপথটি; ১২শ, বিট্‌কেলসোয়া গ্রাম ও সেখানে যাওয়ার পথটি; ১৩শ, মহাদেবশাল ঝর্ণা ও কোলবোংগা গ্রাম; ১৪শ, নৃসিংহদাস বাবাজীর আশ্রম, মনোহরপুর; ১৫শ, হেন্দেসিরি; ১৬শ, ছোটানাগরা বাংলো; ১৭শ, সলাই বাংলো; ১৮শ, সলাই থেকে আংকুয়া যাবার পথ ও পাশে কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভ। ১৯শ, চিড়িয়া খনি; ২০শ, Lyall's look-out,রামদাঁতনের কাঁটালতা ভেঙে সেখানে গিয়েছিলাম; ২১শ, উসুরিয়া ঝর্ণা; ২২শ, বড় বড় শালের preservation plot,

২৩শ, আংকুয়া জলপ্রপাত; ২৪শ, সেচনের পয়োপ্রণালী; ২৫শ, বড়া নাগরা ও ছোটা নাগরা (ঢোল দুটি ও অভিরাম টুং রাজার ভগ্নমন্দির); ২৬শ, পোংগা, যে কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালে ছিলেন।

অনেকদিন লিখিনি। কাল সন্ধ্যায় ইন্দুবাবুর গাড়িতে ধলভূমগড় থেকে ফিরে এসেচি। ৫ই জানুয়ারি তারিখেও একবার গিয়েছিলুম। বড় ভাল লাগে, ও জায়গাটা। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের ঘরের সারি—এরোড্রামের লোকেদের বাসস্থান। শাল, মহুল, হরীতকী ছাড়া বিদেশী কোনো রোপিত ফুল ফলের বৃক্ষ নেই, কোঠাবাড়ি এক-আধখানার বেশি নেই। বাঁদিকে দূরে চারচাকীর জঙ্গল দেখা যায়। শুকনো শালপাতার বেড়ার গন্ধ রোদ ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারচাকীর বনটি অতি চমৎকার, সেদিন যখন জ্যোৎস্না উঠলো আর কোনো বাড়িঘর দেখা যায় না—অত বড় বিরাট মুক্ত Sapce যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। যে কোনো সময় ঘরে বা বারান্দাতে বসে সামনে চোখে পড়ে ভাল্‌কী পাহাড় ও তার পটভূমিতে ঋজু ঋজু সুদীর্ঘ শালতরুশ্রেণী—কাল আবার মেঘ করাতে দৃশ্যটি এত সুন্দর হয়েছিল। নীল হয়ে উঠেচে শৈলমালা। এখানে যদি কলকাতার শৌখিন লোকেরা বাড়ি করে টাউন বানাতো, বাড়ির নাম দিত 'সন্ধ্যানিবাস' 'অলকা' 'বনবীথি' 'Hill View' 'অর্ক নিলয়' 'Forest' 'Side'ইত্যাদি, বালিগঞ্জ ফ্যাশানে সামনে ঢাকা টানা বারান্দা করতেকাঁচের প্যানেল বসানো, লম্বা জানালায় ফ্রেম বসানো, লতাপাতা আকারের লোহার রেলিং বসানো গেট বসাতো—তাহলেই এই শালবন ও শৈলশ্রেণী, লাল মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ ঢিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধুলো মাখাসাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমুলতলায় এবং নষ্ট হয়েছে খানিকটা ঝাড়গ্রামেও।

বারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুট্‌কের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্বে দ্বিজুবাবুর বাড়িতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি—ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ি গিয়ে 'তালনবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম 'Indian Arts and Letters'বলে পত্রিকা, যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই তিনটার ট্রেনে বনগ্রামে গিয়ে বন্ধুর বাসায় থাকি। টরু আছে এখানেই। ভীষণ শীত রাত্রে। লিচুতলায় মনোজবাবু, যতীনদা, মন্মথদার সঙ্গে জমাট আড্ডা। মিতে এসে বল্লে 'স্বপ্ন বাসুদেব' বড় ভাল লেগেচে। অন্ধকারে মনোজবাবু ও আমি মিতের সঙ্গে এলুম সুরেনের বাড়ি। সে এল অনেক রাত্রে। কত গল্প—বিশেষত সারেন্ডা বনভ্রমণের। সকালে উঠে নন্‌কুর আনা কেক ও pastry চা দিয়ে খাই। মিতের বাড়ি দুপুরে খেয়ে গৌরী ও মিতের সঙ্গে ভাগবদ্ প্রসঙ্গ আলোচনা করলুম। তারপর বারাকপুরে গেলুম। সজনে ফুলের সুগন্ধ সর্বত্র। ইন্দু ও শ্যামাচরণদার বাড়ি বসে গল্প করি। পরদিন নদীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। ঘুমিয়ে উঠে হারিকেন হাতে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজারে বা 'নগরে' গেলুম—যেমন ছেলেবেলায় দেখতুম অমৃত কাকাকে করতে। যেন আমি এই বারাকপুরের একজন চাষীবাসী গৃহস্থ, খাজনা আদায় করে বেড়াই। বারিকের বাড়ি থেকে ধান ও খাজনা আদায় করতে গিয়ে রস খাই ও বেগুন নিয়ে আসি তপোজ্জলের বাড়ি থেকে কাপড়ে করে—ঠিক গ্রাম্য গৃহস্থের জীবন। এখনও ছোট এড়াঞ্চির ফুল গাছে গাছে—একরকম কণ্টকলতার থোলো থোলো ফুলের কি সুবাস। সজনে ফুলের গন্ধ পথের বাতাসে।

বিকেলে মল্ল মাস্টারের বাড়ি গিয়ে বসলুম। মেলা স্কুলের ছেলেরা এল, ননী মাস্টার এল, শশধর মুহূরি এল। সারেন্ডা ফরেস্টের গল্প করি ওদের কাছে; চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ি চলে এলুম। যুগল ময়রার দোকানে একটা লেডিকেনির দাম চার আনা—তাই খেয়ে একটু জলযোগ করি।

এই সেই সময়—যে সময় ১৯৩৭ সালে আমি পাটনায় গিয়েছিলুম সভা করতে। শিবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। মোজার্টের minuet in c minor শুনছিলুম গঙ্গার ধারের বালির চড়ার দিকে চোখ রেখে। উড়ে বেয়ারা তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল খুকুদের বাড়ি—সে সব দিন অতীতের গহন কুজ্‌ঝটিকায় অস্পষ্ট হতে চলেচে। কোথায় আজ খুকু।

পরদিন সকালে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম, গাছে গাছে কুল পেকেচে—মনে আসছে ১৯০৪ সালের সেই সরস্বতী পূজা। আমার একেবারে শৈশব তখন—অস্পষ্ট মনে হয় একটু একটু। কুঠির মাঠের গাছপালা বনঝোপের কি চমৎকার শোভা।পেয়ারাতলায় বসে ভগবানের কথা চিন্তা করলুম। কাছিম কাটচে সাঁইবাবলাতলার ঘাটে। ওপারের ঘাটে গিয়ে স্নান করলুম। তারপর বুধো ঘোষের খামারে আমার ধান ঝাড়া ও মাড়া হচ্চে, সেখান গেলুম। একজন হাটপরা লোক যাচ্চে হরিপদদার বাড়িতে—তাকে ডেকে এনে বসালুম। হাটে গেলুম—লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা।

তিনটি ঘটনা বড় ভাল লাগলো এবার গ্রামে। বড়-চারা আমগাছতলায় নিবিড় ঝোপে শুধু পত্ররাশির ওপর একা বসে বনপুষ্প সুবাসের মধ্যে রোজ দুপুরে কত কথা চিন্তা করতুম, কত কি পাখি ডাকত বনে, ভগবানের দানের মত কোথাও আমড়া পড়তো, গান গাইতুম 'তব আসন পাতা এ বনতলে'—আমারই তৈরি গান, এবং ওর ওই একটিই লাইন। গান তৈরি করতে তো জানি না।

দ্বিতীয় ঘটনা—বিকেলে গিয়েচি ঘুমিয়ে উঠে বরোজপোতার বাঁশবাগানে বেড়াতে। শুকনো বাঁশের পাতা পড়ে আছে সর্বত্র। হঠাৎ দেখি এক অপূর্ব ছবি—সিঁদুর-কৌটো আমগাছটার পাশে একটা চারা সজনে গাছের একটা মাত্র ডালে থোলো থোলো সজন ফুল ফুটেচে, তারই পাশে সিঁদুর-কৌটো আমডালে একটা চিল বসে আছে—ওদের ওপরে নীল আকাশ। যেন চীনা চিত্রকরের ছবি একখানা। কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, পা আর ওঠে না। ফিরে এসে ইন্দুর সঙ্গে আবার বারিকের বাড়ি গেলুম চালকীতে। সূর্য অস্ত যাচ্চে, আমি ওর উঠোনে গরুরগাড়ির ওপর বসে তামাক খাচ্চি কল্‌কে হাতে। তারপরে পাকা রাস্তার ওপরে মুচিপাড়ায় সজনে সাঁকোতে গিয়ে বসে আমডোবের গল্প শুনি ইন্দুর মুখে। তৃতীয় ঘটনা এইটিই। কোথায় টাটানগরের সভা সেদিনকার, কোথায় সারেন্ডা বনকান্তারের শৈলমালা—আর কোথায় চালকী গ্রামে আমার প্রজা বারিকের বাড়িতে গরুর গাড়ির ওপর বসে তামাক খাওয়া!

পরদিনও বিকেলে বারিকের বাড়ি যাবার আগে প্রমোদের বাবার সঙ্গে কথা বলি। তিনি তামাক খাওয়ালেন। অন্ন বলে মেয়েটির শ্বশুর। কত নিন্দে করলেন কুটুম্ব বাড়ির। উনি জ্বরে পড়ে আছেন, ওঁকে দেখে না—ইত্যাদি। বারিকের বাড়ি গিয়ে খুব বকাবকি করলুম ধান দিচ্চে না বলে। ওখান থেকে সোজা চলে এলুম কুঠির মাঠে অপূর্ব বনপথে, কণ্টক লতার পুষ্পের সুগন্ধের মধ্যে। আগে বসলুম নদীর তীরে নিবারণ ঘোষের বেগুন ক্ষেতের জমিতে, সেখানে আর বছর আমি আর কল্যাণী নতি শাক তুলতে আসতুম। তারপর এখান থেকে মাঠের মধ্যে জলার ধারে। রোদ একেবারে রাঙা হয়ে এসেচে, শিমুল গাছে মুকুল দেখা দিয়েচে, শীত আজ অনেক কম। কুল পেকেচে গাছে—অনেক পেড়ে খেলুম—কিছু নিয়ে এলুম ইন্দু রায়ের ছেলেমেয়ের জন্যে। ফিরবার পথে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম—ওপারে একটি মাত্র তারা জ্বল্‌জ্বল্ করচে সন্ধ্যা-আকাশে। যেন আমি ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে বারাকপুর এসেছি, খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে স্লেট্ পেন্সিল বই নিয়ে পড়তে আসে—আমি বসে বসে মেটে প্রদীপের আলোয় 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখতুম।

শ্যামাচরণদার বাড়ি বসে গল্প করে এদিন ওদের বাড়ির খিড়কির পথে আমাদেরপুরোনো ভিটের সামনে দিয়ে ফিরি। যেমন ফিরতুম বাল্যকালে, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন—আমাদের পুরোনো ভিটের বাড়িটা বজায় ছিল। সে সব কত কালের কথা!

পরদিন আবার সকালে বড় চারা আমতলায় বসলুম বনের মধ্যে শুষ্ক পাতার রাশির ওপর গামছা পেতে। এই বনের মধ্যে নিভৃতে চুপ করে বসে বন-বিহঙ্গের কাকলী শুনতে আমার যে কি ভাল লাগে। জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব করি এই নির্জন বনতলে একা বসে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি সর্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"—উপনিষদের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা এখানে বসে বুঝতে পারি।

হাটে গিয়ে পাটালি কিনলাম। ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় যে অপূর্ব অভিজ্ঞতা হোল—তা এ ক'দিনের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় বনভূমিপ্রান্তে ক্ষীরপুলি গাছের পেছনটাতে একা বসেচি চুপ করে—সামনে ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা ঝোপঝাপ, সাঁইবাবলা গাছের পত্রশীর্ষ, বনপুষ্প-সুবাস, পাখির ডাক—সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসচে, বনভূমি আজও তেমনি স্বপ্নমাখা—কি সুন্দর মধুমাখা সন্ধ্যা! কল্যাণী আমায় বলতো—মান্‌কু, এখানে বসবো!

এই মাঠে।

সেকথা মনে পড়লো এই সন্ধ্যায়। তার চোখে অসীম নির্ভরতার দৃষ্টি।

কলকাতায় এলুম পরদিন গরুর গাড়িতে। তিনু আমার সঙ্গে এল রানাঘাট স্টেশনে কচু কুমড়ো নিয়ে ওর দাদার শ্বশুরবাড়ির জন্যে। মাঝের গাঁয়ে মহীতোষদা'র সঙ্গে স্টেশনে দেখা অনেকদিন পরে।

কলকাতা থেকে আমতলায় গেলুম শ্বশুরবাড়ি। সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলে যখন কাজ করতুম, গৌরী মারা গিয়েছিল—সেই সব শোকাচ্ছন্ন দিনের ছাপ আছে এই সব লাইনের গাছপালায় মাঠে। সেই পথ দিয়েই আবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি এতকাল পরে। খুব আশ্চর্য না?

কলকাতায় এবার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল বহুকাল পরে। খেলাত স্কুলের পুরোনো হেডমাস্টার ক্ল্যারিজ সাহেব—আজকাল সে একজন ইহুদী স্কুলের হেডমাস্টার বউবাজারে। একেই নিয়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের সৃষ্টি 'অনুবর্তন'-এ। আর ভাগলপুরের অম্বিকা ঘোষ, যার সঙ্গে অনেকদিন আগে ভাগলপুর থেকে দেওঘর হেঁটে গিয়েছিলাম। 'অভিযাত্রিক'-এ এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। অম্বিকাকে একখণ্ড 'অভিযাত্রিক' উপহার দিলুম। ওর সঙ্গে ১৪/১৫ বছর পরে দেখা হোলও দেখতেতেমনিই আছে।

আজ সবাই মিলে চারখানা গরুরগাড়ি করে বনের পথে ধারাগিরি যাওয়া গিয়েছিল। সারাপথ এমন enjoy করেছি কি বলবো। কাশিদা ছাড়িয়ে লাল শালুক ফোটা সেই বড় বিলটা, যেখানটার নাম ঢ্যাং-জোড়, সেটা ছাড়িয়ে ধবলীর বন, তারপর বুরুডি গ্রাম, তা ছাড়িয়ে বুরুডি ঘাট অর্থাৎ পাস্, তারপর বাসাডেরা গ্রাম—একেবারেচতুর্দিকে বন, সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ঘেরা, সেখানে মুকুলবাবুর কর্মকর্তা গিরীশ বেশ চমৎকার একটি ঘর বানিয়েচে দেখলুম, দেখলে থাকতে লোভ হয় এই নির্জন বনাবৃত উপত্যকায়। এই ঘরের সামনে গিয়ে মুকুলবাবুর তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েচে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে বা ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালে এই পথের বন্য আমলকী, আম, পিয়াল ও তেঁতুলতলায় বেড়ানো বড় মনোরম হবে। একদিন যাব ওখানে ও রাত কাটাব, রমাপ্রসন্ন ও গৌরী এখানে এলে।

আমরা ঘাট অর্থাৎ পাস্ পার হয়ে গেলুম পদব্রজে। সবাইকে গরুরগাড়ি থেকে নামতে বাধ্য করলুম। এই রাস্তাটার একটা নিবিড় বন্য সৌন্দর্য আছে, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে, ডাইন ৬০০/৭০০ ফুট গভীর খাদ, তার তলা দিয়ে খরস্রোতা (নদীর নাম, বিশেষণ নয়) নদী উপলাস্তৃত বন্ধুর পথে বয়ে চলেচে, চারিধারে কত রকমের গাছপালা, কত মোটা মোটা লতা, বনফুলের মধ্যে এক রকমের কুচো কুচো নীল ফুল আর হুট্‌বা (Indigofera pulchera) ফুটেচে। বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালের গায়ে—বনবিহঙ্গের কাকলী বনের শাখায় শাখায়, ঘাট অতিক্রম করে বাসাডেরা উপত্যকায় এসেই মুকুল চক্কত্তি কনট্রাক্টরের ওই ছোট্ট খড়ের ঘরটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর শান্ত, নিভৃত শৈলমালা ও বনানীবেষ্টিত উপত্যকায় থাকে কিনা মুকুল চক্কতির কর্মচারি গিরিশ? গিরিশকে আমি জানি, সে কি বুঝবে এই বনভূমির সৌন্দর্য? সে সকালে উঠে বনের মধ্যে চলে যায় কাঠ কাটানোর জন্যে, কাঠ চেরাই করবার জন্যে—তারপর গাড়ি বোঝাই দিয়ে শাল-বল্লা পাঠায় ঘাটশিলা স্টেশনে—যে বনের গাছ কেটে ব্যবসা করে, বনলক্ষ্মী কি তার সামনে মুখাবগুণ্ঠন অপসারিত করেন?

বেলা দেড়টার সময় আমরা ধারাগিরি পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে এতগুলো মেয়েমানুষ ছিল, সবাই বড়লোকের বাড়ির বৌ-ঝি, একবার কি কেউ বল্লে—জায়গাটা বেশ ভাল, কি বেশ, কি চমৎকার! কিছু না, পয়সাই আছে, কিন্তু, চোখ নেই। মেয়েমানুষগুলোর হাতে এক গোছা করে সোনার চুড়ি, কানে কানপাশা, কত রকমের সেজেছে—কিন্তু এসেই 'ওরে, অমুক ওদিকে যাস্‌নি, অমুক তোর ঠাণ্ডা লাগবে'—হই-চই চিৎকার, গোলমাল, 'বকা কোথায় গেল দ্যাখ দ্যাখ' (কুকুরের নাম)—এই সব ব্যাপার। অমন চমৎকার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্যের দিকে কেউ চেয়েও দেখলে না, কেবল আমি আর প্রভাত দুজনে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। তারপর খিচুড়ি রান্না হোল, বটতলায় বসে ডাক্তার রক্ষিত, আমি ও প্রভাতকিরণ—তিনজনে খিচুড়ি খাওয়া গেল, তাস খেলা গেল, গল্পগুজব করা গেল। তারপর বেলা পড়লে ছায়াভরা বিকেলে সবাই পাহাড় থেকে ফিরলুম।

কাল বিকেলে দুবলাবেড়া এলুম হলুদপুকুর থেকে। রাত্রে টাটানগরে ছিলুম, মিঃ ভর্মার বাড়িতে। অনেকে দেখা করতে এল। রাত দেড়টা পর্যন্ত 'দেবযান' সম্বন্ধেগল্প। সুশীলবাবুর মোটরে স্টেশনে এলুম ভোর ছ'টাতে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে এক মাড়োয়ারির দোকানে চা ও খাবার খেয়ে বারোজ সাহেবের মোটরলরির জন্যে অপেক্ষা করলুম। বারোজ সাহেবের লোক বল্লে—রাত্রে যা বৃষ্টি হয়েচে, ও-রাস্তায় গাড়ি আসা মুশকিল। শোনা গেল দুবলাবেড়া এখান থেকে ষোল মাইল। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা। হেঁটে বেরিয়ে পড়ি আমি ও মিঃ ভর্মা। কেমন কাঁকরের পথটি এঁকে-বেঁকে আমাদের সামনে দূর থেকে বহুদূরে সুদূর নীল শৈলমালা ও বনপ্রান্তরের দিকে চলে গিয়েচে। ওই হোল রাইরক্ষপরের পথ—এ পথচলে গেল বারিপদা হয়ে বালেশ্বর ও কটক। আমরা বনের দিকে অগ্রসর হচ্চি—ওই শৈলমালার মধ্যে কোন্ এক অনাবৃত ছায়াভরা উপত্যকায় দুবলাবেড়া গ্রাম। সেখান থেকে ভ্যালেডিয়াম ore আসচে!

প্রথমে পড়লো নড়সা নদী। পথের দুধারে কালো পাথরের পাহাড়, যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ, এসব পাহাড় প্রায়ই অনুর্বর, বৃক্ষলতাহীন—ক্বচিৎ কোনো পাহাড়ে এক-আধটা শিববৃক্ষ দণ্ডায়মান। হাঁড়িয়ালি বলে একটা গ্রামে এক বাড়ি থেকে শাঁকের আওয়াজ শুনে এক ছোকরাকে বল্লুম—এদের বাড়িতে শাঁক বাজচে কেন?

—সত্যনারান পুজো হচ্ছে।

—কি জাত এরা?

—মহারাণা।

—সে কি?

—জ্যোতিষ।

—ব্রাহ্মণ?

—ওই।

এদেশে হাঁ বলতে জানে না, বলে—"ওই'!

এ গ্রামের নিচেই হাঁড়িয়ালি বলে ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী। হেঁটে পার হয়ে গেলুম। রাস্তা হাঁটতে কি আনন্দই হচ্চে সকাল বেলাটা। ধু ধু করচে মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ, যেন space-এর সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট বড় কালো পাথরের পাহাড়, পলাশ, শিববৃক্ষ, মহুল ও আসান। শালগাছ বেশি চোখে পড়ল না। এক স্থানে পথের ধারে বড় গাছের তলায় একটা চওড়া পাথরে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—

মৃতু বাসেয়া সর্দার।

সাং চাকড়ি, সন ১৯৪৯।

অর্থাৎ উক্ত গ্রামের বাসেয়া সর্দারকে অমর করবার চেষ্টা। এই গ্রাম পার হয়ে একটা পার্বত্য নদী—নদীর নাম লুপুং, কিছুদূরে এই নামের একটা গ্রাম। পথের দুধারে আমের গাছ—এমন অদ্ভুত ধরনের বউল ধরেছে, আর তার কি ভরপুর সুবাস! একটা চারা আমগাছ দেখে মনে হোল গাছটাতে ফুল ধরেচে। নদীটার ধারে এক বিশাল সুপ্রাচীন অর্জুন গাছের শাখা-প্রশাখার তলে আম্রমুকুলের সৌরভের মধ্যে কিছুক্ষণ বসেরইলাম। বেলা হয়েছে, পথ হেঁটে খিদেও পেয়েচে। কয়রাসাই গ্রামের পাশে একটা কালো পাথরের পাহাড়ের নিচে একটা কুলগাছ, অনেক কুল পেকেচে দেখে সেখানে কুল কুড়ুতে গেলাম। পথে কতকগুলি ছেলে স্কুলে যাচ্চে, কয়রাসাই গ্রামে একটা পাঠশালা দেখে এসেচি বটে পথের ধারে। আমরা ছেলেদের নাম জিজ্ঞেস করলুম। একজন বল্লে—তার নাম দিবাকর তাঁতি। একজনের নাম ধনুর্ধর বাস্কে।

—কি জাত?

—বাস্কে জাত।

এই সময়ে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমাদের সামনে ডানদিকে জোজুডি শিখরদেশ (২০০০ ফুট) দেখা যাচ্চে, দূরে নারদা (১৭০৬ ফুট) শিখর। সামনের শৈলমালার ওপারেই ময়ূরভঞ্জ, অগণ্য বন্যহস্তী ওই সব পাহাড়ে। দিন থাকতে থাকতে দুবলাবেড়া পৌঁছুলে বাঁচি। কোয়ালি গ্রামে পৌঁছে গেলুম তখন বেলা একটা। এক কুম্ভকারের বাড়িতে আশ্রয় নিলুম বৃষ্টির সময়। তাদের খোলার চালা, মাটির দেওয়াল। মেয়েদের হাতে রুপোর অলংকার। কপালে সিঁদুর। কথা বাংলাই—তবে বড্ড বাঁকা বাঁকা এবং একটু উড়িয়া-ঘেঁষা। ওরা মুড়ি খাওয়ালে তেলনুন দিয়ে মেখে এনে। হঠাৎ এক বৃদ্ধ উড়িয়া ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইলো। তার নাম বাইধর মিশ্র, বাড়ি পুরীর কাছে মালতীপাতপুর। ওর বারো বছরের ছেলে বাড়ি থেকে আজ দু-তিন মাস ভিক্ষে করতে বেরিয়েচে এবং খবর পাওয়া গিয়েচে ছোকরা সিংভূমে এসেচে। তাই বাইধর খুঁজতে বেরিয়েচে ছেলেকে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াচ্চে। উড়িয়া ভাষায় বল্লে—কাল রাতে এক মণ্ডলের বাড়ি উঠেছিলুম, এখন ঝড়বৃষ্টি এল, ভাত রান্না করতে পারলুম না। কিছু খাইনি রাত্রে। ওকে আমরা কিছু পয়সা ও মুড়ি দিলাম। একটু তেল দিলাম, ও একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে তেলটুকু পুরে নিলে। কি সুন্দর সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হেসে বল্লে—বাবু, বাড়িকে বাড়ি, চুঙ্গাকে চুঙ্গা। খুব খুশি।

আমরা কোয়ালি থেকে বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে গুররা নদী পার হলুম। (রাখা মাইন্‌সের সেই গুররা নদী, এখানে ছাৎনা পাহাড় থেকে বেরিয়েচে) তারপর বন ও জঙ্গলের পথে এলুম হরিনা গ্রামের মহাদেব স্থানে। এই বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দির, চারিদিকে বট, আমলকী, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, মানুষের হাতের নয়, স্বাভাবিক বন। দেবস্থান বলে লোকে কাটেনি। ওখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথে বেরুই। পথ চলার আনন্দ এমন একটা নেশা আনে মনে, ছোট একটা বন দেখলেও মনে হয় অদ্ভুত জিনিস দেখচি। বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে যে মন, সে শুধু উপভোগ করে ক্ষান্ত থাকে

না, সৃষ্টিও করে। গুররা নদী পার হবার পরে আর একটা ক্ষুদ্র নদী পেলুম, সেটা পার হয়ে বেগ্‌নাড়ি গ্রাম। সামনের পাহাড়ে খারিয়া জাতিরা জুম্‌ চাষ করচে বন কেটে, বোধহয় সে ফাঁকা জায়গাতে খড় হয়েচে, শুষ্ক খড়ের ক্ষেত রাঙা দেখাচ্চে, বেগ্‌নাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে পথটি, অনেকগুলো বড় বড় গাছ পথের ধারে, বাঁশঝাড়, তেঁতুল, মহুয়া, অর্জুন। এতক্ষণ দেখছিলুম মেয়েদের সিঁথিতে সিদুর, পরনেশাড়ি—এখানে দেখলুম মেয়েদের মোটা হাত-বোনা কাপড় দুটুকরো জড়ানো—হো বা সাঁওতালদের ধরনে। অনেক টোমাটো ক্ষেত পথের পাশে।

একটি বৃদ্ধ মহিষ চরাচ্চে, তাকে বল্লাম—দুবলাবেড়া কতদূর?

সে বল্লে—সামনে মাগুরু আর নেংগাম লাগালাগি, নেংগাম আর দুবলাবেড়া ভিড়াভিড়ি।

এ নতুন ভাষা শিখলাম।'ভিড়াভিড়ি' মানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানেই গোলমাল। ১৪ মাইল পথ তখন হাঁটা হয়ে গিয়েচে, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তও বটে—সে অবস্থায় এ দেশের লোকের মুখে 'ভিড়াভিড়ি' শুনে খুব আশ্বস্ত হলুম না। এরা তিন মাইলকেও কাছাকাছি বলতে পারে। একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—ওই পাহাড়টা দেখচিস্‌, ওই পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবেক। এ জায়গাটি চেয়ে দেখি বড় চমৎকার। তিনদিকে শৈলমালা ও নিবিড় বন আমাদের পথকে ঘিরেচে অর্ধচন্দ্রাকারে, অবিশ্যি দূরে দূরে। জোজুড়ি শিখরদেশ আর দেখা যায় না, নারদা peak ডাইনে বহু পিছনে অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে, রোদ ফুটেচে পশ্চিম গগনে, অথচ বাঁদিকের ছাৎনা ও আটকুশী শৈলমালা সাদা কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। যেন দার্জিলিংয়ের কুয়াশা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে সেদিক থেকে।

একদিনে শাল কেঁদবন পথের পাশেই। বড় বড় শিলাখণ্ড সর্বত্র। পাহাড়টা খুব উঁচু, ঘুরে যাবার সময় বাঁ-পাশে পর্বতসানুতে বনশোভা বেশ দেখালো পড়ন্ত রোদে। পাকা কুল খেতে খেতে যাচ্চে একদল বন্য মেয়ে। দুবলাবেড়া তাঁবুতে পৌঁছুলাম বেলা, পাঁচটাতে। পাহাড়ের নিম্নসানুর বন যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানেই তাঁবু পাতা। মিঃ বারোজ্‌ তাঁবুতে বসে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে গল্প করচে। বল্লে—পথে বৃষ্টির জন্যে মোটর পাঠাতে পারিনি, এখন পাঠাচ্ছিলাম। চা ও খাবার খেয়ে ধরে প্রাণ এল।

রাত্রে একটু জ্যোৎস্না উঠলো। কি শোভাই হোল তাঁবুর পেছনের পর্বতসানুর বনের। শালগাছ নেই এ বনে। কেঁদ, পড়াশি, শিবগাছ, কুল, কম্‌প্রিটাম লতা, বড় বড় বিরাটাকার শিলাখণ্ডের ওপর টেরি লতা ও মোটা চীহড় লতার ঘন ঝোপ, আমলকী, নিম ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলটা। বৈচিত্র্য আছে এ বনে, একঘেয়ে শালবন বড় খারাপ।

মিঠাই ঝর্ণার ওপারে লখাইড়ি গ্রামে খাড়িয়া জাতির বাস। তাদের মাদল বাজচে জ্যোৎস্না রাত্রে। এ একেবারে বন্য জায়গা, বারোজ বল্লে, বড় বুনো হাতির উপদ্রব। গত বৎসর বন্যহস্তীতে নিকটের কেরু-কোচ গ্রামের একটা লোককে মেরে ফেলেছিল। কি সুন্দর বনশোভা। জ্যোৎস্না পড়েচে উপত্যকার ওপারের আটকুশী শৈলশ্রেণীর এদিকের ঢালুতে—এ যেন বনপরীর দেশটি। শিউলি গাছের জঙ্গল তাঁবুর পেছন শৈলসানুতে। শরৎকাল হলে প্রস্ফুটিত শেফালির সৌরভ ভেসে আসতো শীতল নৈশ বাতাসে।

এই যে লিখচি, সামনে পাহাড়ের মাথায় বর্ষার সাদা মেঘপুঞ্জ জমেচে। তাঁবুর দোর থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে গাছগুলোকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি কথা মনে পড়ে গেল, "A nation's history has three stages. Success,then as a consequence of success, arrogance and injustice; then as a consequence of these downfall."

কাল সারাদিন বৃষ্টিতে তাঁবুতে বসে। কোথাও বেরুতে পারিনি। তাঁবুর পেছনে লুদাম, করম ও ধ গাছ, একটা ধাতুপ ফুলগাছে প্রথম বসন্তের রাঙা রাঙা ফুল ফুটেচে। পাহাড়ের সানুতে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় শিলাখণ্ড। যে কোনোটাতে আরাম করে বসে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায়। কিন্তু বাদলাবৃষ্টিতে সব ভিজে। সন্ধ্যায় বারোজ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়ে বসলুম খানিকক্ষণ। পূর্ব আকাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভাঙা মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠলো। মিসেস্‌ বারোজ বন্য হস্তীর গল্প করলে। এক পেয়ালা কোকো পান করে এই শীতে বেশ আরাম করে বুনো হাতি ও মাতাল ভালুকের গল্প শোনা গেল। আর বছর মাগড়ু গ্রামের নিকটবর্তী পথে একটা ভালুক পেট ভরে মহুয়া ফুল খেয়ে যখন গাছ থেকে নামলো—তখন সে ঘোর মাতাল, টলতে টলতে চলেচে।

রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হোল। সারারাত্রি বৃষ্টি।

আজ সকালেও বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা হলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বিকেলে মাগড়ু ও চেংশম গ্রামে বেড়াতে গেলুম। ডাইনের প্রকাণ্ড পাহাড়শ্রেণীর পাশ দিয়ে আসান পড়াশির বনের ছায়ার পথ, বনে পিয়াল গাছের মুকুল ধরেচে, বাতাসে আম্র ও পিয়াল মুকুলের সৌরভ, কালো কালো স্তূপের ওপর টেরির জঙ্গল, বামে পোটরী ও কুন্দরুকোটা পাহাড়—ওখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল, বিলিংহাম নামে এক সাহেবের। এখন খনির কাজ বন্ধ শুনলুম। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্ত আকাশের তলায় তলায় ময়ূরভঞ্জ যাবার পথ। আমরা যখন ফিরলুম তখন বেলা পড়ে এসেচে, বন্য কুক্কুট ডাকচে ডানদিকের শৈলসানুর গহন অরণ্যের মধ্যে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। আমরা তাঁবুর পিছনের শৈলশ্রেণীর ওপরে একটা পাথরের চাতালে রাত দুটো পর্যন্ত বসে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করলুম। ভালুক ও বন্য হস্তীর ভয়ে (এবং শীতের জন্যেও বটে) আগুন জ্বালানোটা নিতান্ত দরকার। আজ বিকেলেই দেখে এসেচি মাগড়ু গ্রামে লাখন মাঝি বলে একটা সাঁওতাল যুবকের একটা চোখ ভালুকে একেবারে উপড়ে দিয়েচে—অবিশ্যি ঘটনাটা ঘটেছিল মাগড়ু থেকে দুবলাবেড়া যাবার পথে জঙ্গলের ধারে। লাখন টাঙি হাতে যাচ্ছিল দুববেড়া, ভালুক মহুলগাছ থেকে নেমে ওর ওপর এসে পড়ে, উভয়ে জড়াজড়ি ও ধস্তাধস্তি হয়, তার ফলে লাখনকে একটা চক্ষুর মায়া কাটাতে হয়েচে। পরশু রাত্রে বারোজ সাহেবের মুরগির ঘরে বাঘ এসেছিল, সকালে আবার দাগ দেখা গিয়েচে। এই সব শুনে নির্জন পাহাড়ের ওপর গভীর রাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী বসে থাকবার সময় যে খুব নিরাপদ ভাবছিলুম নিজেদের এমন কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে।

কিন্তু সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায় সে অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রির শোভা দেখবারজন্যে। পাহাড়ের ওপরে শুকনো শালগা, দোকা (Odina wodier) অজস্র বন্য শিউলি, শিববৃক্ষ, গোলগোলি, পড়াশি; বনতুলসী, ও করম (Adina cordifolia) গাছের জঙ্গলে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্না পড়েচে, সামনের উপত্যকা ও ওপারের আটকুশি ও পোটরা পাহাড়শ্রেণীতে বনে বনে সেই জ্যোৎস্না এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে—যেন এই জনহীন নিশীথে বনদেব ও দেবীরা এখানে নামেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে, তাঁদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় বিশ্বের অধিদেবতার নীরব জয়গান।

এই বনে (এ পাহাড়টি ছাড়া, এর ওপর বেশির ভাগ শুধুই শেফালি গাছ) এ সব গাছ তো আছেই আরও আছে তুন, লতা, পলাশ Butea suberpa বোংগা, সর্জম লতা, শাল, আসান, পিয়াল, মহুয়া, অর্জুন, বট, কদম্ব, কুসুম, ধওড়া, রাজ জেহুল, কুজরি, রোহান (Soymida febrifuga), বাঁশ, পিয়াশাল, চীহড়লতা, বেল প্রভৃতি গাছ। অবিশ্যি কোনো একটা জায়গায় এত রকমের বৃক্ষ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে না বা নেইও, মানুষের তৈরি বাগান ছাড়া। অরণ্যের প্রকৃতিই তেমন নয়, যেখানে যে গাছ আছে সেখানে সেটাই বেশি। শাল তো শালই, অর্জুনই—এমন রকম।

আজ সকালে তাঁবু থেকে বার হয়ে দুবালবেড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠলুম। সুন্দর বনপথে উঠলুম। ঘাটশিলা থেকে ষোল মাইল হবে। দূরে ভাল্‌কি পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। এখানে বসে এই মাত্র চা ও খাবার খেয়েচি। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, সামনে সমতলভূমি নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট। একটা শিলাখণ্ডে বসে থাকার সময় গাছপালার ছায়ায় বসে মনে হোল হিমালয়ের পর্বতারণ্যে বসে আছি। পড়াশি, বাঁশ, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ। কাল সকালে আমাদের তাঁবুর পেছনে পাহাড়টার বড় পাথরের চাতালটাতে কতক্ষণ কাটিয়েচি। আকাশ ছিল সুনীল, তার তলায় শুকনো শালগাছ ও দোকা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার ভঙ্গি—সে একটা দেখবার জিনিস। একটা শিলাখণ্ডে রৌদ্রে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। রৌদ্রস্নাত দ্বিপ্রহরে চারিদিকের সে বন্য সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করে তুললে। সত্যই এ সৌন্দর্য যেন সহ্য করা শক্ত। প্রাণভরে ভগবানের শিল্প রচনা দেখি। বিকেলে আমরা ঘাটদুয়ার বলে একটি অতি চমৎকার স্থানে গেলুম, তাঁবু থেকে ৪ মাইল দূরে মুসাবনীর পথে। ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতাল গ্রাম পথেই পড়ে—সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কারভাবে লেপা-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলপনার মত পাখি আঁকা, গাছপালা আঁকা। ঘাটদুয়ার জায়গাটাতে দুদিক থেকে দুটি শৈলমালা এসে ক্রমনিম্ন হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে—মধ্যে হাত পাঁচেক সমতলভূমি, এক পাশে একটা পার্বত্য নদী বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। ঘন বন দুপাশে, ঝর্ণার ওপরে অনাবৃত শিলাস্তর থাকে থাকে কাত-ভাবে এসে পড়েচে—প্রায় একশো ফুট কি দেড়শো ফুট উঁচু। স্তরগুলো একটার ওপরে একটা সাজানো, একটি থেকে আর একটি গুনে নেওয়া যায়। দুটি গুহা আছে জলের ওপরেই, গত বৎসর নাকি এক খাড়িয়া পরিবার ওতে বাস করতো। আমরা যখন ফিরলুম, তখনসন্ধ্যা হয়ে এসেচে, সম্মুখে আঁধার রাত। বিভিন্ন পার্বত্য নালায় ওপরকার পাথর চোখে দেখা যায় না, কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলি। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তারাভরা আকাশের মহিমময় রূপ দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলুম। এদিকে বারোজ সাহেবের বাংলোতে ডিনার খাওয়ার কথা, রাত হোল প্রায় সাড়ে আটটা তাঁবুতে পৌঁছতে। ডিনার খেয়ে ফিরতে এগারোটা বেজে

গেল। বারোজ বল্লে, সন্ধ্যাবেলা তোমরা বাঘের ডাক শুনতে পেলে না সামনের পাহাড়ে! সাড়ে ছ'টার সময়ে খুব ডাকছিল বাঘ।

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মিঠাই ঝর্ণার কাছে ঢুকলু-বাগাল গ্রামে খাড়িয়া জাতি দেখতে গিয়েছিলুম। দুবলাবেড়া ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পথ উঠেচে পাহাড়ের ওপরে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ, একটা কি গাছের ডালে দুটো চিল বসে আছে। ওপরে উঠতে উঠতে পা ধরে গেল—তখন একটা বড় পাথরের ওপরে বসলুম, একটা বড় মহুয়া গাছ সোজা উঠেচে দূরের পাহাড় ও সমতলভূমির পটভূমিতে। ভগবানের নৈকট্য এসব জায়গায় যত অনুভব করা যায়, এত কি কলকাতা কি টাটানগরে বসে সম্ভব? টাটানগর কেন বললুম, সিংভূমের বনে বাস করে তাঁবুতে, টাটানগরের নাম করবো না এটা অন্যায়। আমরা চড়াই পথে চলেচি, বুনো বাঁশ, আমলকী, পাপড়া, কর্কট, পড়াশি, মহুয়া গাছের তলা দিয়ে, কোথাও পথের পাশে কুঁচ ফলে আছে ঝোপে, কোথাও এক রকম হল্‌দে ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইচে, আকাশে কালো মেঘ।

পাহাড়ের ওপর উঠে দুজন খাড়িয়ার বাড়ি—তাদের মেয়েরা শুধু আছে, আমাদের দেখে সোজা পালালো। তারপর আমরা গেলুম ঢুকলু বাগালের বাড়ি। খড়ের ছাউনি, নিচু মাটির ঘর, এমন চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে, শিলং কি কার্সিয়াং-এর বড়লোকের বাড়িও এমন জায়গায় হলে গর্বের বিষয় হতে পারে। ঢুকলুর ছেলে আনন্দপুর স্কুলে পড়ে। কাল রাত্রে ঢুকলুর গরুটা নাকি বাঘে মেরেচে সামনের পাহাড়ে। সবটা খেয়েচে? আমরা জিগ্যেস্ করি।

সে বলে—উয়াকার মুড়িটা নিয়ে গেছে। বাকিটা ডুংরিটাতে রাখি গেলে!

এটার নাম চরাই পাহাড়, ২১০৬ ফুট উঁচু। হিমালয়ের মত দৃশ্য চারিদিকে। একটা উঁচু ডুংরির ওপর গিয়ে আমরা বসলুম, গ্রানিটের সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার চারিপাশে, ভাঙা ভাঙা গ্রানিটের boulder—ফাঁকে ফাঁকে খড়, দু-চার ঝাড় বন্যবাঁশ, একটা সাথীহীন মহুয়া। সামনের সমতলভূমির দৃশ্য এত উঁচু থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে।

একটি সাঁওতাল তীরধনুক হাতে এসে হঠাৎ হাজির। তার নাম জিগ্যেস করলে নাম বলে না। জিগ্যেস করে জানা গেল ওর বাড়ি রাঙামাটিয়া গ্রামে, সে এবং তার দুজন সঙ্গী এসেচে বাঘে-মারা গরুটার অর্ধভুক্ত দেহটা খুঁজে নিতে। এই গ্রানিট পর্বতচূড়ায় আসলে সেটাই সে খুঁজতে এসেচে। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করবার অবকাশ নেই ওর।

ওই।

একটু পরে আমরা আমাদের গ্রানিট চূড়ায় বসে দেখচি, তিনজন সাঁওতাল অথবা হো নীচের বনে শুষ্ক শালের পাতার রাশির ওপর দিয়ে মচ্‌মচ্ করে হাঁটতে হাঁটতে বনের সর্বত্র আতিপাতি করে খুঁজচে কালকার সেই বাঘে-খাওয়া গরুর মৃতদেহটার জন্যে। ঘণ্টাখানেক খুঁজবার পরে ওদের অধ্যবসায় সার্থক হোল, দেখি আমাদের চূড়া থেকে সামান্য উঁচু আর একটা ডুংরির মাথায় দুটি লোক মরা গরু বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্চে।

আমাদেরও চা ও খাবার এই সময় দুবলাবেড়া থেকে এসে পৌঁছুলো। চা খেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হই। নিচে নেমে একটা খাড়িয়ার কুটির। ওর মধ্যে আমরা ঢুকে দেখি—একটা মলিন চেটাই, কয়েকটি হাঁড়ি-কলসী, লাউকোটে তৈরি একটা হাতা, চীহড় পাতার একটা ঠোঙা, দুটো শুকনো ধুঁধুল, একটা উদুখল—এই তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি।

ঢুকলু বাগাল বল্লে—হাতির ভয়ে আমরা হিই রাতে বাইরে শুই আজ্ঞে। নইলে ঘর ভাঙি দিবেক।

—তোরা হাতি এলে কি করিস?

—হাতি খেদ্‌বো।

এই গ্রামের নাম গামীরকোচা। আমার মনে হোল পড়ন্ত হল্‌দে রোদে এই বন পর্বত, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালা ও গ্রানিট শিখর, অরণ্যাবৃত সানুদেশ ও নিচেকার সমতলভূমির কিছু অংশ দেখে যে, এই খাড়িয়া অধিবাসীরা খুবই গরিব হয়তো—কিন্তু অনেক শহুরে বড়লোকের চেয়ে ভাল জায়গায় বাস করে এরা। দার্জিলিং কার্সিয়াং বা শিলং-এর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় এদের বাড়ির মাটির নিচু দাওয়া থেকে চতুষ্পার্শ্বের পার্বত্যদৃশ্য। যেদিকেই চাই—সামনের ময়ূরভঞ্জের দিকেই লোক বা বামে ভাল্‌কি ও মুসাবনীর দিকেই হোক—শৈলমালার পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে আবার উচ্চতর শৈলমালা—সজল নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট, কোনোটাতে হল্‌দে রোদ, কোনোটার মাথায় মেঘের ছায়া, কোনোটা কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া। এই সব দেখতে দেখতে ঘন বনের পথে নামলুম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, তাঁবুতে এলুম। একটু পরে শুনি সামনে পাহাড়ে বাঘের 'হাঁকোর' 'হাঁকোর' আওয়াজ। দুবার তিনবার শুনলাম। একটু পরে বারোজ সাহেব তাঁবুতে বেড়াতে এল—সে বল্লে, কাল সন্ধ্যায় এমনি ডাকছিল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এমন আওয়াজ করবে না। নির্জন বন পাহাড়ের ধারে তাঁবু, অন্ধকার রাত্রি, এমনি বাঘের ডাকে ভয় যে না হোল মনে, তা বলতে পারিনে।

বারোজ বল্লে—খাড়িয়ারা সপ্তাহে একবার মাত্র ভাত খেয়ে থাকে গরমকালে। আর কিছু জোটে না। খাড়িয়া কুলি মেয়েরা পয়সা নিয়ে গেল মজুরির, তার পরদিন এল না ওরা খনিতে কাজ করতে। টাকা হাতে পেয়ে ভয় পেল।

বল্লে—এ সব টাকা আমাদের?

—হ্যাঁ।

—কত আছে?

—দু টাকা। গুনতে জানিস না?

—নেই জানি।

এত গরিব কিন্তু এত সরল।

ধলভূমের দৃশ্য যে এত wild ও এত ভাল তা আগে জানতুম না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি দেখবার সুযোগ দিয়েচেন।

রাত্রি দশটা। ডায়েরি লিখতে লিখতে তাঁবুর বাইরে এসে দেখি কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ অনেকটা উঠে গিয়েচে আকাশে—পেছনের পর্বতসানুর দোকা, শালগা ও পাষড়া গাছগুলো ঈষৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্চে—মায়াময়, অপরূপ। এই সরু সংকীর্ণ উপত্যকার সবটা চাঁদের আলোতে আলো হয়ে উঠেচে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে, কখনও চাই তারা-ভরা আকাশের দিকে, কখনও চাই জ্যোৎস্নাস্নাত দোকা ও শালগা গাছগুলির দিকে।

আজ সকালে চা খেয়ে স্নান করে তাঁবুর সামনে পাহাড়টিতে উঠে সেই শিলাখণ্ডে বসলুম—এখুনি আজ চলে যাচ্ছি এই সুন্দর বনভূমি ছেড়ে। আবার কবে আসবো কে জানে? একটু রোদ উঠেচে, এ পাহাড়ের মাথায় সব শুকনো গাছ, শিউলি বন শুকনো, দোকা গাছগুলো শুকনো শিউলি কি আমড়া গাছের মত, শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল, নিষ্পত্র শিববৃক্ষ, নিষ্পত্র গাছে হলুদরঙের গোলগোলি ফুল ফুটে আছে, কালোপাথরের ফাকে ফাকে শুকনো খড় বন। কি একটা শুকনো কাঁটা গাছ অজস্র—সব শুকনে গাছ এখানে, ভারি চমৎকার লাগে কালো পাথরের ওপর নিষ্পত্র শুকনো গাছে বন। ভগবানের আশ্চর্য শিল্প কি সুন্দর ভাবে এখানে ফুটেচে!

বেলা এগারোটাতে মোটর ছেড়ে প্রথমে পৌঁছলাম মহাদেব শাল। বনানীকুঞ্জের অন্তরালে পাপিয়া ও কত বনপাখির কলকাকলী। বহুকালের পুরোনো পাথরের কালী প্রতিমা। একটা খড়ের চালাঘরে শিবলিঙ্গ পোঁতা আছে—গর্তের মধ্যে মাথাটুকু মাত্র দেখা যায়। বড় একটা বট গাছ, অনেক আসান ও পলাশ গাছ, কোথা থেকে আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসছে, প্রাচীন দিনের মুনি ঋষিদের তপোবন যেন। মেঘমেদুর প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশের তলে কি মনোরম ছবিই এরা রচনা করেছে। মনে হোল আরও অনেকক্ষণ বসে থাকি এখানে—কিন্তু সময় ছিল না।

মহাদেব শাল থেকে বার হয়েই দেখি বারোজ সাহেব ওর মোটরে ফিরচে। আমাদের দেখে নামলো। ও বল্লে, মহাদেব শাল খুব পুরোনো স্থান। বারোজ এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখে। ওকে বিদায় দিয়ে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম—কোয়ালি গ্রামে সেদিনকার সেই বাড়িটা দেখলুম, সেদিন যেখানে বসে মুড়ি খেয়েছিলুম। হলুদপুকুর পার হই। কালিকাপুর রেজু আপিসে মিসেস ভর্মার সঙ্গে দেখা হোল। কাগড়গাদি ঘাটের কাছে দৃশ্য বড় সুন্দর—দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল, বাঁদিক দিয়ে একটাপার্বত্য ঝর্ণা বয়ে চলেচে। সামনের পাহাড়ে আর বছর একদল হাতি দেখেছিলেন—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন। মিঃ সইয়ারের বাংলোটা পড়ে আছে রাখা মাইন্‌সে—ভূতের বাড়ি হয়ে। একটা কুল গাছ থেকে পাকা কুল পেড়ে খেলুম ভাঙা ক্লাব-বাড়িটার পেছনে।

বাড়ি পৌঁছে চা খেয়ে নুটু, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরা ঘাটের (hill pass) বনের মধ্যে মোটরে গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে বনে, গম্ভীর দৃশ্য চারিদিকে। খাদের গভীরতা প্রায় ৫০০/৬০০ ফুট—সেখানে বহু নিচে দিয়ে খরস্রোতা নদী (খরমুতি নদী, এখানকার ভাষায়) বয়ে চলেচে, আমি, নুটু, বৌমা খরস্রোতার ওপরে দাঁড়িয়ে

আছি—ওপারের পর্বতারণ্যে ময়ূর ডাকচে। সন্ধ্যা হোল, আমরা পাহাড় থেকে নেমে শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম, নটুকে গান গাইতে বল্লেন মিঃ সিন্‌হা। আমরা সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম ও গান শুনলুম। তারপর ডাকবাংলোতে এসে চা খাই বৌমা, নটু ও আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা রাজবাড়িতে। আমি বল্লাম, হরিয়ানা গ্রামের গভীর বনের মধ্যে যে মহাদেব শাল আছে, সেখানটা বড় সুন্দর তপোবনের মত। কিন্তু যাত্রীদের বসবার জায়গা নেই, ভাঙা মন্দিরেরও সংস্কার দরকার। আপনি রাজসরকার থেকে ওটা করে দিন।

অমরবাবুর বাড়ি গিয়ে গল্পগুজব করলুম রাত্রে।

কোথায় দুবলাবেড়া, ঘাটশিলা—আর কোথায় বারাকপুর! এক দিনের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি—কোথায় চাক্‌ড়ি গ্রামে বাসেয়া সর্দারের স্মৃতি-প্রস্তর, কোথায় চরাই পাহাড়ের শিখর! কোথায় দোকা ও শালগা বন! আজ এ বারাকপুরে আম্রমুকুলের ঘন সুবাস ভরা অপরাহ্ণের বাতাসে জানলা খুলে দেখছি সামনের খুড়িমাদের বাঁশঝাড়ের মাথায় রাঙা রোদ, কোকিল ও কত কি পাখি ডাকচে—আমি একটা ঘরে বসে লিখচি। শুকনো বাঁশপাতাঝরা পথের ওপর বৈকালের ছায়া নেমে এসেচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে আমার উঠোনে, ওদের বাঁশতলায়, আমি বসে বসে দেখচি। কল্যাণী গিয়েচে ফকিরচাঁদের বাড়ি বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে, মানু ও নগেন খুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। এমন চমৎকার পরিপূর্ণ বসন্তের মধ্যে বারাকপুরে আসতে পারা একটা সৌভাগ্য। এত সুগন্ধ বাতাসে, এত ঘেঁটুফুল শুকনো পাতা ছড়ানো বাঁশঝাড়ের তলায়। সকালের ঈষৎ শীতল বাতাসে যখন আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসে, পাখি ডাকে—তখন মনে হয়, একটা যেন কিছু হবে, এমন দিনের শেষে বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু অপেক্ষা করে আছে যেন—আমার ছেলেবেলাতে ঠিক এই সময় মনের অকারণ উল্লাস অনুভব করতুম এমন ধারা।

কাল বিকেলে কুঠির মাঠের রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ এসে পড়লুম শাঁখারিপুকুরে বাঁশবনের ধারে। নক্ষত্র উঠেছে আকাশে, আকাশের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ জ্বলজ্বল করচে, আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। কতকাল আসিনিশাঁকারিপুকুরের বাঁশবাগানে—ছিরেপুকুরের ওপারের পথে—সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পুরাতন বাল্যদিনগুলি ছাড়া। বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি না যদি থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদ করচেন। যে সমঝদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমঝদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমঝদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হোলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।

কি চমৎকার রাঙা ফুলে-ভর্তি শিমুল গাছটার শোভা নদীর ধারে ফণি চক্কত্তির জমিতে! দুপুরে নীল আকাশের তলায় রোজ রাঙা ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখি স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। চোখ ফেরাতে পারিনে। কাল আবার দুটো প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসচে অত উঁচু গাছটার ফুলে ফুলে। প্রজাপতি—যার জন্ম শুঁয়োপোকা থেকে। শুঁয়োপোকা জীবন পরিত্যাগ করে প্রজাপতি রূপ পরিগ্রহ করেচে, নীল আকাশের তলায় সৌন্দর্যলোকে বিচরণের অবাধ অধিকার লাভ করেচে। ওই রাঙা ফুলে ভরা শিমুল গাছ, ওই নীল আকাশ, ওই উড্ডীয়মান রঙিন প্রজাপতি ও সব যেন একটা বড় দর্শনের গ্রন্থ—শুধু যে ভাষায় ওই গ্রন্থ লেখা তা সবাই পড়তে পারে না; বুঝতে পারে না। গভীর দর্শনতত্ত্ব ও বইয়ে লেখা রয়েচে—লেখা রয়েচে আত্মার অমরত্বের গোপন বাণী, লেখা রয়েচে তার কামচারি শক্তির অলেখা ইতিহাস। যে ওই ভাষা বুঝতে পারে সে জানে।

কাল দুপুরে ছিরেপুকুরের ওপারের রাস্তা দিয়ে শাঁখারিপুকুরের মধ্যে দিয়ে স্নানের পূর্বে খানিকটা বসলুম, তারপর বাঁশবনের ছায়ায় ঝরা-বাঁশপাতার পথ দিয়ে পুকুরের একস্থানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে ঘেঁটুফুলের একেবারে নিবিড় ভিড়। তেতো সুবাস ছড়াচ্চে দুপুরের বাতাসে। ওখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চাইতেই সেই উত্তর মাঠের রাঙা ফুলে-ভর্তি বড় শিমুল গাছটা চোখে পড়লো। আমি সৌন্দর্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নাবতে পারিনে, অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারদিন ভুলিনি। এবং সেকথা এখানে লিখেও রাখলুম এজন্য যে এই সব দুর্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই ক'টি লাইন পড়লে কালকারঅনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যু ন শঙ্কা" ভগবান যুগযুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধধারার মধ্যে দিয়ে। সকল জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেছেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন কত বসন্ত দ্বিপ্রহর কত ঘেঁটুফুল সুবাস বিতরণ করবে, অনাগত জীবনদিনে কত গ্রামে—কত মাতা-পিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে, কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুষ্কালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্ত-শিমুল-ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দুদিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্ত কালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলাসহচর, ভগবান চিরদিন আমাদের লীলাসহচর।

কাল দুপুরে চিল-ওড়া নীল আকাশ থেকে এই আনন্দের বাণী নিঃশব্দে নেমে এল সেই ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ভগবানের নীরব আশীর্বাদের মত। মন অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। শিরায় শিরায় সে কি জীবনস্রোত! কি উচ্ছল রস ও আনন্দের প্রবাহ!

কথাটা লিখেই রাখলুম, যদি ভুলে যাই। অন্য কেউ যদি এর পরে পড়ে, আশা করি সে এই নৈঃশব্দ্যের বাণীর গভীরতা বুঝতে পারবে, তারও জীবনে এই বাণী দেবে অমৃতের সন্ধান। জয়যুক্ত হোক আম্রমুকুল ও ঘেঁটুফুল সুবাসিত এই কাননের শান্ত দ্বিপ্রহরটি।

সকালে শাঁখারিপুকুরের ধারের বাঁশবনে ঝরা পাতার ওপর বসে ছিলুম। বাঁশ বনের নিচে ছায়ায় ঘেঁটুফুল ফুটেচে, আম্রমুকুলের সুবাসে বাতাস মদির, এখানে ওখানে মাঠ শিমুল ফুলের কি শোভা! চুপ করে বসে নলে নাপিতের আম বাগানের পুষ্পভারনত শাখা-প্রশাখাগুলির দিকে চেয়ে রইলুম। কোকিল ডাকচে, উষ্ণ মাটির গন্ধ বেরুচ্চে, শুকনো বাঁশপাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পড়চে, যেমন পড়তো আমার বাল্যকালে। ঘেঁটুফুলের তেতো সুবাসে মনের মধ্যে আমার কেমন একটা আনন্দ আনে। ত্রিনয়নী পিসিমার সঙ্গে খেলাঘরের মধুর বসন্ত-মধ্যাহ্নগুলির কথা মনে হয়—ত্রিশ বৎসর আগেকার সেই অতীত ফাল্গুন দিনের বার্তা এই ঘেঁটুফুলের সুবাসে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট ভাবে ফিরে আসে, আমি বাঁশগাছে হেলান দিয়ে বসে অবাক ভাবে দূরে রোদ-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরে বসে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের একটা অধ্যায় লিখি। কল্যাণী গিয়েচে ও-পাড়ার পাঁচী যুগিনীর কালীমার মন্দিরে। সঙ্গে গিয়েচে বুড়ি পিসিমা ও মানু।

কাল পাঁচী এসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। আমি এর কয়েকদিন আগে দোলের দিন রেডিওতে বক্তৃতা দিতে কলকাতা গিয়েছিলুম। সেখানে সুনীতিবাবু, মিঃ সিংপ্রভৃতির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কাল জগো ও ফুচুর সঙ্গে বেলেডাঙায় একটা বাবলার ডাল আনতে গিয়েছিলাম। ঘোষেদের বাড়ির পিছনে কি অপূর্ব ঘেঁটুফুলের সমাবেশ ও কি ওদের সম্মিলিত সুগন্ধ। এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয়, তা কি করে বলবো। অমন ঘেঁটুফুলের সুবাস আমি এ বছর অন্তত আর কোথাও দেখিনি। কোথায় লাগে সিনেমা থিয়েটার দেখার আনন্দ! ভগবানের কথা কেন যে এত মনে হয়!আইনদ্দির নাতি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে, সেই ছোকরা, যে স্কুলের আমার ছাত্র ছিল, সম্প্রতি গুরু ট্রেনিং পাশ করেচে। বড় চমৎকার লাগলো আজ ওই ঘেঁটুফুলের শোভা। দুঃখের বিষয় কেউ এ সব দেখতে আসে না।

আজ অপরাহ্ণে ছিরেপুকুরের ওপারে আমবাগানের তলায় ঘেঁটুফুলের ঘন বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এমন ফাল্গুন দিনে এমন ঘেঁটুফুলের সমারোহের মাঝখানে জীবন কোনোদিন কাটাইনি। চিরকালই বিদেশে কাটিয়ে এসেচি। হয় ভাগলপুরে নয় কলকাতায়, কিংবা মানভূমে, ঘাটশিলায়, ঝাড়গ্রামে। আজ বসে আছি, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে ফুলের ঘন সুবাসের মধ্যে। ফুলে ভর্তি ঘেঁটুবন আমার চারপাশে ঘিরে, লতাপাতার সুগন্ধ, সামনে গাছে তিত্তিরাজের আধফাটা ফলের থোলো ঝুলচে, কোকিল ডাকচে। ধন্য হোক ভগবানের নাম। ধন্য হোক সেই মহাশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি।

ক'দিন ধরে গণি ও সয়ারামের বিচার করচি পল্লীমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে। কাল রাত্রেও চড়কতলায় অধিবেশন হয়ে গেল। এ গ্রামের ঝগড়াবিবাদ মিটবে না। যত চেষ্টা করি বিবাদ থামাতে, তত আরও বেড়ে যায়। কাল বিকেলে কুঠির বাঁধানো গাঁথুনিতে কতক্ষণ বসে রইলুম—সব শুকনো লতা, পাতা, কাঠ, ডাল, তুঁতফল ইত্যাদির গন্ধ বেরোয় এ সময়। ভারি আরামের গন্ধটা। এ পারের মাঠে কতক্ষণ বসে একটা মূর্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম নির্জনে। সমিতির অধিবেশনের পূর্বে গিরিনদার বাড়ি এসে দেবপ্রয়াগের কথা হয়। সে শুধু খাবার জিনিসের গল্প। খোয়ার লাড্ডু বানিয়ে কি

ভাবে উনি পাণ্ডাদের খাইয়েছিলেন—সে গল্প। উনি বল্লেন— আবার চলো তুমি আমি বেরুই। আমি হবো স্বামীজী, তুমি প্রধান শিষ্য। ইন্দুর বাড়িতে ইন্দু সুবর্ণপুরের দাসুবাবুর গল্প করলে। দাসুবাবু বলতো—আর কি খাই আজকাল? একটি রুই মাছের মুড়ো ও গাওয়া ঘি রোজ খাদ্য ছিল—ইত্যাদি। চড়কতলায় খুব মিটিং। মুসুরি ডালের ক্ষেতে কতকটা মুসুরি খেয়েচে, তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। সয়ারাম বলে—আড়াই মণ মুসুরি হবে। ঘোর বিবাদ।

গভীর রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি। কল্যাণী বলচে, ওগো, জানালা বন্ধ করো, ভেঙে যাবে যে।

ঘুমের ঘোরে ভয়ে বলচে।

কাল খুব ঝড়বৃষ্টি হলো বিকেলে। রাধাবল্লভের জামাই কেষ্টর বাড়ি সন্ধ্যার পরে উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা হোল। অনেক লোক শুনতে এসেছিল, সতীশ ঘোষ, মতি দাঁ'র ছেলে যুগল, ললিত, লালমোহন, ফণিকাকা, গজন, ফকিরচাঁদ ইত্যাদি। শান্তিপুরের এক অদ্বৈত বংশের গোস্বামী মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। লালমোহনের বাড়ির পিছনের যে পথটা দিয়ে আমি সকালে গেলাম সে পথে জীবনে কখনও যাইনি—নতুন দেখলাম।বারাকপুরেও এমন সব জায়গা তাহলে আছে যা আমি জীবনেও কখনও দেখিনি।

রাত এগারোটার সময় ফিরে এলুম। অনেক রাত্রে ভীষণ মেঘগর্জন, তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কল্যাণী চমকে উঠেচে ঘুমের ঘোরে।

এ খাতায় অনেকদিন পরে আবার 'বনগ্রাম' কথাটি লিখচি। পাঁচ বৎসর পরে আবার বনগ্রামে বাসা করেচি—জাহ্নবীর বাসার কাছেই। আবার পুরোনো দিনের মত সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে যাই, সেই গাছপালার ফাঁকে বসে দাঁতন করি। পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি বড় ভাল লাগে। কোথায় ঘাটশিলার বনমধ্যস্থ হ্রদে সকালে স্নান করতে যাওয়া এই সময়ে, কোথায় নাকটিটাঁড়ের বন, ১লা বৈশাখ বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সামনে ভবানী সিংয়ের বাড়ির কম্পাউন্ডে বসে চা খাওয়া, বোরো নদীতে একসঙ্গে স্নান—হরদয়াল, আমি, ভবানী, সুবোধ ঘোষ, যোগীন্দ্র সিন্‌হা—আর বছরই তো। সে কি মজা! চাঁইবাসার সে ঘরদোর এখনও মনে পড়চে। কোল পার্ক, মাঠা পাহাড়ের বাংলো—ইত্যাদি। কোথায় সেই চরাই পাহাড়ের শিখরদেশ। এসব থেকে কোথায় আবার সেই বনগাঁর বাসা। ঘড়ি বাজে ঢং ঢং করে, যতীনদা'র বাসায় মন্মথদা'র বাসায় আড্ডা দিচ্চি—ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে উঠে বাজার করচি, ওপারের হাট থেকে গুড় কিনে আনচি, কয়লার দোকানে কয়লা কিনচি। এ সব জিনিস বহুদিন বনগাঁয়ে করিনি।

কাল কাপ্তেন চৌধুরীর মোটরে বিকেলে বিশ্বনাথ ও যতীনদাকে নিয়ে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে বেড়াতে গেলুম। আজ পাঁচ বছর আগে একবার এখানে এসেছিলুম। বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে। আজ শুক্লা চতুর্দশী, মন্দিরের সামনে চাতালে বসে আমরা হরিদাসের কাহিনী পাঠ শুনচি, প্রদীপের আলোয় বিশ্বনাথ পড়চে, ওদিকে চাঁদ উঠেচে, মন্দিরের চারিপাশে ঘন বনে শান্ত স্তব্ধতা নেমে এসেচে—বড় ভাল লাগছিল। হীরা নটির মূর্তির সামনেও আরতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হোলাম। কার কৃপায় পতিতা আজ দেবী হয়েছে? সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ভগবানের ছাড়া আবার কার কৃপায়? এক বুড়ি আছে, সে প্রণাম করে বলে—জীবই শিব। এখানে বুড়ি আছে আজ ষোল বছর। ১৩১০ সালে এই মঠ ও মন্দির তৈরি হয়। ভোলানাথ গোস্বামী বলে এক সাধক ভক্ত, বাড়ি তার মামুদকাটি, স্বপ্নে আদেশ পান এখানে হরিদাসের সাধনকুঞ্জের পুনরুদ্ধারের। এখানে এসে স্থানীয় নায়েব মহাশয়ের সাহায্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই তুলসী জঙ্গল ও আটখানা ইঁট আবিষ্কার করেন। তখন এখানে বাঘের আড্ডা ছিল। বুড়িটি বড় অদ্ভুত, সে-ই এসব গল্প করলে। বড় ভক্তিমতী আর বড় বিনয়ী—বৈষ্ণব ধর্ম এদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই কথার সত্য ওরা জীবনে আঁকড়ে ধরেচে, পালনও করেচে।

আজ বিকেলে পাঁচটার সময় কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়িতে গেলুম বারাকপুরে। মিতে,মন্মথদা, যতীনদা আমার সঙ্গে। কাপ্তেন চৌধুরী পথের পাঁচালীর দেশ দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বকুলতলা, সলতেখাকীতলা, ছিরেপুকুর, পুরানো ভিটে, বরোজপোতা, হরি রায়ের পাঠশালা—সব দেখালুম। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি। তারপর ফণিকাকার বাড়ি এসে দেখি চড়কের 'শয়াল খাটা' হচ্চে। বাল্যকালে আমার মনে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করতো এই 'শয়াল খাটা'। রামনবমী থেকে শুরু হোত, সেটা যেন একটা ফাঁকতাল্লা, তারপর চড়ক তার আনুষঙ্গিক কাঁটাভাঙা, 'শয়াল খাটা', নীলপুজো, মেলা, গোষ্ঠবিহার, সং—পরে সকলের শেষে যাত্রা বারোয়ারি। এ আনন্দের তুলনা ছিল? আজও সেই 'শয়াল খাটচে' সন্ন্যাসীর দল, গ্রামের ছেলেমেয়ে সেই ভাবে জড় হয়েচে—কিন্তু আমার মধ্যে সে আনন্দ আজ নেই। মীনা, কেতো—সবাই দেখচে বসে দেখলুম।

চড়কগাছ হবে বলে একটা কি গাছও কাটা হয়েচে চড়কতলার মাঠে। বেলা পড়ে গিয়েচে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠির কাছে এলুম। ভাঙা কুঠি দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠি দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়েছিলুম, বামনদাস মুখুজ্যেকে দেখিয়েছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠি হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নতিডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন প্রায় ৫/৬ বছর মোল্লাহাটি আসিনি। ডাকবাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেমসাহেবের গোর দেখলুম—সাহেবদের নীলকুঠির ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুরা, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্বিতা, মেমের দল। মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষাণবাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলুম। মালপাড়ার কাছে হরিপদদা'র সঙ্গে দেখা। এসে রাত্রে আবার আড্ডা।

কাল সামটাতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম সতীনাথ মিত্রদের বাড়ি। প্রায় একমাস লিখিনি এ খাতায়। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলে, তার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সব কারণে লেখা হয়নি অনেকদিন।

কাল সামটায় যাবার পথে উলুসী গেলুম। কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়িতেই গেলুম। যে উলুসীতে মধুকানের বাড়ি, সেই উলুসী। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী বায়ু বাংলার পল্লী অঞ্চলের নানা পুষ্পসুবাসে সুরভিত। বিল্বপুষ্প, তুঁত গাছের ছোট ছোট ফুল। পথের দুধারে ফুলে ভরা সোঁদালি গাছ যেন নুয়ে পড়চে।

কতকাল আগে মধুকান মারা গিয়েচেন, আজ এতকাল পরে তাঁর জঙ্গলে-ভরা ভিটে দেখতে প্রায় একশ' বছর পরে আমরা এসেচি।

আমরা পল্লীকবির ভিটেতে দাঁড়িয়ে আছি, বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকের মধ্যে—একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে যাচ্চে। সে মধুকানের বংশের মেয়ে। তার মুখে আমরা মধুকানের গান শুনতে চাইলুম। সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল আমাদের। আমরাবল্লাম—মধুকানের কোনো খাতা আছে ঘরে?

সে বল্লে—হ্যাঁ।

নিয়ে এল দুখানা খাতা। ১২৭৪ সনে মধুকান মারা গিয়েচেন। সেই সময়ের খাতা। তিনি মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন—সেই সময় মুখ দিয়ে যা বলে যেতেন—মহুরিরা লিখে নিত। একটি বৃদ্ধ মধুসূদনের একটি গান গাইলেন।

ওখান থেকে বেলা সাড়ে বারোটার সময় চলে এলুম সামটাতে। রাধানাথদা, ব্রজ এরা ছিল। ডাকবাংলোয় মোটর পাঠিয়েছিল আমার জন্যে। দুটি নিদ্রিত সুন্দর মুখের ছবি আমাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি মনে করিয়ে দিলে।

ওদের বাড়ির নীচে কচুরিপানায় বোজানো ব্যাতনা বা বেত্রবতী নদী বয়ে গিয়েচে। এ নদী এখন একেবারে মজা। একসময়ে নাকি স্টিমার চলতো। বিকেলে নাভারণ ডাকবাংলোতে ফিরে হাট দেখতে গেলুম বিজয়কে নিয়ে। বেত্রবতী নদীর পুলটার ওপর বসে বসে ভগবান সম্বন্ধে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। সেই নিদ্রিত দুটি সুন্দর মুখের ছবি।

ক'দিন অতি ভীষণ গরম গিয়েচে। কাল যখন রাত্রে মন্মথদা'র বাড়ির আড্ডা থেকে ফিরি, তখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যে কি ভয়ঙ্কর গুমট দেখা দিল। আমার মনে হোল এ গুমটে রাত্রে মশারির মধ্যে কেমন করে শোবো। কিন্তু যেমন বাড়ি এসেছি—অমনি আকাশে মেঘ জমে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হোল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ জোলো বাতাসে। কল্যাণী বল্লে—বাদলা হবে। আমি বল্লাম—তা হোলে তো বাঁচি। কিন্তু আসলে বাদলা হোল না। আধ-ঘণ্টাটাক বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল।

সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বরে দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদস্তুর চুক্তি করে মহাদেববাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেচে, পথের দুধারে নক্সভমিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়িও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্মল বসুর তোলা ফোটো-অ্যালবামে উদয়গিরির এই সব গুহার ছবি যেমন দেখেছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে

চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণবেদিকার মত। বনে বনে পাখি ডাকচে, বন্য যূথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘমেদুর আকাশ, দূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনিঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি বড় চমৎকার, ঠিক একটি বাঘের মুখ খুদে বারকরেচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে, তারপরনেমে এলাম নীচে। একটা বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়িতে, ধর্মশালার পাশে, সে বল্লে, আমি আচার মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে?

—আছে।

তারপর যে আচার আনলে তা নুন মাখানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলাচলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে—সেখানে নামবারপথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। ডাকবাংলোর বারান্দায় খেতে বসেচি, এমন সময়এল ঝড়-বৃষ্টি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল খুব। জৈন ধর্মশালায় চা বিক্রি হয় জানতাম না—সেখানে কয়েকটি লোককে চা খেতে দেখে গিয়ে বসলাম—চা-ও পাওয়া গেল।

আবার ভুবনেশ্বর রওনা হলাম গরুর গাড়িতে। পথের ধারে শুধুই নক্সভমিকারবন, আর একটা গাছ—তার নাম মহীগাছ। সেই বনযূথিকার নাম নাকি আঁধি কলি, এখানে ও ফুল খায়। অবাধ দৃষ্টি কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, থই থই করচে, space-এর সমুদ্রে দূরের ভুবনশ্বরের মন্দিরগুলির চূড়া যেন ডুবে আছে। মাটির রং রাঙা, তার পাষাণ বাঁধানো ওপরটা। গরুর গাড়ির চাকা গিয়ে গিয়ে পাথরে কেটে গিয়েচাকায় লিকের সৃষ্টি হয়েচে।

ভুবনেশ্বর পৌঁছুতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খপ্পরে পড়ে গেলুম। সেবিন্দু-সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্মশালায়। গৌরীকুণ্ডেআমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছুফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল ফেউয়ের মত পিছু লাগলো। কোনোক্রম তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্মশালায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে বিশালকায় পাষাণদেউলের বুকে। একটি নর্তকী মূর্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণ খোদাই লিরিক কবিতা। নক্সভমিকার জঙ্গলে অতীতের ইতিহাস চাপা পড়ে যায় যায়। ঝম্পাসিংহ, উদো গজ সিংয়ের কথা জানি নে।

স্টেশনে ফিরবার পথে আবার ভিখিরির দল গরুর পিছু পিছু করুণ সুরেপ্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করতে করতে ছুটলো প্রায় এক মাইল রাস্তা। ট্রেন আসতে দেরিছিল। হু হু সমুদ্রের হাওয়া বইচে, আমরা শুয়ে রইলুম প্ল্যাটফর্মে। চারটের সময় গাড়ি এল। ওই দূরে উদয়গিরি, ওই খণ্ডগিরির ওপর জৈন মন্দির। গাড়ি চলেছে—গাড়োয়ানওবেলা দেখিয়েছিল খুরদা রোডের দুটি রাঙা কাঁকরের পাহাড়, তার ওপর দুটি গাছ—সে পাহাড় দুটো কাছে এল। খুরদা রোড স্টেশনে আর বছরে 'ডিটেকটিভ'নাটকের অভিনয়ে যে বেশ নাম করেছিল সেই ইন্দুবাবু এসে আলাপ করলেন। আবারসেই মালতীপাতপুরের নারিকেলকুঞ্জ। যেন পাপুয়া নিউ হেব্রাইডিস-এর বেলাভূমিরছবি। পুরী স্টেশন থেকে ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তার ছেলে বামনের সঙ্গেদেখা হোল। আমরা ধর্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শনকরতে। ঠাকুরের সিঙারবেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথবাবুরসঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। আর বছর আর এ বছর। সেই মন্দিরের নানাস্থানে ধর্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতূহলী ও ধর্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়। এ দোকান ও দোকানঘুরে সুমথবাবু খাবার জিনিস কিনতে লাগলো। রাত ন'টার পরে ফিরি। একসঙ্গে খেতেবসি—গৌরীশঙ্কর, সুমথ ও মহাদেববাবু। ওরা রাত্রেই চলে গেল।

নীল সমুদ্র। আবার সেই উত্তালতরঙ্গময় নীল সমুদ্রের গর্জন!

সকালে উঠে প্রথমেই গেলুম হরিদা'র বাড়ি। বামন বল্লে, তিনি বেরিয়ে গেলেন।আমি আর বছরের সেই বালিয়াড়ি ও শাল গাছ-দুটির পাশ দিয়ে কতবার মঠে গেলুম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি আবার দর্শন করলুম। পুরুষোত্তম মঠে সেই স্বামীজীর ধর্মোপদেশশুনলুম। ফিরবার পথে ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ি গেলুম। তার স্ত্রী জলখাবার খাইয়ে তবেছাড়লেন।

বড় রোদ চড়েচে। বালিয়াড়ির পথে আবার যাত্রা। সেই পলং গাছ পথে পড়লো। ধর্মশালায় ফিরে আর বছরের মত খিদেতে ছট্‌ফট্ করি। একটা বাজে, তিনটে বাজে, কোথায় মহাপ্রসাদ! এই আসে, এই আসে—কিছুই না। বীরেন রায়

মশায় এলেন—আমরা আহারান্তে বসে গল্প করি। জানালা দিয়ে দেখি বাঁদিকের জানালায় ঢেউ-সঙ্কুলনীল সমুদ্র, ডানদিকের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দিরেরচূড়া—পুরীর দুই বিরাট বস্তু।

'কাকে ফেলে কাকে রাখি কেহ নহে ঊন।' বিকেলে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলি ও অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বসে বসেহরিদা ও বীরেনবাবুর সঙ্গে চীনাবাদাম খেতে খেতে জ্যোৎস্নালোকে গল্প করি। ওখানথেকে উঠে ধর্মশালায় এসে দেখি 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতাকরবেন। হরিদাকে নিয়ে এসে বসালুম সভায়।

অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নলোকের সমুদ্রের শোভা দেখি ছাদ থেকে। জগদ্বন্ধুআশ্রমের স্বামীজী পরিমল দাস ও আর একটি ছাত্র এসে গল্প করলেন। স্বামীজীএকখানা বই দিলেন পড়তে—প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী। পুরীতে একটা সুবিধে, সবসময়েই ভগবানের কথা বলবার লোক মেলে। অনেক রাত হয়েচে, ঘুম আসে নাচোখে। গরম নেই, হু হু সমুদ্রের হাওয়া, শেষ রাত্রে বেশ শীত ধরিয়ে দিলে।

সকালে উঠে হরিদাস মঠে গেলুম। মলয়াবাস বলে একটা বাড়িতে হরিদা'র সঙ্গেবসে চা খাই। প্রসাদ আসে না তখনও, সবাই খোঁজ নেয় কেন প্রসাদ এল না। বেনারসহিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বেশি রকম খবর করলেন। ভোগ কিনে খেলুমআনন্দবাজার থেকে। পুরীর বাসনের দোকান থেকে একটা ঘটি কিনে পাইকপাড়ারাজবাড়িতে সভা করি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। সুখময়বাবুর বাড়ি চা খেতে গিয়ে নিরাশ হলুম। সেই সময় এল ঝড়-বৃষ্টি। শেষরাত্রে ফস্‌ফরাসের দীপ্তিবিশিষ্ট আলোকোৎক্ষেপী ঢেউ যেন জ্বলচে অন্ধকারে। আমরা বিছানা ঘাড়ে করে স্টেশনে এলুম। ভোরবেলা ট্রেন ছাড়লো।

সারাদিন ট্রেনে, মাঝে মাঝে ভিড় হয়, মাঝে মাঝে ভিড় চলে যায়। কটক স্টেশনেকতকগুলি রাজবন্দী নেমে গেলেন, এঁরা বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসচেন।একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, এঁরা ন'পুরুষ হোল উড়িষ্যায় বাস করছেন, পূর্বে বাংলাদেশে বাড়ি ছিল। ভদ্রক স্টেশনে স্নান করলুম কলের জলে, তখন বেলা সাড়ে তিনটা।ধানমণ্ডল স্টেশন ছাড়িয়ে কেবল পাহাড়, সামনে ও দূরে। মাটির রং লাল, অনেকমনসাগাছ জঙ্গলে, ঝাটিজঙ্গলের বড় শোভা। যাজপুর রোডের কাছে এসে আমার মনে হোল এবার চক্রধরপুরের সমান্তরাল রেখায় এসে পৌঁছেচি—তখুনি একটা লোকবল্লে—এখান থেকে চাঁইবাসা চক্রধরপুর রোড আছে—এই দেখুন সেই রাস্তা। একটু পরে বৈতরণী নদী পার হলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখাও পার হওয়া গেল। এই শেষ বড় নদী এ লাইনে। আগে সুবর্ণরেখা, তারপর বৈতরণী, তারপরে ব্রাহ্মণী, তারপরে মহানদী, তারপরে কাটজুড়ি। আর কোনো নদী নেই এদিকে। আর যা আছে সে সবঅনেক দূরে—যেমন গোদাবরী রাজমাহেন্দ্রিতে।

খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন এল রাত এগারোটা। মেচেদা স্টেশনে এল বৃষ্টি। ভোরবেলা আবার বৃষ্টি এল সাঁতরাগাছি স্টেশনে। ননীর সঙ্গে দেখা করবো বলেইএখানে নামলাম।

পুরী থেকে এলুম শুক্রবার, গেলুম গোপালনগরে হাজারি প্রামাণিকেরভ্রাতুস্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে। শশীর মুহূরি ও আমি একসঙ্গে বসলাম বাড়ির ভেতরে।জিতেন দফাদার বল্লে—কি রকম, পুরীর লোক এখানে কেন? এখানে কেমন বারোয়ারিযাত্রা হয়ে গেল, আপনি ছিলেন না।

ওরা ভাবলে আমি না-জানি কতদিন পুরী গিয়েছিলাম।

বৌভাতের নেমন্তন্নে বেশ ভালই খাওয়ালে এ বাজারে। লুচি, পোলাও, মাছেরকালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, চাটনি, দই পায়েস, সন্দেশ রসগোল্লা, আম, কাঁটাল। হাজারিবল্লে—তোমায় বরযাত্রী নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল ভাই। আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম।পুরীতে ছিলাম, কি করবো। খাওয়ার পর সেকেন পণ্ডিত ও মল্ল বাইরে এসে বসেকতক্ষণ গল্প-গুজব করলে। স্কুলের চাকুরির নিয়োগপত্র দিলে মল্ল। ২৬শে জুন চাকুরিতে যোগ দিতে হবে। আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না, কি করি।

বাহাদুর ও আমি হেঁটে চলে এলুম বেলা তিনটার সময়। কাল গিয়েছিলুম আবালুর হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়িতে বেনাপোলে। কাপ্তেন চৌধুরী ডাকবাংলা থেকে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। ওঁর জিপ গাড়ি কাল কলকাতা পাঠানো হচ্চেসারানোর জন্যে, তাই আজ আমাকে নিয়ে চল্লেন হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়িতে। আশ্চর্যঠিক সেদিন যে সময় ভদ্রক যাচ্চি বালেশ্বর থেকে, আজ সেই সময় বনগাঁ থেকেবেনাপোলে চলেচি। পুরীতে দেখে এসেছি সেদিন এই মহাপুরুষের

সমাধি, আজ যশোরজেলার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বাঁশবন ঘেরা ক্ষুদ্র জায়গাটিতে তাঁর সাধনস্থান দর্শনকরলুম। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলো, আরতি আরম্ভ হয়েচে, গুমট গরম। বেশ লাগচে এইপবিত্র নিভৃত তপোবনটি। যশোর জেলার গৌরব যে অত বড় মহাপুরুষ একদিনএখানকার মাটিতে জণ্মেছিলেন, এখানকার জলে বাতাসে পুষ্ট হয়েছিলেন। নদীয়ায়যেমন শ্রীচৈতন্য, ঠিক তেমনি সময়ে পার্শ্ববর্তী জেলায় হরিদাস ঠাকুর।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে লিচুতলায় জ্যোৎস্নায় বসে মিতে, যতীনদা, শিবেনদারসঙ্গে আড্ডা দিলুম।

গোপালনগর থেকে প্রতিদিন মাঠের পথ ধরে যাতায়াত করি। আউস ধানেরক্ষেতে বড় বড় ধানের সবুজ গোছা, গাছের মাথায় মাকাল লতার বড় ঝোপ, পাখিরডাক—এ সবের মধ্যে দিয়ে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরি। সেদিন মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নদীরজলে গা ধুতে নেমেছি, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই, কুঠির দিকে চেয়ে দেখি যতদূর চোখ যায়, মেঘলা আকাশ নেমে উবুড় হয়ে রয়েচে সবুজ মাঠের ওপরে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা আমায় মুগ্ধ করলে, সেটা হচ্চে এই—সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকা জ্বলচে নিব্‌চে। তখনও রাতের অন্ধকার নেমে আসেনি, অথচজোনাকির হুল থেকে বেশ আলো ফুটেচে। সে যে কি অপুর্ব দৃশ্য! ভগবানের হাতেরশিল্প, আইডিয়ারূপী ব্রহ্মের প্রকাশ এর প্রতি রেণুতে রেণুতে...এ সত্যি দেখবার মতজিনিস। কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। অজ পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত, নিভৃত কোণে, এই মেঘভরা বাদল সন্ধ্যায় এত বড় সৌন্দর্য কারও দেখবার অপেক্ষা রাখচে না। এআপনাতে আপনি মহান। এ জানিয়ে দেয় যে বিশ্বশিল্পীর চিত্রের পটভূমি হিসেবে বিশ্বেরসকল স্থানই মহিমময় পবিত্র—তাঁর নীরব বাণী এদের বাতাসে, ধূলিতে, পত্রের মর্মরে, এই জোনাকি পোকাগুলোর জ্বলন্ত নিবন্ত আলোকপুঞ্জে।...

সেই বারাকপুরের মেঘমেদুর দিনগুলি। বড় ভাল লাগে এরকম দিন। ঝোপেঝোপে মটরলতার থোলো থোলো বুনো আঙুরের মত মটরফুল ঝুলচে। ওপাড়ার ঘাটে ঘোলা নদীজল যেখানে তীরের ঘাসবন ছুঁয়েচে, সেখানে এমনি এক ঝোপে কি সুন্দরসাদা সাদা ঈষৎ সুগন্ধ ফুল ফুটে আছে, তার পাশেই সেই মটর ফল দুলচে। কয়েকদিনধরে সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়াতে যাই খুব ভোরে। রোজ সকালে সেই ফুলে-ভর্তি ঝোপটির সামনে দাঁড়িয়ে ওপারের সবুজ ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি। ভগবানেরআবির্ভাব এই নব প্রভাতের সজল বর্ষাশ্যামল বনানিকুঞ্জে, ওই দূরবিস্তৃত বননীল দিগন্তের মেঘলা সকালে শাখায় শাখায় বনবিহঙ্গের কলকাকলীতে।

কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরি করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এই সব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি, কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায়। কত কি পাখির গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তরমাঠের বন থেকে,—শাঁখারিপুকুরের ধারের গাছপালার ওপরে-ওঠা মাকাললতা থেকে—মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায়বেড়ানো, তখন বোধ হয় বনপরীরা সঙ্গে নিয়ে খেলে বেড়াতো—বুঝতাম না সংসারেরকিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েচে কোনো ঝোপে, কোথায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোনো গাছে—এই সব। বনপরীদের সঙ্গী ছিলামতখন। মনে এতটুকু ধুলো মাটি লাগেনি সংসারের। কি অপূর্ব আনন্দে মন মেতে উঠতোযখন দেখতাম গাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায়না,পাখিরও অখাদ্য কোনো কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয়—এ সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভাল লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। শেকস্‌পীয়ার বুঝেছিলেন, তাই বলচেন, "The play is the thing." Play! লীলা, খেলা। সংসারশাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি। এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ি বানাতে, আসেনি ব্যাঙ্কে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হয়ে, 'স্যার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির ডিরেকটর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। নিজের রূপটি ভুলে যায় তাই ওসব করে।

তারপর যা বলছিলুম। ওই সব বাল্যসঙ্গী, বননিকুঞ্জ, ফুলফল, নদীতীরেরসাঁইবাবলা ও কুঁচলতার ঝোপ, সূর্যাস্তের আভা-পড়া বেলেডাঙার মরগাঙ, বিলের টলটলে জল—এদের ছেড়ে কলকাতার অপকৃষ্ট এঁদো-পড়া মেসবাড়ির নোংরা ঘরেবিদ্যার্জন ও চাকুরির জন্য বাস করে কি কষ্টই না পেতুম! মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। ভাবতাম, এমন দিন কি কখনও আসবে না যখন আবার দেশে ফিরে যাবো? গ্রামেবর্ষাকাল কখনও কাটাইনি। বাল্যদিনের পরে চিরকালই স্কুল বোর্ডিংয়ে, কলেজহোস্টেলে ও মেসে কাটচে ১৯১২ সালের পর থেকে। কখনও কি আবার ঢল-নামাবর্ষায় ইছামতীর ধারে কালো

বনসিমলতার ঝোপের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসবো না মনেরআনন্দে, আর কি কখনও শুনবো না কুঞ্জ কঞ্জে পত্রমর্মর, গাঙশালিক ও কুকো পাখিরডাক, বাঁশঝাড়ে জড়াপট্টি পাকানো বাঁশের কট্‌কট্‌ শব্দ?

এতকাল পরে সে স্বপ্ন আবার সার্থক হয়েচে, ফিরে পেয়েছি বাল্যকালের সেইবর্ষাসজল, শ্যামল দিনরাতের স্বপ্ন...স্বপ্ন..! আজও তেমনি মটরলতা ঝোলে ইছামতীর তীরের বনে বনে, তেমনি পাখি ডাকে, তেমনি সুবাস বেরোয় নাটাকাঁটার হলুদ রংয়ের ফুলের থোকায় থোকায়। বিশ্বের অধিদেবতা যেমন সত্যি এরাও তেমনি সত্যি, শাশ্বতসুন্দর। মরে না, ঋতুতে ঋতুতে পুনরাবর্তিত হয়, নবরূপে ফিরে আসে—যুগ যুগ ধরে চলেচে ওদেরও লীলা।

"The play is the thing..."

ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো—নাম দেবো তার 'ইছামতী'। বড়উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব জীবন-প্রবাহেরইতিহাস—বননিকুঞ্জের মরাবাঁচার ইতিহাস, কত সূর্যোদয়, কত সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্তইতিহাস।

কালই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, অতুলকৃষ্ণ কুমার মহাশয়েরমোটরে কাল সারা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। বাণীরায়দের বাড়ি গেলুম, দেবেন ঘোষরোডের মেস থেকে পুত্র-শোকাতুর ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মোটরে করে দু-এক জায়গায়ঘুরলুম। কলকাতায় বেশিদিন আর থাকতে পারিনে—ভাল লাগে না।

সজনী দাস এখানে নেই, ভাগলপুরে গিয়েচে বেড়াতে।

কাল স্কুল থেকে ফিরলুম মাঠের পথ দিয়ে। কি কালো নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ করেচেসেই অপূর্ব ঝোপটির পেছনে মুচিপাড়ার দিকের আকাশে। একটা তেলাকুচো পাতার মস্তবড় সবুজ ঝোপ আছে এ মাঠে। মস্ত তেঁতুল গাছ বেয়ে ঝোপটা উঠে গাছের মাথা ঢেকে দিয়েচে ঘন সবুজ উত্তরচ্ছদে।

আমি যখনই এপথে স্কুলে যাই, তখন দেখি এই ঝোপটা। মনে মনে ভগবানেরকাছে প্রার্থনা করি, তুমি একদিন এই ঝোপের মাথাটা সাদা সাদা ফুলে ভরে দিয়ো, আমিদুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখতে দেখতে যাব। কি সুন্দর দেখাবে তখন, ভাবলেও আনন্দ হয়। কাল কোথায় যেন দেখলুম রেললাইনের ধারে কোন্ ঝোপে বনকলমী ফুল ফুটেচে। কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যে যে ঝোপে বনে বনকলমীরফুল ফোটে সেখানে গিয়ে দেখেচি, কোথাও ফোটেনি। এই শ্রাবণের শেষের দিকেই কিন্তুও ফুল ফোটে।

আজ দেখি একটা বনবিড়াল ঝোপের তলা দিয়ে কালু মোড়লের ধানক্ষেতের দিকে যাচ্চে। বেশ বড় বনবিড়াল, লেজের দিকটা ডোরাকাটা। আমি দেখে থম্‌কেদাঁড়িয়ে গেলাম, একদৃষ্টে দেখতে লাগলুম, সাড়া পেলেই লেজ তুলে এখুনি দৌড় দেবে। মিনিট খানেক পরে দিলেও তাই, কি করে আমার উপস্থিতি অনুভব করতেপেরেচে। একদৌড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্যহোল।

বাড়ি এসে চা খেয়ে মেঘলা বিকেলে বাঁশবনের দিকে বারান্দায় ইজি-চেয়ারপেতে আরাম করে বসে প্রিস্ট্‌লির 'Good Companions'পড়ি। কয়েক পাতা পড়তেপড়তে বৃষ্টি বলে আর কোথায় আছি। সেই যে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, চললোসারারাত।

আজ খুব ভোরে কল্যাণী ও আমি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শ্রাবণমাসের ঘন বর্ষার প্রাতঃকাল, সে কি শোভা হয়েছে উত্তর মাঠে, কি কালো কালো মেঘ বড় শিমুল গাছটার মাথায়, মাঠ ভরে গিয়েচে বৃষ্টির জলে, মাঠের ধারের ঝোপে ঝোপে নাকজোঁয়াল ফুল (gladislasily) ফুটে আলো করে আছে। এই বর্ষা-ভেজা হাওয়ায়মুক্তির স্বপ্নলোকে মন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে...যে মুক্তি মেলে এমনি মেঘকজ্জলশ্রাবণদিনে টুপটাপ জল-ঝরা ছাতিম বনে, নটকান ফুলের বনে, পাপিয়ার ডাকে, দোয়েলের ডাকে। (আজ ভোরে যখন শুয়ে আছি বিছানায়, কি চমৎকার পাপিয়া ডাকছিল!) সেই বৃষ্টির এক হাঁটু জলে আকাশ-ভরা কালো মেঘের তলে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঋষিদের সেই পবিত্র গাথা :—

সৃজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে নাশেন যিনি

শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

ছুটির দিনটা। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। হাজারী জেলেনী সকালে টাটকা রিটে মাছদিয়ে গেল গাঙের। এখন ঘোলা জলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেলে মাছ আর চিংড়িই বেশি। রিটে মাছ খুব তেলালো সুস্বাদু মাছ, ইছামতী ছাড়া

অন্য কোনো নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সের। যুদ্ধের আগে যে মাছ ছিল পাঁচ আনা সের, এখন তাই দেড় টাকায় পাওয়া ভার। কল্যাণী কাঁচা মাছ তেলঝোল করে বড় চমৎকার। আজও তাই করলে, আর ঢেঁড়স ভাতে। সাড়ে বারোটার সময়ে কল্যাণীও আমি নদীতে স্নান করতে নামলাম। কি সুন্দর মাকাল লতার ঝোপটা জলের ধারে।নাটাকাঁটার একটা সুগন্ধি ফুল তুলে কল্যাণীর হাতে দিলুম, ও খোঁপায় গুঁজলে।

বিকেলে হাবু ও ফুফুকে নিয়ে অপূর্ব রঙিন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের বটঅশত্থ গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলে গেলাম মরগাঙে। অনেকদিন এদিকে আসিনি। পথেপথে সবুজ ঝোপঝাপের কি ভরপুর সৌন্দর্য। বাঁওড়ে জল বেড়েছে অনেক, ডাঙারকাছে জলিধানের ক্ষেতে বকের দল চরচে। ওপারের অস্তদিগন্তের পটভূমিতে পাটক্ষেতে চাষারা পাট কাটচে, কোথাও কোথাও জলিদান কাটচে, মাড়ল গাজিপুরের কাওয়ারা শূয়োরের পাল চরিয়ে বেড়াচ্চে বাঁওড়ের কাদায় কাদায় (কাদা=তীর) শূয়োরের পাল মাটি খুঁড়ে মুথো ঘাস তুলে খাচ্চে, টাটকা মুথো ঘাসের শেকড়ের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

মরগাঙের ধারে গিয়ে দেখি ফণিকাকা ইন্দু রায় মাছ ধরে ফিরচে। আমরা বল্লাম, কি পেলে? ওরা ভাঁড় দেখালে। কিছুই পায়নি। কাঠের বড় কষ্ট হয়েচে, আমি একবোঝা শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলাম। শুকনো বটের ডাল, ষাঁড়ার ডাল, তিত্তিরাজের ডাল। কুঠির মাঠের পথে এসে নিবারণের বেগুন ক্ষেতের নীচে নদীতে স্নানকরতেনামলুম। মাধবপুরের চরের ওপর আকাশের কি অদ্ভুত ইন্দ্রনীল রং! তারইপটভূমিতে বড় একটা শিমুল গাছ, কাশবন, আউশ ধানের ক্ষেত মায়াময় দেখাচ্চে। নদীজলে সেই অদ্ভুত নীল রংয়ের প্রতিচ্ছায়া।

চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েছি কাল। ওর সঙ্গে যোগ এতদিন পরেও ঠিকবজায় আছে। কোথায় চলে গিয়েচে খুকু, কোথায় সুপ্রভা।

দুদিন মোটে বৃষ্টি নেই। খরতর রোদে পুড়ছি। কাল বহুকাল পরে নদীর ধারেপুরনো পট্‌পটি তলায় বেড়াতে গিয়ে জলে নেবে কলমিশাক তুলে আনলুম। আমারবাল্যকালে এখানে সায়ের ছিল, আইনদ্দি কয়াল ধান মাপতো। তারপর বহুদিন মনুরায় এ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে পটলের ক্ষেত করে। নদীর বাঁকের এ জমির সে অপূর্ব শোভা নষ্ট করেচে, বাল্যের সে মটরলতা দোলানো শোভাময় ঝোপঝাপ, সে নিভৃত স্বপ্নভরা লতাবিতান কুড়ুলের মুখে অন্তর্হিত হয়েচে বহুকাল। কেন? না, মনু রায় বা তার পুত্রপরিবার পটল ভাজা খাবে। এখন আর সে পটলের ক্ষেত নেই তাই বেড়াতেগিয়েছিলাম। নদীর ধারে (একটা ছোট বিছে যাচ্চে, দেওয়াল বেয়ে উঠচে, কেন ওটামারবো?) গিয়ে দাঁড়াই। ওপারে পাটকিলে ও খাঁটি সিঁদুরে রঙের মেঘের ছটা ঠিকসূর্যকিরণের ছটার মত অর্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজ করচে। যেন কোনো বিরাট পুরুষঅনন্ত, অসীম বিরাট বাহু প্রসারিত করে সারা ব্যোম ছেয়েছেন। সেই অনাদ্যনন্ত বিরাটপুরুষ যেমনি ওই ক্ষুদ্র পুষ্পিত লতার মধ্যে প্রাণরূপী, তেমনি আবার ধারণাতীত বিরাটত্বের, বিশালত্বের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তেঁতুল-তলার ঘাটে নদীর দিকের ঝোপটাতে সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল দুলচে, মটরলতায় ফলের থোলো ঝুলচে—শ্রীঅরবিন্দের কথায় "সচ্চিদানন্দ যেমন বল্মীকস্তূপে তেমনি সূর্যমণ্ডলে।" 'সূর্যমণ্ডলে' কথাটা তিনি বলেন নি, বলেছেন, "in the system of suns" অর্থাৎ বহু বিরাট সূর্যাকার নক্ষত্রসমূহ-দ্বারা গ্রথিত বিশ্বে।

মুক্তি! মুক্তি! মনের মুক্তি! আত্মার মুক্তি! এই সন্ধ্যায় সীমাহীন আকাশেরদিগন্তলীন অভ্র-বাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে, তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্টবনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ। কিন্তু মুক্তি নিচ্চে কে? সবাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। হে বদ্ধ জীব, সন্ধ্যার আকাশতলে দাঁড়িয়ে সেই পরিপূর্ণ, অবাধ সেই মুক্তির বাণী শ্রবণ কর। একমুহূর্তে বদ্ধতা ছুটে যাবে (অর্থাৎ দূরে যাবে), অমরত্ব নেমে আসবেপ্রাণে মনে।

কাল রাত্রের ভীষণ গুমট গরমের পরে আজ নদীতে নামলুম স্নান করতে। অমনিওপারের চরের দিকে চেয়ে দেখি নবনীল নীরদপুঞ্জ দিগন্তের নিচে থেকে ঠেলে উঠেঝড়ের বেগে উড়ে আসচে এপারের দিকে, ভগবানের স্নিগ্ধ করুণার মতো। কেউ কি দেখেচে এমন কাজল কালো মেঘের সজল অভিযান, ঘন মেঘমালার এলোমেলোআলুথালু হয়ে উড়ে আসার এ অপূর্ব দৃশ্য? আমার মনে পড়লো ভাগলপুরেরআজমাবাদ কাছারিতে এই ভাদ্র মাসেই আমি একবার এ দৃশ্য দেখেছিলাম, সেওএইরকম সকালবেলা। বেনোয়ারি মণ্ডল পটোয়ারিকে ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালাম সে দৃশ্য। আর কাকে দেখাই? সেখানে আর কেউ ছিল না। বেনোয়ারি মণ্ডলকেপ্রকৃতি-রসিক বলে আমি ডাকিনি, কাউকে ডেকে ভাল জিনিসের ভাগ দেবো বলেইডেকেছিলাম, মনে আছে বেনোয়ারি উড়ন্ত মেঘপুঞ্জের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকেআমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বল্লে—হ্যাঁ, বাবুজি, আচ্ছা হ্যায়। এই মাত্র সংক্ষিপ্ত comment করে সে এই বাতুল বাংগালী বাবুর পাশ কাটিয়ে কাছারি ঘরে খতিয়ানলিখতে ঢুকলো।

আজ কেন ওই মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল তা কে বলবে? ভগবানের কথা মনে করেই চোখে জল এল কি? তাঁর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেই কি?

হয়তো হবে....

কিন্তু এ সম্পূর্ণ অকারণ। আমি কি জানি নে এমন খর, ঊষর মরুভূমির দেশের কথা যেখানে মাসের পর মাস কেটে যায় ১২০°। ১২৫°ডিগ্রি উত্তাপের মধ্যে, যেখানে এক বিন্দু বারিপাতের সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না।

তবু ভগবানের দান, ভগবানের দান। সর্ব অবস্থায়, সর্ব দেশে তার অসীম করুণার দানকে যেন মাথা পেতে নিতে পারি। প্রাকৃতিক কারণে মেঘ সঞ্চিত হয়েচে আকাশে, উড়ে আসচে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুস্রোতে—এর মধ্যে 'ভগবানের দান' কি আবার রে বাপু? যত সব সেন্টিমেন্টাল ন্যাকামি!

হে অনন্ত, হে অসীম, হে দয়াল তোমার বহু দূত, বিশ্বের সব দেশে কত চর—সব কিছুর পেছনে তোমার প্রকাশ, তোমার মহান অভ্যুদয়—এ সত্যকে যেন না ভুলি।সব রকম দানকে যেন তোমার হাতের অমৃত পরিবেশন বলে মেনে নিতে পারি।

আজ সকালে উঠলাম। মনে খুব আনন্দ। হয়তো বা শহরে রোদ ফুটবে খুব।পট্‌পটি তলার সায়েরে গেলুম নদীর ধারে, পূর্বদিকে সামান্য কিছু মেঘ, আকাশ মোটামুটিবেশ পরিষ্কার। ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে ওপারের শোভা দেখি একমনে। সেইসাঁইবাবলা গাছ থেকে মটরলতা দুলচে, সেই সাদা ফুলে ভরা লতায় কিছু কিছু ফুলএখনও দেখা যাচ্চে। একটা নৌকো এসে লেগেচে—ছইওয়ালা নৌকো।

বল্লাম—কোথাকার নৌকো গো?

—আজ্ঞে বাবু, বাজিতপুরের।

—সে কোথায়?

—মাজদে'র সন্নিকটে।

—কি কিনবে?

—কাপড় কিনতে এসেচি গোপালনগরের বাজারে।

—কবে সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে?

—আজ বেলা বারোটায় ছাড়লে কাল সন্দের সময় নৌকো আমাদের ঘাটেলাগবে।

বাড়ি আসতেই বৃষ্টি নামলো। সে কি ঝঝম বৃষ্টি! দুটি ঘণ্টা ধরে একঘেয়েঅবিরাম ভন্না বৃষ্টি! 'ভন্না' মানে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি। হরিবোলার ছেলে নীলু এলএকটা পাকা তাল নিয়ে। বেশ সুন্দর তালটা। হাবু বসে 'ঊর্মিমুখর' পড়তে লাগলো।নীলু পড়তে লাগলো 'পথের পাঁচালী।'

আজ ওবেলা কলকাতায় যেতুম ১১টার ট্রেনে, কিন্তু যে বৃষ্টি! তাছাড়া গুরুদাস ঘোষের ছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। সে বিশেষ করে ধরেচে, নাগেলে চলবে না।

কল্যাণী চিঁড়ে দই আমসত্ত্ব দিয়ে কলা দিয়ে ফলার মেখে নিয়ে এল। এর যাআস্বাদ, কলকাতায় এ রকম পাওয়া যাবে না। ঘরের পাতা দইও নেই সেখানে।টাটকা চিঁড়েও পাওয়া যায় না সেখানে। এখানে গোলার ধানের চিঁড়ে, যত ইচ্ছেখাও।

কাল বিকেলে চারটার সময় উড়ে-আসা নীল মেঘের কোলে কোলে সাদামেঘখণ্ডের দৃশ্য আর তার নিচে মেঘের ছায়ায় কালো গোপালনগরের বাঁওড়ের দৃশ্যআমায় একেবারে মুগ্ধ করেছিল। তারপর কাল রাত্রি থেকে নেমেছে ভীষণ বৃষ্টি।সারারাত ঘুমের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুনেচি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়চে...পড়চে। আজ সকালেওপাড়ার ঘাটে বেড়িয়ে এলাম—মনু রায়ের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। সর্বত্র জল আরজল—খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড় জলে থই থই করচে। ইছামতী কূলে কূলে ভরা, সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল ফুটেচে—ভরপুর বর্ষার দৃশ্য! কতকাল দেখিনি এসব, এইবর্ষণমুখর মেঘান্ধকার প্রভাতে ওপারের জলে-ভেজা নলখাগড়া বন, বন্যেবুড়োর বন, কতকাল দেখিনি বর্ষাপ্রভাতে ভাদ্র মাসের ইছামতীর কূলে কূলে ভরা অপরূপ রূপ!তার বদলে দেখে এসেচি মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ির তেতলা থেকে নিচের রাস্তার একহাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে পাঁউরুটিওয়ালা

ভোরে অদ্ভুত সুর করতে করতে চলেছে। "এক একপয়সার রুটি লেও, দু' দু'পয়সার রুটি লেও—বোম্বাইয়ের রুটি লেও, বোম্বাইয়ের রুটি!" জল ছিটিয়ে বাস চলেচে একহাঁটু জলের মধ্যে, যেন স্টিমার চলেচে জলের মধ্যে দিয়ে। সারি সারি ট্রাম মৌলালির মোড়ে আটকে আছে...কিংবা সারারাত্রি বৃষ্টির দরুন ট্রামবেরোয়নি।...বাবুরা প্রাণের দায়ে আপিসে চলেচেন জুতোজোড়া খবরের কাগজে মুড়েবগলে নিয়ে হাঁটুর কাপড় তুলে...ট্রামে বাসে জানালা বন্ধ, লোকজন বাদুড়ঝোলা হয়েচলেচে, ভেতরে বাইরে অসম্ভব ভিড়। বহুক্ষণ ধরে দেখে দেখে ও দৃশ্য চোখ ক্লান্ত হয়েগিয়েচে...আর ভাল লাগে না ওসব। এমন ভাদ্র মাসের মেঘ-কালো প্রভাত তার ভরা নদীজল ও বৃষ্টিস্নাত সাঁইবাবলার ও মাকাললতার ঝোপ এবং চরের নলখাগড়ার বননিয়ে অক্ষয় হয়ে থাক জীবনে, মির্জাপুর স্ট্রীটের ফিরিওয়ালা জলে ভিজে যত খুশি 'বোম্বাইয়ের রুটি' বিক্রি করুক গে।

ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষণমুখর ভাদ্রেরপ্রভাত। ৭টা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতায় লেখা দেখতে পাচ্ছি নে আধঅন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারিতে আমি সেই নকছেদী ভকতেরদেওয়া বেলফুলের ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখতাম, মুহুরিগোষ্ঠবাবু বসে হিসেব বোঝাতো, উত্তর বিহারের বন্যার জলে-ডোবা মকাইয়ের ক্ষেত আর কাশবন—সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের নীল দৃশ্য, সেইদিগন্তলীন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনেজাগে। সে হোল আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারোবছর—কত কাল!

কিন্তু এ দিনের আর একটি অদ্ভুত স্মৃতি জড়ানো আছে জীবনে। ১২ই ভাদ্রসেবার ছিল জন্মাষ্টমী, মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই আকুল আগ্রহে সন্ধ্যা পর্যন্তঅপেক্ষা, সেই মাটির প্রদীপ হাতে একটি কিশোরীর ছবি খড়ের ঘরের দাওয়ায়? নাঃএসব কথা মনের গভীর গহনে সুগোপনেই থাকুক, এখানে লিখবো না কিছু।

শুধু সেই অপূর্ব দিনটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকার এই ক'টি কথা লিখে রাখলাম।

পুরীতে যে মেয়েটি এই খাতাখানি আমায় দিয়েছিল আজ ঘন সারেন্ডা অরণ্যেরমধ্যে বসে তার সে খাতাটিতে লিখচি। আজ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল। বেশশীত, থলকোবাদ বনবিভাগের বাংলোতে বসে আছি, আগুন জ্বলছে ঘরে। আজ সকালেমোটরে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে নুরাগাঁও গিয়েছিলাম। পথে পড়লো জাটিসিরিং বলে একটাঅপূর্ব সুন্দর জায়গা, কোইনা নদীর গর্ভে। তিন বৎসর আগে জ্যোৎস্নারাত্রে এখানেএসেছিলুম, এমনি শীতের দিনে, রাত ১০টার পরে। এখানে বসে কিছু লিখেছিলুম মনেআছে। চারিদিকে ঘন অরণ্যভূমি, সামনে কেউন্‌ঝর স্টেটের পাহাড় ও বন, পেছনেবোনাইগড়ের বন, প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী ঘন অরণ্য ঘিরে রেখেচে আমাদের।

বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছি। মনোহরপুরের পাহাড়ের ওপর যে সুন্দর বাংলোটি আছে বনবিভাগের, সেখানে ছিলাম দুদিন। তারপর এলুম এখানে। নির্জন বনপথে সেবার যেখানে বনমুরগি দেখেছিলাম, এবারও সেখানে সন্ধ্যার আগে বনমুরগি দেখা গেল। বাড়ির পাশে চরে বেড়াচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে উড়ে গেল।থলকোবাদ আসবার কিছু আগে বন্য ময়ূর দেখলাম, রাস্তার এ পারের বন থেকেওপারের বনে ঢুকলো। আবার সেই থলকোবাদ বাংলো! সেই অরণ্যের সুগন্ধ, সেইনির্জনতা!

কাল বাবুডেরা ও বলিবা থেকে ফিরবার পথে এই নির্জনতা আমার বুকে এতবেশি যেন একটা গুরুভারের মত চেপে ধরছিল। শুধুই গাছ আর বন, আর লতা আর পাথর, আর পাহাড়। লোক নেই, জন নেই, লোকালয় নেই। আমি এখানে কতদিনএকা থাকতে পারি? যদি ধরো বাবুডেরার পথে সেই পাহাড়টার ওপরকার তৃণভূমিতে, যেখানে মাদুর পেতে বসে আমি আর সিন্‌হা দু'ঘণ্টা গল্প করলুম ও লিখলুম—সেখানেআমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুদিন থাকতে হয়, একটিও মানুষের মুখ না দেখে, একজনের সঙ্গেও একটি কথা না বলে? শুধু অন্ধকার বা আধজ্যোৎস্না রাত্রে মাথারওপরকার আকাশে দেখবো পরিচিত কালপুরুষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্রমণ্ডল, তাদের চারি পাশে ছড়িয়ে আছে অগণ্য তারা, আর নিচে আমার সামনে, পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্যের সীমারেখা, ক্বচিৎ বা শুনবো বন্য হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি, বন্য কুকুরের ডাক, কখনও বা কোৎরার (barking deer) বিকট চিৎকার।

ওপরে বিরাট নীচেও বিরাট। ওপরে, নীচে, তোমার চারিপাশে বিরাটের গম্ভীরমূর্তি থম্ থম্ করছে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে এ সময়ে ফুটেচে বনধুঁধুলের হল্‌দে ফুল, ছোট এড়াঞ্চির সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল—সেগুলো মিষ্টি, চমৎকার লিরিক কবিতা। মনকে মুগ্ধ করে, আনন্দ দেয়। এখানে প্রকৃতি এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীরঅরণ্যাবৃত শৈলশিখরে, লৌহপ্রস্তর দিয়ে বাঁধানো নদীকূলে, তারাভরা বিশাল আকাশপটে, বন্যজন্তু-অধ্যুষিত আরণ্য অন্ধকারে। সে

গম্ভীর এপিক কাব্য সকলের জন্যে নয়—কাল রাত দুটোর সময় বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালার দিকে তাকিয়ে দেখেছি—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায়না—মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়। বিরাটের উপাসনা সকলের জন্যেনয়, বাংলার পল্লীপ্রকৃতি যেখানে ঠুংরি এখানে তা চৌতালের ধ্রুপদ—সকলের জন্যেনয় এ সব।

ওই বন ওদিকে পাথর বাৎনী, জেরাইকেলা থেকে আরম্ভ করে এদিকে ঝিনডুং, লোরো কোদালিবাদ, ধরমপকা পর্যন্ত বিস্তৃত। কি ঘন বন, কত মোটা মোটা শাল গাছকোথায় কোন্ শূন্যে উঠেচে—কলের চিমনির মত। ১৫০/২০০ বছরের প্রাচীনবনস্পতি। এসব অঞ্চলে যখন সভ্য মানুষ পদার্পণ করেনি, রেল হয়নি, মোটর ছিল না, পথঘাট তৈরি হয়নি—তখন এই সব বনস্পতি ঘন বনের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে রঙ্গনাগাঢ়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদরলা। আমার মায়ের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিনটিতে এই গাছ এত বড়ই ছিল। এই সব ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ পাই, থলকোবাদ গ্রামের পাশে বোনাইগড় আর রঙ্গনাগাঢ়ার পথের ধারে যে শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদবেড়ার সেই গাড়োয়ান ক'টি ভাত আর কচু দিয়ে কলাইয়ের ডাল রেঁধেখাচ্ছিল।—-দণ্ডের পর দণ্ড আমি ওই গাছটির দিকে চেয়ে এই রকম চিন্তায় মশগুল হয়েআপনহারা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

ইসমাইলপুর দ্বিরার খড়ের কাছারিঘর থেকে বার হয়ে এমনি শীতের রাত্রে হঠাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম মনে পড়ে। সেখানেও ছিল সামনে পিছনে নির্জন বনভূমি আরছিল সে কি ভীষণ শীত। হাতের আঙুলগুলো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেত—এতকাল পরেআবার এই ক'দিন সেই হারানো অনুভূতিগুলো ফিরিয়ে পাই রোজ রাত্রে। সেই নির্জন, অন্ধকার আরণ্য-ভূমি, সেই ভীষণ শীত, সেই সীমাহীন বিরাটের মুখোমুখি হাওয়া, সেইস্তব্ধ ও মৌন বিস্ময়-ভরা আনন্দ! জয় হোক সে বিশ্বদেবতার যিনি আমাকে আবারএখানে এনেচেন!

ক'দিন থেকে বন্যহস্তীর উপদ্রবে এখানকার আরাকুসি অর্থাৎ কাঠচেরাইয়েরকুলিরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েচে। কাল সন্ধ্যায় বনতুলসীর শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়েপাহাড়ের ওপরের একটা ঝর্ণা পার হয়ে বোনাইগড়ের পথে এদের কাছে গিয়েছিলাম।একটা বিশাল শাল গাছের তলায় এরা বসে ডাল রান্না করছিল ঘড়িতে। ভাত আগেইরান্না হয়ে গিয়েছিল। চারিধারে নির্জন জঙ্গল। ভীষণ শীত।

জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম? কোথা থেকে আসচো?

ওরা বাংলা বোঝে না। হো ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ মিলিয়ে এদের কথ্য ভাষা। যা বল্লে, তার মানে এই যে তারা গাড়োয়ান, কাঠ বইবার জন্যে যদি গাড়িরদরকার হয়, সেজন্যে জঙ্গলে কাজ খুঁজতে এসেচে।

সঙ্গে ওদের দেখলুম শুধু একখানা করে খেজুর পাতার বোনা চেটাই, একখানাপাতলা রেজাই, একটা হাঁড়ি আর একটা ঘটি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় শোবে রাত্রে?

—এইখানে। গাছতলায়।

—হাতির ভয় আছে এখানে জানো? কাল রাত্রে আরাকুসিদের বড় বিব্রতকরেচে।

—আগুন আছে বাবু।

—আগুন তো আরাকুসিদেরও ছিল, বুনো হাতি আগুন মানেনি। দাঁত দিয়ে ওবছর একটা লোককে গিথে ফেলেছিল মাটির সঙ্গে। সাবধানে থাকাই ভাল।

—না বাবু, হাতির ভয় করলে আমাদের চলবে না। কোথায় যাবো বাবু?

—এই ভীষণ শীতে শোবে এই গাছতলায়।

—আমরা চিরকালই তাই করি। আগুনের ধারে শুলে শীত লাগবে না।

এরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, না বুনো হাতি, না এই দুর্দান্ত শীত, না এই অন্ধকারে আরণ্যরজনীর নির্জনতা। এই সব বন্য অঞ্চলে এরা মানুষ, আজন্ম যাতায়াত করচে এই বনপথে, বৃক্ষতলে নিশিযাপন এদের দৈনন্দিন অভ্যেস। ওদের ডাল

নামলো। শুধু ডাল আর ভাত শালপাতায় ঢেলে খেতে লাগলো। ডালের মধ্যে সাদা সাদা কি ভাসচে দেখেবল্লাম—ওগুলো কি ডালে?

—পেক্‌চি।

—সেটা কি?

—কান্দা।

—তাই বা কি?

বুঝলাম না জিনিসটা। মনে হোল কোনো জংলী ফলটল হবে। পরে বনবিভাগেরহিন্দিজানা কর্মচারী নিকোডিম হো-কে জিজ্ঞেস করতে জানলুম, জিনিসটা হোল বনকচু।

এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতেহবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করেনা, বুনো হাতি মানে না, বাঘ মানে না—যদি দু'টাকা কি দেড় টাকা গাড়ির ভাড়া মেলে, তবুও খায় বনকচু সিদ্ধ আর ভাত।

গাছের মাথায় সন্ধ্যা নামলো ফিরবার পথে। একফালি চাঁদ উঠেছে শালগাছের মাথায়। বনতুলসীর জঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসচে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিকটে পাহাড়ি উমুরিয়া নালার মর্মর শব্দ। বোনাইগড়ের পথ ঘন বাঁকে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠচে। বোধ হয় ওখানেও আরাকুসি বা গাড়োয়ানেরা রাত্রিযাপন করছে।এ পথের ধারে গাছের তলায় তলায় কত লোক আগুন জ্বেলেচে, রান্না করচে। এরাসবাই জেরাইকেলা কিংবা বিসবা থেকে কাজ খুঁজতে এসেচে। কারণ এই জঙ্গলেরমধ্যে এই গ্রামেই দুটি কাঠ ব্যবসায়ীদের আড্ডা আছে। কাঠ কেটে ও চেরাই করে২৫/২৬ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনে পাঠাবার জন্যে 'আরাকুসি' দরকার, কুলি দরকার, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান দরকার। তাই এখানে এত লোক আসে।

ওরাই আসবার সময় বলেছিল, রোজ রাত্রে হাতিতে তাদের বড় জ্বালাতন করে। হাতির উপদ্রবে ওরা পালিয়ে ফরেস্ট বাংলোর কম্পাউন্ডে আশ্রয় নিয়েছিল পরশুরাত্রে।

গ্রামের লোকে বলেছিল হাতির উপদ্রবে গাছের কলা থাকে না, ক্ষেতের কোনো ফসল থাকে না। সব খেয়ে যাবে। উঁচু মাচা করে তাই ওরা সারা রাত ফসলের ক্ষেতেচৌকি দেয়। শীতকালে এখন ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কাটা হয়ে গিয়েছে, আছে কেবল কুরথি। যেখানেই পাহাড়ের তলায় কুরথি ক্ষেত, সেখানেই উঁচু কোনো গাছের ওপরে মাচা বাঁধা। রাত্রে ফসল পাহারা দিতে হবে।

থলকোবাদ বাংলো পেছনে যে ছোট পাহাড়ি বন আর উঁচু রাঙা মাটির ডাঙাতাতে শীতের দিনে একরকম ঘাস হয়েচে, খুব নরম, সরু সরু সাবাই ঘাসের মত। এই ঘাসের মাঝে মাঝে শুকিয়ে গিয়ে সোনালি রং ধরেচে।

আজ দুপুরের পর বাংলো থেকে বার হয়ে এই নির্জন পাহাড়ে উঠে ঘাসের উপর একা বসলুম। আমার পেছনের ঢালুতে আসান, অর্জুন, ধ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী গাছের বন। ওদিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেচে। কি যে অনুভূতি হয়, এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে। শুকনো ঘাসের ভরপুরগন্ধ। সোনালি রোদ। কত কি পাখির ডাক। কান পেতে শোনা যাবে পাহাড়ের বনে বনেএদিকে ওদিকে কত অজানা পাখির ডাক। বাংলা দেশের পরিচিত পাখি এরা নয়। আমি এদেশের পাখির সুর চিনি না। কেবল চিনি বনটিয়া আর ধনেশ পাখির ডাক।পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনো পাখিদের সংগীত এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শুধু মনকে বিরাটের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কথাই এখানে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে। ধ্যানস্তিমিতনেত্র সেই মহান শিল্পীকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচীন ভারতের কোন অরণ্যের অভ্যন্তরে।এমনি নির্জন দুপুরে।

একটু পরে মোটরে গেলুম বেড়াতে থলকোবাদ বাংলো থেকে চার মাইল দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোটরের রাস্তা থেকে কিছুদূরে সেই ঝর্ণাটা। মস্তবড় শিলাস্তৃত চাতাল সেখানে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি ওপরের নরম রাঙা মাটি কেটে shale ও greisen পাথরের এই চালা তৈরি করেছে। কত লক্ষ বৎসরধরে এই ঝর্ণা চলচে এখান দিয়ে। সময়ের বিরাট ব্যাপ্তির কথা ভাবলে আমরা ক্ষুদ্র মানুষআমাদের মাথা ঘুরে যায়।

সামনে সেই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল করে পাথরের ওপর দিয়ে বইচে। আমি ঘন বনের মধ্যে মোটা লতা দোলানো একটা বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে আর একটামস্ত বড় মসৃণ পাথর ঠেস দিয়ে লিখচি। সেই সব পাখির ডাক। এ জায়গাটা বড় ঘনবনের মধ্যে। একে তো এই সারেন্ডা অরণ্যই নির্জন ও বহু বন্যজন্তু-অধ্যুষিত। তাতেএ জায়গাটা আবার থলকোবাদ থেকে চার মাইল দূরে বনের মধ্যে। বাঘ ও হাতির ভয় এখানে খুব। মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে পেছন দিকে চাইচি, শুকনো পাতার ওপর খস্খস্ শব্দ হোলেই। মিঃ সিন্‌হা অদূরে আর একটা গাছের তলায় বসে আছেন।

এসব স্থানে বসে শুধু বিরাটের চিন্তা মনে আসে। লক্ষ বৎসর এখানে মাপকাঠি।বিরাট আকাশ, অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য, মহাকালের অনন্ত পথযাত্রা...মনের মধ্যে যে সুর বেজে ওঠে, পৃথিবীর ভাষায় সে সুর বোঝানো যায় না, সে অনুভূতি অমরত্বের আস্বাদবহন করে আনে, তুলনা নেই সে ecstasy-র—

আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোনো অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন ‘রচনানুপত্তেশ্চ নানুমানম্’—বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোনো বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয়হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার।মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানে পতনে, চাঁদের আলোয় তরুণীর নির্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহেরগানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন, পুনরুত্থানেতিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অত বড় মহাকাব্যপাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দু-একটা সর্গের এক-আধ পঙক্তি কেউহয়তো পড়ে, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না।

আকাশে গোধূলি নেমেছে। রাঙা গোধূলি। বনের মধ্যে দিয়ে আমার এই বটতলারশিলাসনে ওর আলো এসে পড়েছে। জলের মর্মর কলতান যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেচোখে। শীতও নেমেচে খুব।

বিজয় ড্রাইভার এসে বলচে—যাবেন না বাবু?

বুনোহাতি কিংবা বাঘ আর একটু পরে জলপান করতে আসবে এই ঝরণায়।যাওয়াই ভাল।

বাংলোয় ফিরলুম অন্ধকার গিরি-বনপথ ধরে। আশপাশের অন্ধকার জঙ্গলেরদিকে চাইলে প্রাণে ভয় আসে। এ এক অন্য জগৎ।

বাংলোয় ফিরে পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউন্ডে বসে আছি। আমার সামনেঅনেক নীচে উপত্যকাভূমি, তার ওপারে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বনাবৃত শৈলমালা। বাঁ দিকেকম্পাউন্ডের বড় তুন গাছের মাথায় অষ্টমীর চাঁদ উঠেচে—দূরের অন্ধকার শৈলমালারওপরে একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করচে। সেদিকে চেয়ে মন আমার কোথায় কতদূরে চলে গেল। ওই তারার চারিপাশে কি আমাদের মত গ্রহরাজি কিছু আছে—সেখানে বাস করেআমাদের মত জীবকুল? এই রকম বনানীর সৌন্দর্য কি ওদের মধ্যে আছে? আমাদেরমত সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহের লিপি কি ওখানেও লেখা?

সেকথা জানি না জানি—এই কথাটা জানি যে বিরাটের আসন ওখানেও পাতা। তাঁর মহাকাব্যের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে ওদেরও স্থান রয়েচে।

Out beyond the shining of the furthest star

Thou art ever stretching infinitely far,

Yet the hearts of children hold, what worlds cannot,

And the God of glory loves the lowly spot.

আমাদের গ্রামের ইছামতী নদীর ধারে বল্লার ভাঙনে সেই হলদে তিৎপল্লা ফুলেরমধ্যেও তিনি, বনসিমতলার মাঠের সেই মাকাল লতার ঝোপে পাকা টুকটুকে মাকালফলের মধ্যেও তিনি।...

অনেক রাত্রে চাঁদ ফুটফুটে আলো দিচ্চে।

আবার পাহাড়ের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। দূরের সেই পাহাড়শ্রেণী, তারমাথার ওপরকার আকাশে অগণ্য তারা। কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালবেসেএখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়ে। কিন্তু আমিতোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লা ফুলের ঝোপই ভাল। বনসিমতলা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভাল। তোমার এ রূপ দেখে আমিভয় পাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচলতা বেয়েউঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আগা থেকে নেমে এসেচে বড়-গোয়ালেলতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতা পাতা চারা গাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতাশূন্য ভূমিদেখেছি—এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো করলা, বড় গোয়ালে লতা, করমচা লতা, বুনো সূর্যমণি ফুলের চারা, জামের চারা, তরমুজের চারা, আরও কত কত জানা অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ ক'দিন খুব গরম, খর সূর্য উঠেছে মেঘলেশশূন্য নীলআকাশে, দিগ্‌দিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে যায়, অপরাহ্ণে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে পথে, বনজুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডালদুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালোজলে ঢেউ উঠে পানকলস শ্যাওলার কুঁচো সাদা ফুলের সারিকে নাড়িয়ে দেয় ডাঙারদিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদপাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্ধত চারাগাছের মাথায়। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নলখাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়াগহন প্রাচীন আমবাগানেঢুকে দেখছি বনের কোন্ কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এইনির্জনে।

আমি অবিশ্যি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমারকমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতেপাচ্ছিনে ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়েচে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুলফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালিফুলের ঝড়ে ঝড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গাটুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুল্লো, কি সুন্দর গোধূলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল!

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো তিৎপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে দুপুর বেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হলো মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যার অন্তনিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমারাগ্র বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলারপল্লীপ্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক পুন্নাগও চম্পক, বর্ষা-সাথী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্বাচলের সবিতা, তোমারজবাকুসুম-সঙ্কাশ রশ্মি বিকিরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশ লাভ করেনি। কিপুণ্য করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙ্গুলী বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিলইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী?

ভাল করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জ্বলে, তারমধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরি আব্রহ্মস্তম্বএই জগৎ, এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ কেন শায়িত এইআমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে

মুখদেখে তক্ষনি ভালবাসতে ইচ্ছা করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বাওঁকে জানে ভালবাসে ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতেরমধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমির ফুলে ভর্তি একটা লতা উঠেছে ষাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুকটুকে মাকালফলঝুলচে, লেজ-ঝোলা হলদে পাখি বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদরকরে না, তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হবে তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠচে আমার রোয়াকের ঠেস্-দেওয়ালের পাশের নারিকেলগাছটা বেয়ে। আমার বাড়ির ওদিকটাতে ঘন বনঝোপ। আগে যুগল কাকার ভিটে ছিলওখানটাতে, ছেলেবেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অঙ্ক কষতাম, কিন্তু তিনি মারাযাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বাস করচে, এখন সেখানেঘন ছোট এড়াঞ্চি, গোয়ালে লতা, সোঁদালি, গাঁধালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশেরজঙ্গল।

আমি ঠেস্ দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোলগাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠেচে। ভাল করে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারাজানে না তারা বলে তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফুলেরগড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকেল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ চেয়ে দেখি। ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এ সবঅঞ্চলের দুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্যে পরেছি। ফুলেরসময়টাতে রঙ-বেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোলগুঁড়িছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে সাদা সাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ-সঞ্চরণ। এরা বনান্তস্থলীএকটি অপূর্ব সৌন্দর্য মুখরিত করে রাখে সারা সকালবেলাটা। আমি লেখা ছেড়ে মাঝেমাঝে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলেপরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটাদুর্গাটুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘমেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যেদেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহা আনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কিঅপূর্ব আনন্দই বা সেটুকু পুঁচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরেরদিকের লতাগ্রভাগে কত সাদা কুচো কচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কচি ফলেরজালি।

ওর পিছনে বিশাল, প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকারহয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেছে—জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই তিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস দেওয়ালে বসে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক-একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ওই ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। ও সামান্য বনলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় এক মনে ওরদিকে চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পৌঁছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুলফোটাতে, ওর ফল পাকাতে! সূর্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতেহয়েচে ওর জন্যে, কত কি গ্যাস, কত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েছে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচেওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লালটুকটুক করচে।

ক্ষর-ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেচে ওই বন্য লতা লোকলোকান্তরেরঅসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

ঘাটশিলা থেকে আমি মনোহরপুর রওনা হই বেলা দুটোর ট্রেনে। গত পুজোরছুটিতে দেশ থেকে ঘাটশিলায় এসেছিলাম বেড়াতে। বন্ধুবর অমর মিত্রের বাসার সামনে মাঠে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে বসে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল থেকে একটি ছেলে বেড়াতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছে।

রাত্রে ছেলেটির সঙ্গে কথা হোল, সে এসেচে বন ও পাহাড় দেখতে। কখনওদেখেনি একটা বড় রকমের বন, বড় একটা পাহাড়। সেই রাত্রেই ভাবলাম ওকেসিংভূমের সব চেয়ে বড় বনের অর্থাৎ সারেন্ডা অরণ্যের একটা অংশ দেখিয়ে দেব।

অনেকে হয়তো জানে না, সিংভূমের অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমছোটনাগপুরের মধ্যে দুটি বৃহৎ অরণ্যানী বর্তমান। প্রথমে একথা বলা উচিত, ছোটনাগপুরের ও অংশকে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারিখণ্ড বলা হোত অর্থাৎবনময় দেশ। এখন সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালিদের উপনিবেশ, কলকারখানা (যেমন টাটা, মৌভাণ্ডার) বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনও পূর্ব সিংভূমে আছে, তাওথাকত না, যদি গভর্নমেন্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা হোত। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গণ্ডি দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে ছ'বছরের মধ্যে (গড়পড়তা হিসাবে অবিশ্যি) একটা দশ বর্গমাইল ব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায়মানুষের কুঠারের সামনে।

পূর্ব সিংভূমের মধ্যে কয়েকটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেচে—ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া ও টাটা। শেষেরটির নাম জগৎ-বিখ্যাত। কারখানার জন্যেই এখানেঅন্ন-সংস্থানের উপনিবেশ।

পূর্ব সিংভূমে প্রকৃতির পূজারী-ভক্তেরা বন দেখতে পাবে না বিশেষ, যা দেখতে পাবে তা এমন কিছু নয়।ক্বচিৎ দু-একটি স্থান ছাড়া। এমন একটি স্থান হোল ঘাটশিলার সাত মাইল উত্তরে ধারাগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও আশপাশের পাহাড়বনানী। আর একটি স্থান সুবর্ণরেখার ওপারের তামাপাহাড় ও সানুদেশ। এই সব বনেইঅল্পবিস্তর বন্যহস্তী, নেকড়েবাঘ, ভালুক, ময়ূর ইত্যাদি দেখা যাবে। তবে এদের সংখ্যাএত কম যে পাঁচ বছর বনে বনে বেড়িয়েও আমি এ পর্যন্ত একটা জ্যান্ত জানোয়ারকেআমার দৃষ্টিপথের পথিক করাতে সমর্থ হইনি—দুটি একটি শেয়াল বা কাঠবেড়ালিছাড়া।

তা সত্ত্বেও আমি জানি জানোয়ার এখানে আছে।

আমার দু-একটি শিকারী বন্ধু এ বিষয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। যেমনগালুডির লুনা নার্সারির মোহিনী বিশ্বাস মহাশয়। ইনি ভালক শিকার করতে গিয়েরীতিমত জখম হয়েছিলেন ভালুকের হাতে। বেঁচে গিয়েছিলেন কোনোরকম কিন্তু একখানা হাত অকর্মণ্য হয়েছে চিরকালের জন্য।

এখন বলবো পশ্চিম সিংভূমের কথা।

বন যা আছে, এখনও পশ্চিম সিংভূমেই আছে। এ অঞ্চলের বড় বন দুটি। সারেন্ডা ও কোল্‌হান। দুটিই রিজার্ভ ফরেস্ট। সারেন্ডা অরণ্যানী বৃহত্তর, প্রায় ৪০০ শতবর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বানানী হচ্ছে এই সারেন্ডা। আমি তিন বৎসর আগে একবার এই দুটি দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলুম বনবিভাগের বড় কর্মচারি জে.এন.সিন্‌হার সমভিব্যাহারে তাঁর মোটরে।

সে অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা এমন বিচিত্র সৌন্দর্যের রেখাপাত করেছে আমার মনে যে তিন বৎসরেও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে কতবার ভাবতাম সারেন্ডা বনের নানা বিচিত্র সৌন্দর্যভূমির কথা, নানা জলপ্রপাতের কথা, নানা পাথরের বাঁধানো বন্য নদী ও ঝর্ণার কথা, নানা বনপুষ্পের সুরভিবাহী দক্ষিণা বায়ুর কথা, শিলাতলে বিছিয়ে থাকা বন্যশিউলির কথা, গভীর রাত্রে বন বিভাগের বাংলোঘরে শুয়ে আশপাশের বনে কোথাও বন্যহস্তীর বৃংহিতধ্বনি শুনবার কথা।

তাই ভাবলুম ছেলেটিকে নিয়ে এই সুযোগে আর একবার সারেন্ডা অরণ্য দেখতে বেরুবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

পশ্চিম সিংভূমের এই অরণ্য-অঞ্চল মোটরযোগে ভিন্ন দেখা প্রায় অসম্ভব। চার শত বর্গমাইল ব্যাপী এই বনভূমির কোথায় কি আছে তা সাধারণের জানবার কথাও নয়। সুতরাং বন-বিভাগের কর্মচারিদের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ট্রেন উঠে এ বন দেখবার সুযোগ প্রায় নেই, কেবল একটি উপায় ছাড়া।

সেই উপায়টি অবলম্বন করা গেল।

মনোহরপুরের স্টেশন থেকে একটা লাইট রেলওয়ে চলে গিয়েছে চোদ্দ মাইল দূরে চিড়িয়া পাহাড়ে। এই পাহাড় থেকে ইন্ডিয়ান স্টিল করপোরেশন লৌহপ্রস্তর সংগ্রহ করে বার্নপুরের কারখানায় চালান দেয়। রেল-লাইনটা ওদেরই। এই রেলপথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে প্রায় আট নয় মাইল কিংবা আর একটু বেশি। এইটি সারেন্ডা অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে।

সুতরাং যদি মনোহরপুর থেকে চিড়িয়া খনির রেলে চড়া যায় তাহলে বিনা মোটরে সাত-আট মাইল বন অনায়াসে দেখা যেতে পারে। চিড়িয়া রেললাইন খনিওয়ালাদের নিজেদের তৈরি, যাত্রী-বহনের উদ্দেশে তা তৈরি হয়নি, বাইরের কোনো লোককে উঠতে দেয় না। এজন্যে বনবিভাগের লোকের সাহায্য দরকার।

বেলা তিনটের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা ঘাটশিলা থেকে উঠে সন্ধ্যার সময়ে চক্রধরপুরে গিয়ে নামলুম। এই পর্যন্তই টিকিট করা হয়েছিল। এর পরেই পাহাড় জঙ্গলের বেশ ভাল দৃশ্য রেলপথের দুধারে পড়বে, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে আমরা সে সব কিছুই ভাল করে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে রাত্রিটা চক্রধরপুর স্টেশনে কাটিয়ে পরদিনের ভোরবেলা যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আসে, তাতে ওঠাই যুক্তিযুক্ত। সবটা দিনের আলোয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চক্রধরপুর স্টেশনে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিছানাপত্র বিছিয়ে নিয়ে আমরা সটান্ শুয়ে পড়লাম। আদ্রা প্যাসেঞ্জার এল একটু পরে। কয়েকটি ভদ্রলোক ওই ট্রেনে রাঁচি ও পুরুলিয়া থেকে এলেন। একটি ভদ্রলোকের নাম মিঃ দুবে। রেলপুলিশে কি কাজ করেন। আমার সঙ্গে দু-এক কথায় খুব আলাপ জমে গেল। পথে কি চমৎকার ভাবেই আলাপ জমে। আমি অনেকবার দেখেছি রেলে দূরদেশে বেড়াবার সময় রেলকামরারমধ্যেকার যাত্রীরা পরস্পর আত্মীয় হয়ে গিয়েছে। এ ওকে জলপাত্র দিচ্ছে ব্যবহার করতে, ও একে সিগারেট দিচ্ছে, এ খাওয়াচ্ছে ওকে—ওদের মধ্যে শিখ আছে, পাঞ্জাবী আছে, বিহারি আছে, বাঙালি আছে। একটি সর্বজনীন ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে ওদের মধ্যে, দেড়দিন বা দুদিনের জন্যে। এমন কি বিদায় নেবার সময় কষ্ট হয়, সবাই পরস্পরের ঠিকানা নেয় চিঠি দেবে বলে।

যদিও শেষপর্যন্ত হয়তো চিঠি দেওয়া হয় না।

এখানে মিঃ দুবের সঙ্গে আমার এই ধরনেরই আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমার সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি করে বলবো।

অনেক রাত্রে দেখি মিঃ দুবে আমায় ডাকাডাকি করচেন।

—ঘুমুলেন নাকি?

—না। কি বলুন!

—একটা পথের কথা আপনাকে বলে দিই। যখন আপনি পাহাড় জঙ্গল বেড়াতে ভালবাসেন, রাঁচি থেকে একটি পথ লোহারডগা হয়ে যশপুর স্টেটের মধ্যে দিয়ে সম্বলপুর জেলার ঝাসাগুড়া পর্যন্ত গিয়েছে। এই পথে রাঁচি থেকে মোটর বাস যায় যশপুর স্টেশনের রাজধানী যশপুর নগর পর্যন্ত। সেখান থেকে অন্য এক মোটর বাসে কুঞ্জীগড় হয়ে ঝর্সাগুড়া আসা যাবে। কখনও যাননি এ পথে?

যাওয়া তো দূরের কথা নামই শুনিনি, সন্ধানই জানিনে।

সেই রাতটি আমার বড় মূল্যবান। মিঃ দুবে আমার উপকার করেছিলেন এ পথের সন্ধান আমায় দিয়ে। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত সৌন্দর্যস্থলী বিদ্যমান, কত নিবিড় পর্বতকন্দরের অভ্যন্তরে, কত অরণ্যভূমির নিভৃত অন্তরালে, কত গোপন বন্যনদীর শিলাস্তৃত তটদেশে কে তাদের খবর রাখে! পথের কথা যে বলে দেয়, জীবনের বড় উপকারী বন্ধু সে।

আমি জানি হাওড়া স্টেশন থেকে দুশো মাইলের মধ্যে কত সুন্দর স্থান আছে, সেখানে নিবিড় বন আছে, পাহাড়ি ঝর্ণা আছে, বনলতার সৌন্দর্য আছে, জলজ লিলির ভিড় আছে ছায়াবৃত বন্য নদীতটে। দেখে অনেক সময় নিজেরই অবিশ্বাস হয়েছে কলকাতার এত কাছে এমন সুন্দর স্থান থাকতে পারে!

রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল। আমরা তাতেই উঠে মনোহরপুরের দিকে রওনা হলাম। চক্রধরপুর ছাড়িয়ে তিনটি স্টেশনের পরেই পোসাইতা স্টেশনের কাছে ঘন বন। এখানে একটা টানেল আছে, তাতে ভুলক্রমে রেলওয়ে গাইড বইয়ে বলা হয় 'সারেন্ডা-টানেল'। কিন্তু প্রকৃত সারেন্ডার সঙ্গে এই টানেলের পাহাড় ও বনভূমির

কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি কোলহান বিভাগের অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সারেন্ডা অরণ্য কোনো রেলপথের নিকটে নয়, ট্রেনে বসে এ লাইন থেকে সাধারণত যে বনানী দেখা যায় তা হোল এই কোলহান অরণ্যভূমি, তারও খুব। সামান্য অংশই রেলে চড়ে দেখা সম্ভব। আরও পশ্চিমে গিয়ে যে বন পর্বত দেখা যায়সেগুলা হলো বামড়া, আনন্দগড় ও বোনাইগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। তার পরেই পড়ে সম্বলপুর জেলার রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব-উত্তর অংশ। তার পরে এল বিলাসপুর। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুরের পথে অনেক দূর পর্যন্ত রুক্ষ, ঊষর, সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে দৃশ্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তার পরে আসে দ্রুগ বা দুর্গ। এখান থেকে পুনরায় বন পর্বতের দৃশ্য শুরু হলো, এই পথেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহুবিজ্ঞাপিত সালকেশা অরণ্যভূমি। আমি একবার জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রিতে আর একবার অস্তসূর্যের বিলীয়মান আলোয় এই বন-প্রদেশ দর্শন করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ট্রেনে বসে যে কেউ দুর্গ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যে একটু কষ্ট করে চোখ মেলে চেয়ে থাকবেন, তাঁর কষ্ট সার্থক হবে।

তবে এখানে একটা কথা, সকলে কি সব জিনিস ভালবেসে! যার চোখ যে জন্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে! সে জন্যে দোষ কাউকে দেওয়া যায় না।

বনানী ও পাহাড়পর্বতের দৃশ্য, মুক্ত space-এর দৃশ্য যাঁর ভাল লাগে না—তাঁর সঙ্গে কি এর তা হলে ঝগড়া করতে হবে? তাঁর হয়তো যা ভাল লাগে, আমার তা ভাল লাগে না, সুতরাং তিনিও তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন তা নিয়ে।

মনোহরপুর নামলাম বেলা দশটার সময়।

একটা কুলিকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাকবাংলো কোথায়?

—পাহাড়ের ওপরে। কিন্তু সে ডাকবাংলো নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাংলো।

—সে আমি জনি, তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পারো?

—সোজা পশ্চিম দিকে চলে যান।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে ডানদিকে দেখি বনবিভাগের আপিস। ভাবলাম, চিড়িয়া পাহাড়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো রেল। সে রেলে চড়তে হলে খনিওয়ালাদের অনুমতি দরকার। বনবিভাগের কর্মচারিরা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে আমি আপিসের দিকেই গেলাম। তা ছাড়া বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত তো পাহাড়ের ওপরের বাংলোতেও থাকা যাবে না। আপিসে জিজ্ঞেস করে জানা গেল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত বর্তমানে এখানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি। রাসবিহারীবাবুকে আমি জানতাম খুবই, ১৯৪৩ সালে সারেন্ডা বন পরিভ্রমণের সময়ে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন।

বল্লাম—রাসবিহারীবাবু আছেন?

একজন আরদালী বল্লে—না বাবুজী। তিনি বনের কোনো কাজে বেরিয়ে গিয়েচেন।

—কখন আসবেন?

—ঠিক নেই। দেরি হবে।

আমি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়া লাইট রেলের সাইডিং-এ যাব ভাবচি এমন সময়ে রাসবিহারীবাবুর বাসা থেকে একজন চাকর এসে বল্লে—আপনাকে মাইজিনিয়ে যেতে বলেচেন বাসাতে—

—কোন্ মাইজি?

—রাসবিহারীবাবুর স্ত্রী।

বাসাতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে জানতেন। চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি এখনি চিড়িয়া রেলে যেতে উদ্যত হয়েছি শুনে বল্লেন—এখন কেন যাবেন? সে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। এখান থেকে সাইডিং এক মাইল দূরে। গিয়ে গাড়ি পাবেন না। তার চেয়ে ধীরেসুস্থে স্নান করে বিশ্রাম করুন।

কথা শুনলাম না। আমার বন-ভ্রমণের তৃষ্ণা তখন অত্যন্ত বলবতী। মাইল খানেক ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরাও যেই সাইডিং-এ পৌঁচেছি ট্রেনও ছেড়ে দিল। বাধ্য হয়ে ফিরলাম। এসে দেখি রাসবিহারীবাবু কাজ থেকে ফিরেছেন। আমাকে

দেখে খুব খুশি। দুজনে গল্প করতে করতে স্নান করে এলাম নদীতে। ওঁদের অতিথিপরায়ণতার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিকেলে তিনজনে বেরুলাম বেড়াতে।

রেলপথের ওপারে সুধীরবাবুর বাসা। এসে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাসবিহারীবাবুকে নিয়ে সুধীরবাবুর বাসায় এলাম। তিনিও আমায় দেখে খুব খুশি। বিদেশে বাঙালিদের মধ্যে খুব হৃদ্যতা। আমাদের সন্ধ্যাবেলা চা খেয়ে বল্লেন, রাত্রেও তাঁর ওখানে না খেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন জানিয়ে দিলেন।

সুধীরবাবুর বাসা থেকে আমরা গেলাম নৃসিংহ বাবাজীর আশ্রম দেখতে। এই স্থানটি অতি মনোরম। কোয়েল নদীর পাষাণময় তটের ওপরে একটি শ্যাম কুঞ্জবিতান। কত কি ফুল-ফলের গাছ এখানে যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ফুলের গাছ। বকুল, নাগকেশর, চাঁপা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি পর্যন্ত সব রকমের পুষ্প এখানে দেখা যাবে। ফুলের বাগান বলে মনে হয় না, মনে হয় ছায়ানিবিড় এক বনানী, মধ্যে মধ্যে ঘন বনের বুক চিরে পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পায়ে চলার পথ পরস্পরকে কাটাকাটি করে সুবিন্যস্ত ভাবে সোজা এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। আশ্রমের ফটক ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা পাথরবাঁধানো চত্বরের চারিপাশে কতকগুলো ছোট বড় পাকাবাড়ি। সাধুসন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য বড় বড় ঘর ও বারান্দা। এই ঘর-বাড়ির পেছনে আর কোনো মানুষের বাসের ঘর নেই, ঘন বনানিকুঞ্জের মাঝে মাঝে লতাপাতা ঢাকা ছোট ছোট দেবমন্দির, তার কোনোটায় রামসীতা, কোনোটাতে শ্রীকৃষ্ণ, কোনোটাতে শিবলিঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি নৃসিংহদেবের। বনের মাঝে মাঝে পুষ্পবিতানের আড়ালে পাথরের আসন। বোধ হয় সাধুদের ধ্যানধারণার জন্যে, কিংবা যে কেউ বসে বিশ্রাম বা চিন্তা করতে পারে। সাধুর খুব ভিড় আছে বলে মনে হোল না, বরং মনে হয়েছিল সমস্ত আশ্রমটিতে লোক খুবই কম। এত নির্জন যে বাগানের মধ্যে ঢুকলে ভয় করে, পথ হারিয়ে গেলে কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। সমস্ত আবহাওয়াটি অতি শান্ত ও পবিত্র। একটি সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন একজায়গায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

নৃসিংহদেবের ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মন্দিরে দীপ জ্বলছে। অনেকগুলি হারিকেন লণ্ঠন এখানে ওখানে গাছের গায়ে ঝুলছে। আমার প্রথমেই মনে হলো এত কেরোসিন তেল আসে কোথা থেকে?

সাধুজী বোধ হয় আশ্রমের মোহান্ত।

আমরা সামনে গিয়ে বল্লাম—প্রণাম মহারাজ।

সাধুজী আমাদের আশীর্বাদ করে বসতে বল্লেন। কিছু ধর্মকথা শোনালেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন, কলা আর কচুরি—আর একটা জিনিস এদেশে দেবমন্দিরে ভেট হিসেবে খুবই ব্যবহৃত হয়। এর নাম 'পান্‌জেরি'—জিনিসটা হলো ধনেভাজার গুঁড়ো আর চিনি একসঙ্গে মেশানো।

সুধীরবাবুর বাড়িতে খেয়ে ফিরবার পথে রাসবিহারীবাবু সাইডিং-এ ফোন করলেন স্টেশন থেকে। পরদিন সকালে ট্রেন ছাড়বে, তাতে একটা সেলুন জুড়ে দিতে বলে দিলেন। সকালে গাড়িতে চড়বার সময় 'সেলুন'-এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষুস্থির। একখানা মালগাড়ি, যাকে বলে covered wagon, তবে দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে তার মধ্যে এই যা।

পাঁচ মাইল গিয়েই ছোট গাড়ি নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি বড় ভালবাসি সারেন্ডার এই অপরূপ নির্জনতা। এত বড় বড় শাল ও আসান গাছও সিংভূমের অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মোটা মোটা কাছির মত লতা এ গাছ থেকে ও-গাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় কুরচি ফুলের গাছ। এত বড় কুরচি গাছ আমিতো কোথাও দেখিনি। বন্য শণের বড় বড় হল্‌দে ফুল রেললাইনের দুধারে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে ফুটে আছে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের সারি, হঠাৎ পাহাড়শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে কখন পার্বত্য নদী কোয়েল এসে মিশলো রেললাইনের পাশে। দুই তট শিলাস্তৃত, মাঝে মাঝে সাদা লিলির সঙ্গে মিশেছে হলুদ রং-এর বন্য শনের (wild flax) ফুল, পাহাড়ের বেগুনি রংয়ের দেবকাঞ্চন।

আমাদের গাড়ি এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গেল। স্থানটি বড় বড় বনপাদপে ছায়ানিবিড়।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, আসুন বনের মধ্যে।

—কোথায়?

—আপনাকে আমাদের শিমুল গাছের নার্সারি দেখিয়ে আনি।

—গাড়ি কতক্ষণ থাকবে?

—সে ভয় নেই। যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি।

অনেকদূর চললাম বনের মধ্যে। এক জায়গায় অনেকগুলো শিমুলের চারা সারদিয়ে পোঁতা। বনবিভাগ থেকে এখানে শিমুল গাছের আবাদ করা হয়েছে তাই একে বলা হয় শিমুল চারার নার্সারি। এখান থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপন করা হবে। রাসবিহারীবাবু আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। শিমুলগাছ নাকি বেশ দামে বিক্রি হয় দেশলাই-এর কারখানার মালিকদের কাছে।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, সাবধানে থাকবেন, বড় বড় বাঘ আছ সারেন্ডা ফরেস্টে।

—দিনমানে বেরোবে?

—সব সময়ে বেরুতে পারে।

—লেপার্ড না 'দি রয়েল বেঙ্গল'?

—রয়েল বেঙ্গলই বটে।

—আপনি কখনও বাঘের হাতে পড়েছেন?

—দশবার পড়েও বেঁচেও গিয়েছি। চলুন সে গল্প আংকুয়া বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে করা যাবে।

গাড়ি আবার ছাড়লো। আবার চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

বন যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। কোনো লোকালয় নেই। বনের মধ্যেই ছোট্ট একটা স্টেশন। তার নাম লোরো জংশন। এখান থেকে ঘনতর বনের মধ্যে একটা লাইন বেঁকে পূর্বদিকে অদৃশ্য রহস্যপথে অন্তর্হিত হোল, না জানি ওদিকে আবার কত বন, কত ঝর্ণা, কত বিচিত্র লতার দুলুনি, কত সৌন্দর্যময়ী বনস্থলী। মন যেন নেচে ওঠে, চোখ পিপাসিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে থাকে।

—ও লাইনটি কোথা গেল?

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, দুধিয়া মাইন্‌স্। ছেইয়া।

—সে কতদূর?

—তা এখান থেকে ন'মাইল।

—ওপথে যাওয়ার উপায় কি?

—হেঁটে বা ট্রলিতে যাবেন?

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব্যবস্থা করবেন?

—যখন বলবেন, করে দেবো।

বেলা ন'টার সময় ট্রেন চিড়িয়াতে পৌঁছলো। রেল লাইনের বাঁদিকে ৩০০০ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় বুদ্ধবুরু ও অজিতবুরু। বুদ্ধদেবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এদের, এদেশী ভাষার নাম। পাহাড়ের ওপর থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে নামানো হচ্চে, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচু পর্যন্ত ট্রলি লাইন আছে। ছোট লাইনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশপাশের ছোটখাটো পাহাড়ের ওপর খনির ম্যানেজার, ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাংলো। একজন বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই খনির ডাক্তার, নাম ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, প্রথম আলাপেই আত্মীয়তা প্রদর্শন করে তাঁর বাংলোতে সেদিন আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের সময় কম ছিল বলেইতাঁর এ সমুদয় প্রস্তাবে আমরা রাজি হতে পারিনি।

বনপথে হেঁটে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি বনগ্রাম পার হয়ে আমরা আংকুয়া ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছলাম।

কি সুন্দর এই আংকুয়া বাংলোটি, কি মনোরম এর পরিবেশ।

একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এই বাংলো, পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করে বইচে একটি পাহাড়ি নদী, বাংলোর সামনে পাহাড়ের মাথায় সমতলভূমিতে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। ছোট টেবিল সামনে পেতে চা দিয়ে গেল বাংলার চৌকিদার। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। অমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার অভিনবত্ব আমি ভালভাবে উপভোগ করবো বলে অদূরবর্তী গম্ভীর বনভূমির দিকে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। কত রকমের গাছ চারিদিকে—অর্জুন, আসান, শাল, ধও, পিয়াসাল। বাতাসে বনভূমির স্নিগ্ধ গন্ধ।

ডাকবাংলোর চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলটল এনে দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারি স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, সুতরাং শাড়ি-ব্লাউজ পরে। সামান্য একটু ইংরিজিও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে, অনেকেই রাঁচি মিশনারি স্কুলের ফেরত।

আংকুয়া বাংলো থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এমন চমৎকার কানন-ভূমিতে এমন বাংলোতে বাস করা একটি বিশেষ সৌভাগ্য। তবে অরণ্যকে ভালবাসলে কেউ এখানে বাস করতে পারবে না। বাংলোর চৌকিদারকে বল্লাম—রাত্রে এখানে বাঘ আসে?

—রোজই হুজুর।

—হাতি?

—ওভি। ভালুক ভি বহুৎ আসে।

—তোমরা থাকো কি করে?

—কাঁড় নিয়ে বসে থাকি হুজুর। আগুন করি।

এই তো অবস্থা। যত বড় প্রকৃতির রসিকই হোক না কেন, এ নির্জন অরণ্যভূমিতে কিছুদিন বাস করতে হোলে নিছক প্রকৃতিরসিকতা ছাড়াও আর কিছু থাকা দরকার। সেটা হোল নির্ভীকতা, নির্জনবাসের শক্তি, নিত্য নূতন বিলাসের লোভ-সম্বরণ। জীবন হবে এখানে সব রকম উপকরণের বাহুল্য বর্জিত, austere, অন্তর্মুখী। তবে এখানে আনন্দ, নতুবা একদিনের মধ্যেই পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

ফিরবার পথে চিড়িয়া থেকে ট্রেন পেলাম না। খনির লোকেরা আমাদের জন্যে ট্রলি করে দিলেন, চোদ্দ-পনেরো মাইল পথ বিকেলের ঘন ছায়ায় দুধারের বনভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রলি করে আসার সে কি আনন্দ! এই আসার পথে একটা অভিজ্ঞতাহয়েছিল যা ভুলবার নয়। সারাপথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধ ভুরভুর করচে। বাড়িয়ে এতটুকু বলচি না। ট্রলির একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কানে আতরমাখা তুলো গুঁজেছে? সে তো অবাক। রাসবিহারীবাবুকে বল্লাম, তিনি কোন্ তেল মেখেচেন? রাসবিহারীবাবু বল্লেন, গন্ধটা তেল বা আতরের নয়, নানা বনকুসুমের সম্মিলিত সুবাস।

—কি ফুলের?

ট্রলি থামিয়ে থামিয়ে আমরা রেল লাইনের কাছাকাছি যত রকমের ফুল ফুটেছিল, সব তুলিয়ে আনিয়ে দেখলাম। ও-সব কেন ফুলেরই সুবাস নয়। দেবকাঞ্চন গন্ধহীন, বন্য শনের ফুল গন্ধহীন, অর্কিডের দু-একটা ফুল, যা চোখে পড়লো গন্ধহীন। তবে কোন্ ফুলের গন্ধ?শালের ফুল এখন ফোটে না। কুরচি ফুলও তাই।

অথচ গোটা চোদ্দটা মাইল পথ সে সুবাসে আমোদ করতে লাগলো। ঘন, মিষ্ট, তীব্র সুবাস।

রাসবিহারীবাবু এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বন ছেড়ে আমাদের ট্রলি যখন মুক্ত প্রান্তরে বের হলো, তখন দূরদিগন্তে বোনাইগড় রাজ্যের শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

বনে - পাহাড়ে

সিংভূম জেলার বন-জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণী ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব। বেঙ্গল নাগপুর-রেলপথ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে যাবার কোনো সহজ উপায় ছিল না, কেউ যেতোও না সে সময়ে—যা একটু আধটু যেতো—এবং যে ভাবে

যেতো—তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়ে। সিংভূম জেলার ভেতরকার পাহাড়-জঙ্গলের কথা ছেড়ে দিই—বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থান জনহীন অরণ্যসঙ্কুল থাকার দরুন 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বনময় দেশ বলে অভিহিত হোত। লোকে প্রাণ হাতে করে যেতো ঐ সব বনের দেশে। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না—যেতেই হোত।

ওই দেশের মধ্যে দিয়ে ছিল পুরী যাওয়ার রাস্তা। মেদিনীপুর জেলার বর্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যে দিয়ে এই পুরোনো পথ এখনও বর্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এই পথে একদিন পুরী গিয়েছিলেন। কত লোকে যেতো সেকালে। সাধু ঈশ্বরপুরী একা এই পথে পুরী রওনা হন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ির সামনে দিয়ে এই পথ আজও আছে, আজকাল জেলাবোর্ডের রাস্তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ি থেকে পাঁচ মাইল কিংবা তার কিছু বেশি গেলেই বম্বে রোডের সঙ্গে এই রাস্তা মিশে গিয়েছে এবং তারপর সোজা চলেছে উড়িষ্যার দিকে, ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাকে কেন যে বম্বে রোড বলা হয় তা জানি নে—কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক চর্মচক্ষে আবিষ্কার করা যায় না।তবে যদি কেউ বলে, এ রাস্তা দিয়ে কি মশাই তবে বম্বে যাওয়া যায় না? আমায় বলতে হবে—বিশেষ করে বম্বে যাবার জন্যে এ রাস্তা নয়। ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে এ রাস্তা সোজা চলে গেল সমুদ্রতীরের দিকে। তবে এ রাস্তা থেকে অন্য একটা রাস্তা বেরিয়েছে ময়ূরভঞ্জের বাঙ্গিপোস নামক জায়গায়। সে রাস্তায় বেঁকে গেলে কি হয় বলা যায় না—হয়তো বম্বে যাওয়া যেতে পারে, সে রকম দেখতে গেলে তো যে কোনো রাস্তা দিয়েই বম্বে যাওয়া যায়। যে কোনো জেলার যে কোনো রাস্তাকে তবে বম্বে রোডকেন বলা হবে না?

চিরকাল পথে পথে বেরিয়ে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে খারাপ। পথ যেন ডাকে, হাতছানি দেয়।

সেদিন ছিল অষ্টমী তিথি।

সন্ধ্যার পরেই কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। ঝাড়গ্রামে আমার এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়ে দিন দুই আছি—হঠাৎ ইচ্ছে হলো এমন জ্যোৎস্নায় একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

জায়গাটা রাজবাড়ির পাশে—পুরোনো ঝাড়গ্রাম। স্টেশনের কাছে হয়েছে নতুনকলোনি, কলকাতার অনেক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন সেখানে, কিন্তু পুরোনো ঝাড়গ্রামের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। এখানে পুরোনো দিনের রাজাদের গড়খাই ও দুর্গপ্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়, আর আছে শালবন, আগাছার জঙ্গল, পুরোনো দেউল, দীঘি। দিব্যি রোম্যান্টিক পরিবেশ। পুরোনো দীঘির ধারে হাট বসে, তার আগে সাবিত্রী-মন্দির।

সাবিত্রী-মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল গ্রামের বাইরে মাঠ ও বনের দিকে। একাই চলেছি, শালবনের কচি পাতা গজিয়েছে, কুসুম-গাছের রঙিন কচি পাতার সম্ভারদূর থেকে ফুল বলে ভুল হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথ শালবনের মধ্যেদিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়েছে—সুঁড়ি পথের দু ধারে শালবন।

একাই চলেছি। এ পথে কখনও আসি নি, কোথায় কি আছে জানি নে। ভালুক বেরুবে না তো? শুকনো শালপাতার ওপরে খসখস শব্দ হোলেই ভাবছি এইবার বোধ হয় ভালুকের দর্শনলাভ ঘটলো। আরও এগিয়ে চলেছি—একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী ঝির্‌ঝির্ করে বয়ে চলেছে পথের ওপর দিয়ে। হাঁটুখানেক জল, এমনি পার হয়ে ওপারের পাড়ে উঠলাম—উঁচু কাঁকর-মাটির পাড়।

শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেছি। জ্যোৎস্নাস্নাত উদার বন-প্রান্তর আমার সামনে। ফিরবার ইচ্ছা নেই। আরও খানিক গিয়ে শালবন পাতলা হয়ে এল—মাঠের মধ্যে দূরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে গেলাম। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, ফাঁকা মাঠের মধ্যে—একটু দূরে একটা গ্রাম আছে বলে মনে হোল। ঘরখানার চারিদিকে বাঁশ-কঞ্চির বেড়া, আমার স্বর শুনে গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী ঘর থেকে বার হয়ে এসে বললেন—কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, ঝাড়গ্রাম থেকে। এটা কি আপনার আশ্রম?

—হ্যাঁ, আসুন বসুন।

সন্ন্যাসী একখানা দড়ির খাটিয়া ঘরের সামনে মাঠে জ্যোৎস্নায় পেতে দিলেন। বেশ চমৎকার লাগছিল আমার, একদিকে অস্পষ্ট বনরেখা, অন্য দিকে ধু ধু করছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর। শহরের পথ চিনে ফিরতে পারবো কি না এই রাত্রে, তাই-বা কে জানে? পায়ে-চলা সরু আঁকাবাঁকা মাটির পথের সন্ধান যদি না-ই মেলে ফেরবার মুখে?

সন্ন্যাসী বললেন—রাতে বেরিয়েছেন একা?

—কেন, কোনো ভয়-ভীত আছে নাকি?

—নাঃ, কিসের ভয়? তবে ভালুক-টালুক দু'একটা—

—ওর জন্যে ভাবনা নেই। হাট থেকে হরদম লোক যাতায়াত করছে এপথে—মানুষের সাড়া পেলে ভালুক থাকে না।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি, ওঁর জীবনের কাহিনী সব জেনে নিই। কোথায় বাড়ি, কোথায় দেশ, এসবশুনি। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আশ্রমের বেড়ার গায়েই মাটিতে পড়ে আছে—অথচ তাতে অনেক ফুলও ধরেছে।

বললাম—গত আশ্বিনের ঝড়েই বুঝি গাছটা পড়েছে?

—হ্যাঁ, এদিকে ততটা হয় নি, তবুও দু-দশটা গাছ পড়েছে বইকি।

—মেদিনীপুরের ওই দিকটার সর্বনাশ করে দিয়ে গেল, অথচ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিশেষ কিছু হয় নি দেখছি। এই গ্রামের নামটা কি?

—খানাকুই।

—কত দিনের আশ্রম আপনার? আছেন কতদিন এখানে?

—তা প্রায় আট-ন বছর। শিষ্য আছে জন-দুই কলকাতায়—তারাই আশ্রমের ঘর তৈরি করে দিয়েছে—মাসিক কিছু সাহায্যও করে।

—এ বনের মধ্যে ভাল লাগে?

—আছি বেশ। গ্রামের লোকের বড় জলকষ্ট। শিষ্যদের বলে আশ্রমে একটাপাতকুয়ো করে দিয়েছি, গ্রামের সবাই জল নিয়ে যায়। তবে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, কিছু মেলে না এ সব গাঁয়ে। কপি আর টোম্যাটোর ক্ষেত করেছি ঐ দেখুন। ঐ ভরসা। তাও গরমকালে জলাভাবে সব শুকিয়ে যায়। দারুণ জলাভাব।

বসে গল্প করছি, গেরুয়া কাপড় পরা একজন সন্ন্যাসিনী এসে এক পেয়ালা চা দিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, মা ঠাকরুন।

বললাম—ও, আপনার মা?

—না, আমার শিষ্যা। ওঁরও কেউ নেই। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। আমি কাছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর। আমার রান্না করে দেন। আশ্রমের কাজকর্ম করেন।

—কেউ নেই? প্রশ্নটা যেন আপন মনেই জিজ্ঞেস করি। সংসারে যার কেউ নেই, এই ভাবেই কোথাও না কোথাও তার আশ্রয় জুটে যায় বই-কি। ভগবানই জুটিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী বলছিলেন—আমার পাশে জমি কিনে রেখেছে কলকাতার একজন নার্স। তারও কেউ নেই। সে আমার শিষ্যাও নয়। অথচ এই আশ্রম দেখে আর মা ঠাকরুনকে দেখে বলেছে, এইখানেই আমার থাকা সুবিধে হবে। এইবার বোমার হাঙ্গামার সময়ে এসে আমার এখানে কিছুদিন ছিল।

—জমি পাওয়া যায়?

—কেন যাবে না, নেবেন?

আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভাল জায়গা দেখবো, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ি তৈরি করি। সুতরাং অন্যমনস্কভাবে বলেই ফেললাম—ইচ্ছে তো আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না। জমি আমিই দিচ্ছি। ঘরদোর আপাতত আমার আশ্রমের মত খড়েরই করুন, সস্তায় হবে।

—বেশ, তবে ঘর তৈরির দেখাশুনো আপনাকে করতে হবে। আমি তো কালই চলে যাচ্ছি, টাকা পাঠিয়ে দেবো।

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তরের মধ্যে বসে আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সেখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছি মনে হলো। কি সুন্দর হবে যখন এখানে নিজের ঘরের সামনে বসে থাকবো এমনি নির্জন রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে।

একটু পরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে সেখানে আর যাওয়া ঘটেনি—যেমন ঘটেনি আরও কত ওর চেয়েও ভাল জায়গায় যাওয়া—যেখানে যেখানে বাড়ি করবার অদম্য ইচ্ছা একদিন মনে হঠাৎ জেগেছিল এবং হঠাই মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মধ্যে আমার ঝাড়গ্রামের সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—তুমি কি কোনো সাধুকে জমি কেনার কথা বলেছিলে? একদিন হাটে আমার সঙ্গে এক সাধুর দেখা। আমায় বললেন, আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন কলকাতার একটি বাবু, তিনি জমি নেবেন বলেছিলেন। জমি সব ঠিক করে ফেলেছি, তিনি যদি আসেন তবে জমিটা লেখাপড়া করিয়ে দিই। ভাবে বুঝলাম, তুমি।

মনে পড়লো আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেবো বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য দেখে ভুলে যাই যে অত জায়গায় বাড়ি করবার মত পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জিলিঙ গিয়ে ভাবলাম ঘুমে একটা বাড়ি না করলে আর জীবনে ঘুম নেই। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্তত ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম শহরে বাড়ি হবার জো নেই—তখনই শত হস্তেন বাজিনাম্।

ঝাড়গ্রামের আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায় বসে ক্ষণকালের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো খানাকুই গ্রামের প্রান্তে সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তর; বনে-ঝোপে অজস্র ফোটা ল্যান্টনা ফুল, নানা রং-বেরং-এর। এই ফুলটা ওখানকার জঙ্গলে যত দেখেছি তত বাংলাদেশের এ অঞ্চলে কোথাও দেখি নি। তবে আজকাল কিছু কিছু আমদানি হয়েছে, বিশেষত রেললাইনের ঢালুতে। রেললাইনে ঢালুতে অনেক বিদেশী ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো রেলগাড়ির সাহায্যে ঐ সব বীজ দেশবিদেশে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি নে।

জানুয়ারি মাস। আমি ঘাটশিলা আছি সে সময়। পাশের স্টেশন হোল গালুডি। কয়েকটি বন্ধু সেখানে ইংরিজি নববর্ষের উৎসব করবেন, আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন।

হেঁটেই রওনা হই। বেশি নয়, ছ মাইল রাস্তা। কিন্তু পথের দৃশ্য আমার কাছে বেশ ভালই লাগে। উঁচু রেলপথের বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ডাইনে মাইল দুই আড়াই দূরে এবং বাঁয়ে মাইল চারেক দূরে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল শৈলমালা চলেছে বরাবর। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলমালা, বাঁদিকে কালাঝোড়।

বেলা পড়ে এসেছে। একস্থানে রেলওয়ে কাটিং, অর্থাৎ সেখানে উঁচু ডাঙার কঠিন পাথরের মধ্যে দিয়ে রেললাইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড় বড় চুনাপাথর ও বালিপাথরের চাঁই পড়ে আছে, খুব উঁচু পাথরের স্তূপ দেখাচ্ছে অনুচ্চ পাহাড়ের মত।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাতে একটু বসে নিলাম। সূর্য হেলে পড়েছে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশের মাথায়। কিছু দূরে জগন্নাথপুর বলে সাঁওতালী গ্রাম। একটা মাদার গাছ। ধু ধু করছে সিংভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর। শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে বলে আলোয়ানটা মুড়িসুড়ি দিয়েছি।

হঠাৎ একটা লোক বাংলা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে : "হরি দুখ দাও যে জনারে।"

বাংলাদেশ থেকে এত দূরে নীলকণ্ঠের গান কে গাইতে গাইতে যায়? ছেলেবেলায় বাবার মুখে শোনা গান—এখন এসব গানের চলন আর কোথাও নেই। সিনেমার গানে দেশ গিয়েছে ভরে!

আমার ডাকে লোকটা কাছে এল। মলিন তালি-দেওয়া নীল প্যান্ট ও শার্ট পরা। একজন সাঁওতাল যুবক। বললাম—বাড়ি কোথায় রে?

—বনকাটি।

—মৌ-ভাণ্ডারে কাজ করিস?

—হাঁ বাবু।

—এ গান শিখলি কোথায়?

—বুঢ়া লোকদের মুখে শেখা বাবু।

—সবটা জানিস্? গা দিকি—

—বাবু, তোমাদের সামনে কি আমরা গান গাইতে পারি?উশ্চারণ হয় না—

—ঠিক হবে, তুই গা। কি কাজ করিস?

—স্মিলোটে (অর্থাৎ, স্মেলটিং বিভাগে)—

—হপ্তা কত পাস?

—চার টাকা সাত আনা বাবু—

—আচ্ছা গান গা—

গান গেয়ে ছোকরা চলে গেল। আমিও উঠে কাঁদোড় নামে ক্ষুদ্র পার্বত্য ঝর্ণা পার হয়ে গালুডি এসে পৌঁছুলুম। বড় বড় পাহাড়ে তখন ছায়া পড়ে এসেছে—দূর থেকে বেশ দেখাচ্ছে পাহাড়ের গা-গুলো। কাঁদোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েরা মাছ ধরছে, কুলিরা মাঠ থেকে ঘুটিং পাথর কুড়ুচ্ছে গালুডির মাড়োয়ারি মহাজনদের জন্যে।

গালুডিতে পৌঁছুতে বন্ধুরা খুব খুশি হলেন। নববর্ষের উৎসবে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা অভিনয় করলে, যথেষ্ট খাওয়া-দাওয়া গেল। ঘাটশিলাতে ফিরলাম সেই রাত্রেই, জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মোটরে। বাড়ি আসতেই শুনলাম, চাঁইবাসাথেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল, সেখানে সভা করতে যেতে হবে। বললাম—তারা গেল কোথায়?

—তুমি গালুডি গিয়েছ শুনে ওরা মোটর নিয়ে সেখানে গেল খুঁজতে।

—পথে তো কোনো মোটরের সঙ্গে দেখা হয় নি, তবে আমরা মোড় ঘুরলে হয়তো ওরা পৌঁচেছে, এ হতে পারে।

আমার ভাবনা হোল বিদেশী লোক রাত্রে থাকবে কোথায়? তাদের তো গালুডি যাবার কোনো দরকারই ছিল না?

সে রাতে কেউ এল না, খুব সকালে দেখি একখানা মোটর বাড়ির পাশে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলুম, চাঁইবাসার তারাই বটে।

—কাল গালুডি গিয়েছিলেন কখন?

—আর মশাই কি কষ্ট। তখন রাত দশটা।

—তারপর?

—খুঁজে তো বাড়ি বের করলাম, তাঁরা বললেন, এইমাত্র মোটরে ওঁরা চলে গিয়েছেন।

—রইলেন কোথায়?

—সেখানকার ডাকবাংলোয়।

যাহোক, খেয়ে-দেয়ে চাঁইবাসা রওনা হই। সুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারা কংক্রিটের নিচু সাঁকোর উপর দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে বইছে—আমরা মোটরে সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—কিন্তু বর্ষাকালে সাঁকো ডুবে যায়, ডোঙা ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

মুসাবনীর রাস্তা আরও দু মাইল দূরে। চওড়া মোটর-রোড, একদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলশ্রেণী, অন্যদিকে বন। টাটা-কোম্পানি এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে schist পাথর কেটে নিয়ে যাচ্ছে; সেখানটাতে পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্যন্ত যেন একটা দগদগে ঘা।

রাখা-মাইন্‌স্‌ পার হয়ে বন পাতলা হয়ে এল। চষা ক্ষেত, সাঁওতালী গ্রাম ডাইনে। বাঁদিকে কিন্তু সেই যে পাহাড় চলেছে তো চলেছেই। শীতকালে পত্রবিরল দীর্ঘ দীর্ঘ শালের গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন পাহাড়ের ওপরে শালের খুঁটি পুঁতে রেখেছে।

বাঁদিকে এক জায়গায় একটা নাবাল মত উপত্যকা। সঙ্কীর্ণ গিরিপথের বাঁ দিকের পাথরে সিঁদুরের দাগ লেপা। এখানকার নাম কাপড়গাদি ঘাট। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এই পর্যন্ত এসে আর নাকি এগোন নি (পাণ্ডবেরা যান নি দুনিয়ার হেন জায়গা দেখি নি! পাণ্ডবদের পদচিহ্ন সর্বত্র), অতএব এরও আগের ভূভাগ হোল পাণ্ডববর্জিত দেশ। আর এখানে কবে তারা নাকি ময়লা কাপড় সাবান সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই এর নাম কাপড়গাদি ঘাট। বেচারি পাণ্ডবেরা! বনে জঙ্গলে টো টোকরে ঘুরে কাঁহাতক কাপড় পরিষ্কার রাখা যায়? আরও এগিয়ে গেলুম মাইল বারো—সবসুদ্ধ যেতে হবে ৪৭ মাইল রাস্তা এই রকম শোভাময় বনপথ দিয়ে।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়ে একটা রেল লাইন আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় যেন গেল। শুনলাম, এটা টাটা-বাদামপাহাড় লাইন। এর পরই দীর্ঘপ্রসারী মাঠের মধ্যে তিরিন্‌ বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাড়িগুলো বিশাল প্রান্তরে দিক্‌হারা হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

এক পাশে একটা ডাকবাংলোর মত ঘর। সেখানে গিয়ে মোটর থামাতেই একটি বাঙালি বাবু এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে একবার নামতে হচ্চে।

—কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে চাঁইবাসা পৌঁছুতে।

—তা হোক্‌, সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা—

কি করি, নামতেই হোল। মাঝারি আকারের বাংলো, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা।ভদ্রলোকটির বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়; এখানে পি. ডব্লিউ. ডি-তে চাকুরি করেন।

—কতদিন আছেন?

—তা প্রায় দু বছর—

—কেমন লাগে?

—আমি এক রকম যা হয় করে থাকি, কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের বড় কষ্ট।

—এ গ্রামে—

—গ্রামের কথা বাদ দিন। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না—বাঙালির মেয়ে অন্য বাঙালি মেয়ের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে, তাদের হয়েছে সত্যিকারের বনবাস।

—কিন্তু সিনারি বেশ, কি বলেন?

—সে আপনাদের চোখে হয়তো লাগতে পারে। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে—

মেয়েদের হাতে যত্নে সাজানো রেকাবে জলখাবার ও চা এল। আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবুটির কথা শুনে গৃহলক্ষ্মীদের জন্যে সত্যিই মনে কষ্ট অনুভব করছিলুম, এ যেন সেই আরিজোনার মরুভূমির মত রুক্ষদর্শন ভূভাগ—কালো কালো বনাবৃত পাহাড়, টিলা, উন্মুক্ত দিকচক্রবাল, এখানে মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠবার কথা বটে।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে তার আতিথেয়তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়িতে উঠলুম। আরও মাইল দশ-বারো গিয়ে খড়কাই নদী। নদী পার হয়ে মোটর থামিয়ে সেই নির্জন বালুকাস্তৃত নদীচরে অস্পষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। দুরে একটা পাহাড়, সামনে কটা রং-এর বালুরাশির মধ্যে নাতি-গভীর খাত সৃষ্টি করে ক্ষীণকায়া খড়কাই বয়ে চলেছে। কেমন একটি উদাস শোভা এই জনহীনপ্রান্তরের, এই পার্বত্য তটিনীর, রহস্যময়ী সন্ধ্যার।

চাঁইবাসা পৌঁছে গেলাম রাত আটটার মধ্যে।

সভার কাজকর্ম পরদিন মিটে গেল। ওখানকার বন্ধুরা তখনও ছাড়তে চান না। দুজন ফরেস্ট-অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়ে গেল। তাঁরা বললেন—আপনি বনের কথা লিখেছেন অনেক, কিন্তু সিংভূমের বন আপনি দেখেন নি—

আমি বললাম—কেন, অনেক বন তো দেখা গেল—

তাঁরা মৃদু হাসলেন। বললেন—আমরা ফরেস্ট-অফিসার হয়ে বন দেখি নি, আর আপনি বন দেখেছেন? হতেই পারে না!

—কোন্ বনের কথা বলচেন?

—আপনি বাঝিয়াচুর দেখেন নি, চিটিমিটি দেখেননি, জাতে দেখেননি—

—জাতে?সে আবার কি রকম নাম? চিটিমিটিই বা কি নাম—

—হো-ভাষার নাম। ও অঞ্চলের বনের বাসিন্দা সবই হো—যেমন রাঁচীর ওদিকে সব মুণ্ডা। চলুন আপনাকে ওদিকটা দেখিয়ে আনি—

আমার আসল বন ভ্রমণ এইভাবে শুরু।

৩রা জানুয়ারি। বন্ধুরা মোটর নিয়ে এলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হোল। রোরো নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ি সোজা চললো রাঁচী রোড বেয়ে প্রায় মাইল দশেক। তারপরেই বাঁদিকের ফরেস্ট রোড ধরে বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললো।

চাঁইবাসা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের বড় শোভা। রাঙা মাটি, উচ্চাবচ ভূমিভাগ, ছবির মত দেখতে সমস্তটা। মুশকিল হয়েছে, যারা সেখানে অনেকদিন আছে, তারা সেখানকার সৌন্দর্য ভাল ধরতে পারে না। চাঁইবাসার বাসিন্দাদের অনেকের মতে এসব এমন আর কি?

এখানে একটা কথা মনে পড়লো। ঘাটশিলা থেকে সাত-আট মাইল দূরে বেশ একটি নির্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র একটি ঝর্ণা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎকালে পর্বতসানুর বনে অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে রয়েছে শিলাতল বিছিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড়ঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন—এ কি আর এমন! কাশ্মীরে যা দেখেছি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করছি নে। কাশ্মীর ভাল নয় কেউ বলছে না—তা বলে যে একবার কাশ্মীর দেখেছে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য দেখবার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে? এ যদি হয় তবে কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক।

বরকেলা শৈলশ্রেণীর মধ্যে বনপথে অনেকখানি গিয়ে সৈদবা নামে একটিবন্যগ্রাম আছে। সেখানে বন-বিভাগের কর্মচারিদের জন্য একটি বাংলো আছে। বেলা প্রায় বারোটা। রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে হবে এখান থেকে। আমরা চা খেয়ে বাংলোর আরামকেদারায় গল্প করি কিছুক্ষণ।

মিঃ সিংহ বললেন—আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন বলে ভাববেন না, এ বড় আরামের জায়গা।

—কেন?

—রাত্রে এই বাংলোর বারান্দাতেই আমি বাঘ চরতে দেখেছি।

—গ্রাম তো রয়েচে নিকটে।

—গ্রাম থেকে ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় বাঘে।

—মানুষও নাকি?

—সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

ঘরের বাইরে এসে চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিলাম।

বাংলোর পিছনে বোধ হয় একশো হাতের মধ্যে উঁচু পাহাড়। ঠিক এ রকমই পাহাড় ও বাংলোর সম্মেলন এইবার আর এক জায়গায় দেখেছিলুম সে কথা পরে বলব। সেটা হোল মানভূম জেলায়। পাহাড়ের ঢালু থেকে বনানী নেমে এসে বাংলোর হাতায় মিশেছে, লোকজন তত চোখে পড়ে না।

একটা ছোট খড়ের ঘরের সমানে এসে মোটর দাঁড়ালো। বস্তি নয়, অন্তত আশেপাশে লোকজনের বাস দেখলাম না। শুনলাম ঘরটা গবর্নমেন্টের বাংলো, বনবিভাগের লোকজন সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারে।

এখান থেকে বামিয়াবুরু প্রায় এগারো মাইল দূরে। এই এগারো মাইলের মধ্যে লোকজনের বাস নেই—ঘন বনের মধ্যে গাড়ি ঢুকে পড়লো ক্রমশ—মোটর রোড ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠলো—বড় বড় গাছ দুধারে, শাল আর প্রায়ই মহুয়া।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা—চেয়ে দেখি আকাশ যেন অনেকখানি নিচে, বুঝলাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েচি।

মিঃ সিংহ বললেন, মুখ বার করে চেয়ে দেখুন, ওই ওপরে ফরেস্ট-বাংলো।

সত্যিই অনেক উঁচুতে বাংলোটা। যে পাহাড়ে উঠচি, এই পাহাড়ের মাথায় সর্বোচ্চ শিখরে একটা বাংলোঘরের লাল টালির ছাদ একটু একটু চোখে পড়চে।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মোড় ঘুরে মোটরটা অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে এক প্রকাণ্ড বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল। তখন শীতের সন্ধ্যার রোদ নিকটে দূরে ছোট বড় পর্বতশিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েচে।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বনাবৃত পর্বতশিখর, ছোট বড়—নানা আকারের পর্বতচূড়া, কোনোটা গোল, কোনোটা মোচাকৃতি, কোনোটা সমতল, ঘন বনে ভরা, আবার কোনো কোনো পর্বত-গাত্র অনাবৃত, কালোব্যাসাল্ট পাথরের স্তর সাজানো, রাঙা রোদ পড়ে সোনার পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে।

বললুম—নিকটে কোনো লোকালয় নেই?

—নিকটতম লোকালয় সেই কুইপা গ্রাম। এগারো মাইল দূর এখান থেকে—

—বড্ড নির্জন জায়গা। এখানে কি কেউ থাকে?

—বাংলোর চৌকিদার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে পাহাড়ের নিচের দিকে।

—অদ্ভুত বনের দৃশ্য বটে। বাঘ ভালুক আছে?

—বুনো হাতি যথেষ্ট। বাঘও আছে, ভালুকও আছে—

চায়ের টেবিল পাতা হোল—আমি প্রস্তাব করলাম, টেবিল টেনে বাংলোর সামনে সমতল জায়গায় পাতা হোক। রাঙা রোদ মাখানো অরণ্য ও পর্বতশিখরের দিকে চোখ রেখে বসে চা খাওয়া যাক। সত্যিই এমন গম্ভীর অরণ্য-দৃশ্যের মধ্যে চা খাওয়া হয় নি কতকাল। এই বাংলোর সামনে দিয়ে গভীর রাত্রে কত বন্য হাতি, বাঘ, ভালুক চরে বেড়ায়—গবর্নমেন্টের নোটিশ টাঙানো আছে, বেশি রাত্রে বাংলোর বারান্দায় কেউ না আসে—এমন নির্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে রুটি, মাখন, চা প্রভৃতি সভ্য খাদ্য খাওয়ার নূতনত্ব আছে বইকি।

চা খাওয়ার পরে মিঃ সিংহ বললেন—অন্ধকার হওয়ার দেরি আছে এখনও। চলুন আপনাকে মাছ ধরার বাঁধ দেখাই—

আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলুম। চারিধারে নির্জন ঘন অরণ্যানীর স্তব্ধতা; কয়েকটি হো-কুলি-মেয়ে লতাপাতা দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরের সামনে বসে বুনো খেজুর পাতার চেটাই বুনচে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের কি হাসি! আমি হো-ভাষা জানি না, মিঃ সিংহ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্তা বললেন।

আমি বললুম—কি বলছে ওরা?

—বলচে, বাবু এখানে কি দেখতে এসেচো!

—জিজ্ঞেস করুন ওদের নাম কি।

—একজনের নাম সামান্ কুই, একজনের নাম বুধন কুই—কুই অর্থাৎ মেয়ে।

—বেশ নাম। ওরা কি খায়?

—শুধু ভাত। না ডাল, না তরকারি, ও সব খেতে জানে না এদেশে।

—সারাদিন কি রোজগার করে?

—চার আনা।

—এতেই সন্তুষ্ট থাকে?

—খুব। একটু পরে দেখবেন গান করবে সবাই একসঙ্গে। ওদের মত অল্পে সন্তুষ্ট জাত নেই। মিথ্যা কথা বলতে জানে না, অত্যন্ত সরল। সভ্যতার সম্পর্কে যারা এসেছে, তারা সবাই দুষ্টু, বদমাইশ হয়ে গিয়েচে। কোনো টাউন বা কারখানার নিকটে যে সব হো বা ওঁরাও বাস করে, প্রায়ই সব খারাপ। কিন্তু এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্তসরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সে কথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মত পবিত্র সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভ ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখারয়েচে।

মিঃ সিংহ বললেন—আর একটা মজা, এরা বেশি রোজগার করতে চায় না। দিনের সামান্য মজুরি হাতে পেলেই খুশি। আর কিছুতেই কোনো প্রলোভনেই সেদিন খাটতে চাইবে না। এক জায়গায় সবাই গোল হয়ে বসে চেটাই বুনবে, গান গাইবে। কিন্তু রাঁচী শহরে গিয়ে এদের দেখুন, অন্যরকম দেখবেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ঝর্ণার কাছে এলাম। ঝর্ণার এক দিকে বাঁধ বাঁধা। বর্ষাকালে এখানে একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়। মিঃ সিংহের মুখে শুনলাম, এটাই মাছ ধরার বাঁধ। কোথা থেকে মাছ আসে একথা আমি জিজ্ঞেস করিনি।

তখন সে সব তুচ্ছ প্রশ্নের অবকাশও ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে অরণ্যের অলিগলিতে, সঁড়িপথে ঘন হয়ে নামচে। যেখানটাতে মাছের বাঁধ তার চারিধারে বড় বড় শালগাছ উঁচু হয়ে আকাশকে ঢেকেচে—শুধু অন্ধকার আর জলপতনধ্বনি আর নির্জনতা আর মনের মধ্যে এক রকমের গা-ছম্‌ছম্‌-করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি। মাছের বাঁধ ছেড়ে আরও প্রায় দু রশি গিয়েছি তখন। দু রশি কি তিন রশি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে আমার মনে হোল এ পৃথিবীতে আমি আর এই দুই বন-বিভাগের কর্মচারি ছাড়া (দুজনেই মিঃ সিংহ—হরদয়াল সিং ও যোগীন্দ্র সিংহ) আর বুঝি কেউ নেই—আফ্রিকার ঘন অরণ্যে নর-খাদক অসভ্য জাতিদের দেশে যেন এসে আটক পড়ে গিয়েচি। যেমন ঘন বনানী তেমনি ঘন অন্ধকার চারিপাশে।

হরদয়াল সিং হঠাৎ বললেন—এইখানটা একটু সাবধান, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার ওই সুঁড়ি পথটা দিয়ে জল খেতে নামে ঝর্ণায়।

জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটুখানি সরু পথরেখা অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেচে মনে হোল। বললুম—না গিয়ে এবার ফিরলে ভাল হোত না? বাংলো থেকে প্রায় মাইল দেড়েক তো এসে গিয়েচি।

ফিরবার পথে আবার সেই হো-মেয়েদের আস্তানা। বাঘের, হাতির, বুনো ভালুকের দেশের মেয়ে এরা। দিব্যি সেই অরণ্য-মধ্যে দরজাহীন, অর্গলহীন পাতার কুঁড়ের মধ্যে বসে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করচে। কেউ কেউ কুঁড়ের সামনে বসে চেটাই বুনচে, গল্প করচে, গান করচে।

আমাদের দেখে আবার ওরা হাসতে লাগলো—অথচ হাসবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেমানুষের মত সম্পূর্ণ অকারণে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ।

আমাদের আপ্যায়ন করে বললে—জোম্‌ পে—জোম্‌ পে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কি বলে?

—বলচে, ভাত তৈরি—খাও।

—চলুন দেখা যাক—কি খাচ্ছে।

বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হয়েছে, অথচ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। ওরা বড় কাঁসার উঁচু থালাতে এক রাশ ভাত ঢেলেছে এক একজনের জন্য। শুধু ভাত—নুনই বা কই! আশ্চর্য এই যে, ওই নিটোল স্বাস্থ্য শুধু এই উপাদানবিহীন ভাত খেয়ে। আমি মিঃ সিংহকে বললুম—ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা ডাল তরকারি খায় না কেন? আমার

প্রশ্নের অর্থ যখন তাদের বোধগম্য হোল, তখন তারা আর এক প্রস্থ হেসে উঠলো—যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি। উত্তর দিলে—এই খাই।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, কথার বাহুল্য নেই। শুধু উত্তর দিলে—এই খাই!

অনেক ঘেঁটু গাছ বনের প্রান্তে, পাহাড়ি ঢালুর সীমানায়। তবে কিনা এখন ফুল নেই গাছে, তবুও আনন্দ হোল গাছগুলো দেখে, এতদূর পাহাড়ি দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব বন্যপুষ্পের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটলো।

অত্যন্ত নির্জন স্থানটি, দূরে সৈদবা গ্রাম, কিন্তু বাংলো থেকে গ্রামের ঘরবাড়ি নজরে আসে না। আমরা কিছু দূরে একটি উপত্যকায় সাবাই ঘাসের চাষ দেখতে গেলুম, একটি পাহাড়ি ঝর্ণা পার হয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে, সে স্থানটি চারিদিকে বনে ঘেরা, মাঝখানে খানিকটা সমতল ফাঁকা মাঠ। গাঁট বাঁধা কলে হো-কুলিরা সাবাই ঘাসের আঁটি একত্র করে গাঁট বাঁধছে। নিকটেই গাছতলায় একজন কেরানি বসে কুলিদের হিসেব রাখছে।

কেরানি সর্বত্রই বাঙালি। কাছে গিয়ে বললুম—মশাইকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি এখানে ক্লার্ক? কতদিন আছেন?

—তা সাত বছর হোল।

—এ সাবাই ঘাসের ব্যবসা কাদের?

—আজ্ঞে দেবীপ্রসাদবাবুর, সনুয়া স্টেশনের কাছে আপিস আর আড়ত—মাড়োয়ারি।

—মাড়োয়ারি তো নিশ্চয়ই। সে আপনি বলবার আগেই বুঝেচি। জায়গা কেমনএটা?

—ভাল। তবে বড্ড জঙ্গল—মানুষের মুখ দেখার জো নেই।

—থাকেন কোথায়?

—সৈদবা গ্রামেই বাবুদের বাসা আছে কর্মচারিদের জন্যে, সেখানে রেঁধে খাই।

—ভাল লাগে?

—নাঃ। তবে কি করি বলুন, চাকরির খাতিরে সবই করতে হয়। এই বাজারে চাকরিটুকু গেলে—

—সে তো বটেই।

বনবিভাগের দুজন বড় কর্মচারি আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপরে যেখানে সাবাই ঘাসের চাষ চলচে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে পাহাড় ঘিরে। তার আশেপাশে গোছা গোছা উলু ঘাসের মত সবুজ সাবাই ঘাসের গোছা—আমন ধানের গোছার মত।

বললুম—ট্রেঞ্চ কিসের?

দুজন বনবিভাগীয় কর্মচারিই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন—জানেন না, ওর নাম কনটুর ট্রেঞ্চ—ওই খালের মত কাটা আছে বলে পাহাড়ের মাটি সরস হয়ে উঠচে। ও জিনিসটা নতুন বেরিয়েচে, আগে ও থিয়োরিটা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, কনটুর ট্রেঞ্চের হাওয়া যতদূর যায়, ততদূর সরস হয়ে ওঠে মাটি আর বাতাস।

এ কথা এদের মুখে আরও অনেকবার শুনেছি। কনটুর ট্রেঞ্চ থিয়োরির বড় ভক্ত এঁদের মত আর দেখি নি। সেই ভীষণ শুষ্ক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত যে কোনো দিন আবার এখানকার মাটি-বাতাস সরস হবে।

বললুম—আপনারা ইজারা দেন দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারিকে?

—ন বছরের লিজ আছে ওর সঙ্গে। চার হাজার টাকা বছরে—

—তিনি কোথায় ঘাস বিক্রি করেন?

—বামার লরি কোম্পানির কনট্রাক্ট আছে—তারা সনুয়া স্টেশন থেকে মাল নিয়েযায়।

—বেশ লাভ আছে, কি বলুন?

—খরচ-খরচা বাদে পাঁচ-ছ হাজার টাকা থাকে দেবীপ্রসাদবাবুর। নইলে কি কেউ ভূতের বেগার খাটে!

মনে ভাবলুম, ভূতের বেগার দেবীপ্রসাদবাবু খাটতে যাবেন কেন, সে যদি কাউকে খাটতে হয় তবে খাটচে, ওই বেচারি বাঙালি কেরানিবাবু। এই নির্বান্ধব স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেটে হয়তো মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়— তাও পায় কিনা কে জানে! ধনিক যিনি, তিনি প্রকাণ্ড অস্টিন-গাড়িতে চেপে একবার এক ঘণ্টার জন্যে হয়তো এসে তদারক করেন।

সেই বনাবৃত উপত্যকার এক প্রান্তে সেই ঝর্ণাটির কুলুকুলু ধ্বনি বনপত্রমর্মরের সঙ্গে মিশে এক মধুর সঙ্গীত রচনা করে চলেচে। আমরা তিনজনেই বটবৃক্ষের ছায়ায় শুকনো ছড়ানো সাবাই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আকাশ দেখি, বিহঙ্গ-কাকলী কান পেতে শুনি, খোশগল্প করি।

বেলা দুটোর পর বাংলোতে গিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। গরম গরম খিচুড়ি খেতে সেই বনের মধ্যে খুব মিষ্টি লাগলো।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথযাত্রা। দু পাশের ঘন বন, একদিকের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটেচে। বন ক্রমশ ঘন হতে ঘনতর হয়ে উঠেচে। যেতে যেতে এক জায়গায় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মিলিত সঙ্গীত কানে এল। ব্যাপারকি? গান গায় কে?

মিঃ সিংহ বললেন—দেখবেন? এখানে কাইনাইটের খনি আছে—

—জঙ্গলের মধ্যে—

—বেশি দূর নয়, পথের ধারে।

মোটর থামিয়ে আমরা গাছপালা ঠেলে বনের মধ্যে ঢুকি। আমাদের সামনে একটা ধাওড়া চালাঘর, জংলীঘাসে ছাওয়া। ত্রিশ-চল্লিশ জন তরুণী স্বাস্থ্যবতী হো-কুলিরমণী সেখানে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লোহার দুরমুশ দিয়ে পাথুরে কয়লার মত কি জিনিস চূর্ণ করচে আর একসঙ্গে গান গাইচে হো ভাষায়।

মিঃ সিংহ বললেন—ঐ কালো কয়লার মত জিনিসটাই কাইনাইট।

—খনি কোথায়?

—আরও জঙ্গলের মধ্যে।

—এর মালিক কে?

—এও দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারির। বনের মধ্যে খনির কাছেই এর বাসা আর আপিস আছে। সেখানে দু-তিন জন বাঙালিবাবু—

—খাতা লিখছে—

—হ্যাঁ।

আবার মোটরে এসে উঠলুম। বন ছাড়িয়ে উঁচুনিচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটখাট বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো হো-গ্রাম। ফিল্মের ছবির মত সুন্দর এই বন্য গ্রামগুলি। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট নিচু ঘরগুলি, চালায় চালায় বসতি। এরা ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বাড়ি তৈরি করতে জানে না; এক বাড়ির দেওয়ালের গায়ে অন্য গৃহস্থ চালা বসিয়েচে অন্যদিকে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে—বোধহয় সেগুলো পারিবারিক সমাধি বা দেবদেবীর স্থান। প্রত্যেক হো বন্য গ্রামেই এমন পাথর ছড়ানো দেখেছি—মোটা মোটা পাথর ডলমেন্ বা মেনহিরের ধরনে খাড়া করে পোঁতা—তাদের গায়ে হিন্দিতে কি লেখাও আছে।

একখানা পাথরের গায়ে লেখা—

বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাই।

ঘর—বনটুডি

জিলা—সিংভূম

জিজ্ঞেস করলুম—কাকে অমর করবার ব্যবস্থা এ?

মিঃ সিংহ বললেন—কেন, বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাইকে!

—তার কি হয়েচে?

—সে মারা গিয়েচে।

আবার ফিরলাম বামিয়াবুরু বাংলোতে। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়।

পরদিন বামিয়াবুরু বনের মধ্যে বেড়াতে বার হওয়া ঠিক হয়েচে, আমরা একটুবেশি রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ করলাম।

অন্ধকার রাত্রি; আমার চক্ষে ঘুম নেই, এমন বিশাল অরণ্যের মধ্যে কখনও রাত কাটাই নি। বসে বসে দেখছিলাম বাংলোকে ঘিরে চারিধারে শুধু বন আর পাহাড়, পনেরশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের এই বাংলো সুতরাং এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্চে ছোট বড় পর্বতশিখর, আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা।

যোগীন্দ্র সিংহ বন বিভাগের কর্মচারি বলেই যে বনশ্রী ভালবাসেন তা নয়—তেমন যোগাযোগটি সব সময় ঘটে না—ভাবুক লোক। অন্ধকারময়ী রজনীর রূপ দেখবার জন্যে তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে জেগে বসে আছেন বাইরে।

কিসের একটা সুগন্ধ বাতাসে। সিংহ বললেন—পাচ্ছেন গন্ধটা?

—ভারি চমৎকার গন্ধ বটে। কিসের?

—কোনো অজানা বনফুলের—

আমি একটা ভয়ানক ভুল অনেকক্ষণ থেকে করছিলাম। বামিয়াবুরু এবং নিকটবর্তী অরণ্যে একপ্রকার গাছকে আমি বারবার কনকচাঁপার গাছ বলে আসছি এবং এই দুই বনবিভাগের উচ্চ কর্মচারির সঙ্গে তর্ক করেছি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায়—কারণ ওঁরা বলছেন, চাঁপাগাছ নয়। ও হোল ভেড্‌লেন্ডিয়া—আর চম্পক হোল মাইকেলিয়া চম্পক; তার পাতা হবে কালো কালো লম্বা লম্বা।

আমি বলে আসচি, না, তা নয়। স্বর্ণচাঁপার পাতা অমন হবে না। এই যাকে বলচেন ভেড্‌লেন্ডিয়া, এই হোল স্বর্ণচাঁপা। ওঁরা আমার জেদ দেখে বলেছিলেন—তা হতে পারে হয়তো। কিন্তু ও গাছকে আমরা আগাছা স্বরূপ বিবেচনা করি।

এ ভুল আমার কি ভাবে ভেঙেছিল, সে পরে বলচি—এখন আমার হঠাৎ মনে হোল বনের সেই স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ নয় তো? কিন্তু এখন তো চাঁপাফুল ফোটবার সময়ও নয়।

বড় সুগন্ধ ফুলটার—যে অজানা ফুলই হোক বনের,—অন্ধকারের মধ্যে নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্ম-নিবেদন নিশ্চয় ব্যর্থ নয়। বিশ্বের বড় গেরস্থালিতে এতটুকু জিনিসের অপচয় হবার জো নেই।

অদ্ভুত গম্ভীর শোভা এই নিবিড় নির্জন অরণ্যানীর। মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোট বড় চুড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে—মাঝে মাঝে দু-একটা রাত-জাগা পাখির ডাক, সর্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। শোওয়া কি যায়? এমন রাত্রি নিদ্রার জন্যে তৈরি হয় নি।

—আমরা জেগে বসে থাকি, কি বলেন মিঃ সিংহ?

—খুব ভাল।

মনে হোল এমন বিরাট অরণ্য কখনও দেখি নি জীবনে। এমন বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গেএই অদ্ভুত-দর্শন শৈলশ্রেণী—দুই-এর এই যোগাযোগইএই অরণ্যকে সুন্দরভাবে, অধিকতর রহস্যময় করচে; এ দেখবার সুযোগ বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? রেলপথের নিকটবর্তী স্থানসমূহে অনেক সহজেই যেতে পারেন বটে যেমন মধুপুর, শিমুলতলা ইত্যাদি, কিন্তু সে সব স্থানে মানুষের ভিড়, ছোট বড় ঘরবাড়ির ভিড়। দূরে বা নিকটে এমন ধরনের অরণ্য নেই।

দেওঘর থেকে ১৪/১৫ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গল আছে বটে, কানিবেলের জঙ্গল; সেটা লছমীপুর গাড়োয়ালি স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। আমি একবার ভাগলপুর থেকে দেওঘর পর্যন্ত পদব্রজে আসি সেই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। সে বন বড় একটা মালভূমির ওপর, তার শেষ প্রান্ত থেকে দূরস্থিত ত্রিকূট পাহাড় নীলমেঘের মত দেখা যায়, কিন্তু সে এমন শৈলমালাবেষ্টিত নয়, এত বড় বনস্পতির সমাবেশও নেই সেখানে। স্টেটের লোক কাঠ বেচে জঙ্গল অনেক নষ্ট করে ফেলেচে। দেওঘর থেকে সেখানে যাবার এক হাঁটাপথ ছাড়া উপায় নেই; কাজেই ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার সুবিধা কোথায়?

হঠাৎ মিঃ সিংহ বললেন—ওই আলোটা দেখছেন আকাশে, কিসের বলুন তো?

একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার আকাশে কিসের আলো বটে। যেন দূরের কোনো অগ্নিস্রাবী আগ্নেয় পর্বতের আভা আকাশপটে প্রতিফলিত হয়েচে। আমি বুঝলাম না।

মিঃ সিংহ বললেন—ওটা টাটার আলো।

—এতদূর থেকে?

—খুব দূর কোথায়! সোজা ধরলে ত্রিশ মাইল—

একটু পরেই আলোটা মিলিয়ে যেতে আমার আর কোনো অবিশ্বাস রইল না।

কিন্তু ঘন বনের দিকে কুকুর ডাকে কোথায়?

বললাম—কোনো বস্তি আছে নাকি ও পাহাড়ের মধ্যে?

মিঃ সিংহ বললেন— ও হোল একরকম হরিণের ডাক। বার্কিং-ডিয়ার, ঠিক কুকুরের মত ডাকে; যদি জেগে থাকেন, এ বনে আরও অনেক রকম জানোয়ারের আওয়াজ শুনতে পাবেন। হাতির ডাক, বাঘের ডাক—

বেশি রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকা আমাদের অদৃষ্টে ছিল না। বাংলোর মধ্যে থেকে হরদয়াল সিং ডাকাডাকি করতে লাগলেন, এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকা ঠিক নয় এসব জায়গায়। বিশেষত ঠাণ্ডা লেগে অসুখও তো হতে পারে।

পরদিন সকালে উঠে মিঃ সিংহ আমাকে এক অপূর্ব সূর্যোদয় দেখালেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে লালসূর্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। আগে সমস্ত বড় বড় শিখরগুলোতে কে যেন সিন্দুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিলে। যেদিকে চাই সেই অজানা আকাশ-পরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুলো, শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াশা দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল—কি সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাত।

আমরা চা-পান করে বন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। চা খেতে একটু বেলা হোল;এখানে জঙ্গলে কোথায় দুধ মিলবে। দশমাইল দূরবর্তী সেই কুইরী গ্রাম থেকে বনবিভাগের লোক সাইকেল যোগে দুধ নিয়ে এল।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ি পথ—খানিকদূর নেমে এসে রাস্তায় উঠলাম আমরা চার-পাঁচজন লোক; দুজন বনবিভাগের উচ্চ কর্মচারি, দুজন ফরেস্ট গার্ড, আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে, আরও কয়েকটি লোক।

রাস্তার পাশের একটা সরু পায়ে চলার পথ নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকার, ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেচে। একটা সংকীর্ণ পাহাড়ি নালা বনের মধ্যে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। এই নালার হো-নাম হচ্ছে পোগা-মারো-গাঢ়া। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হলো এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নি, যা দেখছিলাম তা বাইরে থেকে। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ, সোজা, খাড়া শাল, কেঁদ, বারম প্রভৃতি বনস্পতিশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দিনের আলোক আটকেচে। সারাদিনের মধ্যে এখানে সূর্যের আলোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি ঈষৎ আর্দ্র, একটু বেশি শীতল, গাছে গাছে কত সুদর্শন অর্কিড, নিম্নে আগাছার জঙ্গলও বেশ ঘন।

এক জায়গায় ছোট-এলাচের গাছ হয়েচে, মিঃ সিংহ দেখালেন খুব বড় হলুদ গাছের মত পাতায় ছোট এলাচের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে ক্ষীণ জলধারা আমাদের পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেচে, তার ওপর প্রস্তর-সঙ্কুল পথ, সুতরাং আমাদের যেতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে।

একটা মাঝারি গোছের গাছ দেখে ওঁরা বিজয়ের হাস্যে বলে উঠলেন—এই। এই হলো মাইকেলিয়া চম্পক, চম্পক ফুলের গাছ।

আমি বললাম—এ চম্পক গাছ হতে পারে, স্বর্ণচাঁপা নয়।

—আমরা অন্য চাঁপাগাছ চিনি নে—এ গাছে চম্পক ফুল হয়।

—হতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর চাঁপা, আপনারা যাকে ভেড্‌লেন্ডিয়া বলছেন। ওই হোল স্বর্ণচাঁপা। এ গাছের পাতা আমাদের দেশের নোনাগাছের মত দেখতে—এ স্বর্ণচাঁপা গাছ নয় কখনও। তবে এ চম্পক ফুল আমি কখনও দেখি নি, সে আমি। স্বীকার করচি।

বড় বড় গাছ বেয়ে এক ধরনের লতা উঠেচে। ওঁরা বললেন—বুনো মেটে আলু হয় এর তলায়। এদেশের হো-মেয়েরা বন থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

ঘন অরণ্যশীর্ষে প্রভাতের সূর্যালোকেক্বচিৎ কোনো বনপুষ্প সুবাস, এ বড় বনানীর একটা গভীর রহস্যের ভাব আমার মনে এনে দিয়েচে; ভুলতে পারচি নে অরণ্য-সমাকুল সিংভূমের যে অংশে বিচরণ করচি, এটি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শ্বাপদ-অধ্যুষিত এক মহাবন; ঠিক শৌখিন কোনো পার্কে বেড়ানো নয় এটি—যে কোনো সময়ে মত্ত হস্তীযূথ বা মহাকায় ব্যাঘ্রের সামনে এসে পড়তে পারি। আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ফরেস্ট গার্ডের স্কন্ধস্থ কুড়ুল তখন কি কোনো কাজে আসবে?

হরদয়াল সিং বললেন—এখান থেকে টাইগার হিলে যাবেন?

—সে কোথায়?

—মাইল পাঁচেক দূরে এই বনের নিবিড়তম অংশে। বিহারের গবর্নর একবার কনজারভেটরকে নাকি বলেছিলেন—তোমাদের বনের খুব wild জায়গাটি একবার দেখতে চাই। তাই বনবিভাগ থেকে এই স্থানটি নির্বাচিত করা হয়। অবিশ্যি এর মধ্যে লাটসাহেবের সুখ-সুবিধের দিকে কিছু দৃষ্টি রাখা হয়েছিল বই কি!

—কেমন জায়গাটি?

—খানিকটা পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। একটা পাহাড়ের ওপরে সমতলভূমি টেবিলের মত। সেখান থেকে চারিদিকে চাইলে মনে হবে পৃথিবীতে ঘন বন ছাড়া আর বুছি কিছু নেই। দৃশ্য বড় চমৎকার। সত্যিকার বনের সৌন্দর্য দেখবেন—

যাবার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঁচ মাইল কি যাওয়া যাবে হেঁটে সস্ত্রীক? উনি সঙ্গে না থাকলে কোনো কথা ছিল না। দেখি কত দূর কি হয়।

যে নালার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে নালাটির কালো জলে বিশাল বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া। এক জায়গায় খুব বড় কনটুর ট্রেঞ্চ, এখন জল নেই—বর্ষাকালে এর মধ্যে জল জমে বনভূমিকে আর্দ্র করে, মাটিকে সরস করে। বর্তমান অবস্থা দেখলেসে কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

এইবার আমরা বনের উঁচুদিকে যাচ্ছি মনে হোল। কারণ লম্বা লম্বা ঘাস দেখা গেল এবার। ভূমি যেখানে অপেক্ষাকৃত নীরস ও পাষাণময়, সেখানে নাকি ঘাস দেখা যায় বনে। এ ধরনের ঘাস আর কোথাও জন্মায় না।

একজন ফরেস্ট গার্ড কি ধরনের এক পাতা তুলে নিয়ে এল। শুনলাম, এ পাতা দিয়ে বনের লোকেরা দিব্যি চাটনি তৈরি করে খায়।

আমার স্ত্রী বললেন—কি করে চাটনি তৈরি হয়?

—শুধু বেটে একটু নুন দিয়ে খেলেই হোল। পুদিনার মত।

বেলা প্রায় দশটা। ঘড়ি দেখে সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এই বনের মধ্যে থেকে তা কিছুই বোঝবার জো নেই। রোদুর পড়েনি মাটিতে বিশেষ কোথাও। ঘাস পাতা এখনও শিশিরার্দ্র।

আমি বললাম—আপনারা বাঘের ভয় করেন না?

মিঃ সিংহ বললেন—করলে আমাদের কাজ চলে না।

—বাঘের সামনে পড়েছেন কখনও?

—দু-তিন বার। একবার মোটর ড্রাইভ করে ফিরছি পাটনা থেকে, গভীর রাত্রে কোডার্মার জঙ্গলে প্রকাণ্ড রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার একেবারে গাড়ির পাশে।

—পাশে?

—হ্যাঁ, রাস্তার পাশে। একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ মেরে তাকে খাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন?

—কি আর করব? হেড লাইটের আলো পড়তে আমি ওটাকে দেখতে পেলাম,তারপর ভয় হোল গাড়ির ওপর লাফিয়ে না পড়ে!

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একবার বুনো হাতির পাল্লায় পড়েছিলাম। একটা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে সাইকেলে নামচি, একদল বুনো হাতি বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান নাড়ছে। বাঘের চেয়ে বুনো হাতি বেশি বিপজ্জনক—সোজা সাইকেল চালিয়ে দিলাম,পেছন দিকে আর চাইলাম না।

আমার স্ত্রী বললেন—এ বনে বাঘ আছে?

—বড় বাঘ বিশেষ নেই। অন্য সব জানোয়ারই আছে। তবে বনকে বিশ্বাস নেই জানবেন।

পথের পাশে একটা বড় গাছের ছাল ওপর থেকে খুলে ঝুলে পড়েছে। সেটা দেখিয়ে হরদয়াল সিং বললেন—বলুন তো এরকম কেন হয়েছে?

প্রশ্নটা আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আগেই। বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে বনস্পতির এই দশা।

মিঃ সিংহ বললেন—টাটকা করেছে। এই দেখুন পায়ের দাগ। কাল রাতের ব্যাপার।

সত্যই বটে। মাটির ওপরে হাতির পায়ের দাগ এবং একটু দূরে হাতির নাদ। বেশ বোঝা গেল সন্ধ্যার পরে এসব পথে যাতায়াত করা খুব সুবিধেজনক নয়।

এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে রাস্তার পাশে অনেক নীচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যে বনের মধ্যে আমরা বেড়াচ্ছি, সেটা যে উঁচু পাহাড়ের ওপরকার বন, নিম্নের উপত্যকা দেখে সেটা ভালই বোঝা গেল।

হরদয়াল সিং বললেন—কেমন, যাবেন টাইগার হিলে?

—আর কতদূর?

—ফিরতে তা হলে বেলা একটা বাজবে।

সেখান থেকেই বাংলোতে ফিরবার কথা হোল। আমার স্ত্রী আর যেতেই চাইলেন না।

এইবার যেখানে আমরা ধূমপান ও বিশ্রামের জন্যে বসলাম, সে স্থানটিকে বেমালুম আফ্রিকা বলে চালিয়ে দিলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। একদিকে গভীর পাহাড়ি খাদ, অনেক নিচে অগণ্য বনস্পতির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্চে, দুপুরের রোদ এসে পড়েছে তাদের ওপরে।

বনের প্রকৃতিও অন্য রকম।

হরদয়াল সিং বললেন—ঐ হোল আমাদের মিসেলেনিয়াস ফরেস্ট। শাল ছাড়া আরও অনেক গাছ ওতে আছে।

—ওখানে নেমে চলুন দেখি না।

—পথের ধারে ওরকম একটা বিরাট area পড়বে অন্য জায়গায়। নিচে নেমে কষ্ট পেতে হবে না। ওখানে কিন্তু বিপদ আছে—

—কেন?

—সাপের ভয়। অনেক সময় বড় বড় বিষাক্ত সাপ থাকে। একটু সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।

বাংলোতে যখন পৌঁচেছি, তখন বেলা একটার কম নয়। আমি স্নান করতে চাইলুম নীচেকার সেই ঝর্ণার জলে, কেমন চমৎকার কুলুকুলুনাদিনী স্বচ্ছসলিলা ঝর্ণাটি, বনের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে আসচে—দুধারে কলের চিমনির মত কেঁদ আর শালের ভিড়। সেইখানেই স্নান করে আসি।

মিঃ সিংহ বললেন—না যাওয়াই ভাল। এসব ঝর্ণার জল অনেক সময় খারাপ থাকে।

হরদয়াল সিং বললেন—একবার লোহারডগা না নেতারহাট এমনি কোনো একটা জায়গার কাছাকাছি বনে তিনি একটা ঝর্ণায় স্নান করেছিলেন বনের মধ্যে। তারপর সর্ব শরীরে চাকা চাকা কি বেরিয়ে ফুলে গেল। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বর হতে পারে।

অতএব ঝর্ণায় স্নানের আশা ছেড়ে আমরা বাথরুমের টবের জলেই স্নানপর্ব সমাধা করলাম। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখা গেল বনের মধ্যে ছায়া পড়ে আসচে চারি দিকেই বড় বড় শৈলচূড়া, জায়গাটাতে তাড়াতাড়ি ছায়া নেমে আসে।

বনের মধ্যে সেই ঝর্ণার কাছে গিয়ে আমরা সবাই বসলুম সেই অপরাহ্ণে।

এর নাম দিয়েচে এরা মাছের বাঁধ। বন-বিভাগ থেকে একটা বাঁধ মত গেঁথে দিয়েচে বেগবতী পার্বত্য স্রোতস্বিনীর বুকে। তাতে তার গতিরোধ হয় নি, আরও দ্বিগুণ। উচ্ছাসে আবেগে কংক্রিটের বাঁধ ডিঙিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পড়চে। এই স্থানটি এত সুন্দর, একবার বসলে উঠে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

এর সামনের দিকে সুউচ্চ পাহাড়, তার ঢালুতে বড় বড় শালগাছের বন, এখানে বসে শুধুই দেখা যায় শালগাছের গুঁড়িগুলো নিচে থেকে ভিড় করে ওপরের দিকে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের ডানদিকে চওড়া মোটর-রোড বনবিভাগের নির্মিত, কিন্তু এ পথে মোটর অপেক্ষা বাঘ-ভালুকের যাতায়াত বেশি। যখন কন্ট্রাক্টরের দলের লোকেরা বনের মধ্যে থেকে কাঠ কাটিয়ে নিয়ে যায়, তখন বছরের মধ্যে দিনকয়েক ওদের মোটর লরি বা মোটর যাতায়াত করে—ক্বচিৎ বন-বিভাগের উচ্চ কর্মচারি মোটরে সফর করতে আসেন—মিটে গেল। মোটরগাড়ি তো দূরের কথা, সারা বছরে এ পথে আর লোকজন বড় বেশি যাতায়াত করে না।

অতিরিক্ত নির্জন স্থান। চেয়েচেয়ে দেখলুম, একটা লোক কোনো দিকে চোখে পড়ে না—শুধু যা আমরাই আছি। ঋষিদের তপোবন এমনি নির্জন জায়গাতেই ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী, এখানেই বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হই-হট্টগোলযুক্ত শহরের বুকে নয়।

পাশের পথ বেয়ে দুজন লোক পুঁটলি কাঁধে কোথায় চলেছে। তাদের ডাকা হোল হো-ভাষায়, অবশ্য আমি ডাকি নি। আমি মিঃ সিংহকে বললুম—জিজ্ঞেস করুন ওরাকোথায় যাচ্চে।

—সৌলবোরা যাব।

—এখান থেকে কতদূর?

—সতের মাইল?

—সেখানে কেন?

—সেখান থেকে টাকা আনবো—মাড়োয়ারির গদী থেকে। আমরা কুলি। জঙ্গলে কাঠ কেটেছিলাম, তার মজুরি।

—সন্দেবেলা যাচ্ছিস, ভয় করবে না?

—কুইরা গ্রামে গিয়ে রাত কাটাবো।

হরদয়াল সিং সম্মুখের ছায়াচ্ছন্ন শৈলসানুর দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—ঐরকম ঢালু জায়গায় আমাকে বুনো হাতিতে তাড়া করেছিল। সাইকেল না থাকলে সেদিন মারা পড়তাম।

আমার স্ত্রী বললেন—তাহলে আজ ওঠা যাক এখান থেকে—

সেই সময় বন-বিভাগের দুইজন উচ্চ কর্মচারি আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বললেন—আচ্ছা, বলুন তো এ কংক্রিটের বাঁধটার আর কি উন্নতি করা যায়?

হরদয়াল সিং এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উঁচু অফিসার। তিনি বললেন—আপনাদের পরামর্শটা একবার নিয়ে দেখি। আমি তো একরকম ভেবে রেখেছি, দেখি আপনারা কি রকম বলেন।

'আপনারা' অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী—এ যেন ডাক্তার বিধান রায় পরামর্শ চাইচেন পাশের বাড়ির স্কুলমাস্টার বন্ধুর কাছে—বলুন তো মশাই, এ রোগীটির সম্বন্ধে এখন কি ওষুধ দেওয়া যায়? আপনার কি মত?

কিন্তু বিজ্ঞ ভেবেই তো পরামর্শ চাইছেন। খেলো হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়। তাহলে লোকে মানে না। সুতরাং মুখখানা গম্ভীর করে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার ভান করলুম। যেন সক্কর বাঁধ কিংবা নতুন হাওড়া ব্রীজের প্ল্যান করবার ভার আমার ওপর পড়েছে।

হঠাৎ ভেবে দেখলুম, বাঁধটা এমন করে কেন যে বেঁধেছে, ওখানটাতে অমন নালা কেন করেছে, ওই জায়গাতে কংক্রিটের দেওয়ালের কাছে কয়েকটা ফোঁকর কেন—এইগুলো এখনও পর্যন্ত ভাল করে বুঝি নি। দু-একটা ইন্‌টেলিজেন্ট প্রশ্ন করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে এ ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতই পরিষ্কার।

সুতরাং বললুম—আচ্ছা, এ বাঁধ এখানে কি জন্যে দেওয়া হয়েছে?

হরদয়াল আমার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন—কেন, মাছ ধরার জন্যে!

আমি বললাম—ও।

তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার আর কোনো ইন্‌টেলিজেন্ট প্রশ্ন করতে সাহস হোল না। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ তখনও ঘোচে নি। এতে কি করে মাছ ধরা হবে,তা তখনও আমার মাথায় ঢোকে নি। বললাম—আচ্ছা বর্ষার জল এতে আটকায় কি করে?জল তো উপচে পড়বে! মাছ দাঁড়াবে কোথায়?

হরদয়াল সিং প্রায় চিৎকার করেই বলে উঠলেন—ওই! ওই তো সমস্যা! এই কথাই তো বলছিলাম!

যাক, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশেও লাগবে না? লেগেছে।

আমার স্ত্রী বললেন—চলো, বেলা প্রায় পড়ে এল।এসব জায়গা ভাল নয়। ওঠা যাক।

এ যাত্রা ভগবান মুখ রক্ষে করলেন। আমার স্ত্রী উঠে পড়তে সবাই উঠলাম সেখান থেকে।

বেলা পড়ে এসেছে। চারিধারের বনে এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসবার উপক্রম করছে। সুতরাং বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

আমি বললাম—এ জঙ্গলে আমাদের বন্দুক না নিয়ে বেরোনো উচিত নয় কিন্তু।

মিঃ সিংহ বললেন—বন্দুক আমাদের আছে, তবে আমরা নিয়ে বেড়াই নে। ও একটা ঝাঞ্ঝাট।

হরদয়াল সিং বললেন—আমরা ডিপার্টমেন্টের অফিসার মশাই, বাঘ-ভালুকে আমাদের কিছু বলবে না।

কয়েকটি হো-মেয়ে পাহাড়ের নিচে ভাত বেঁধে খাচ্ছে আজও। এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ-ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তণ্ডুলসিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়ছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট—তার কোনো আঁচ এসে এখানে পৌঁছায় নি। কেরোসিন তেল না পাওয়া গেলেই বা এদের কি, চিনির দাম চালের দাম চড়লেই বা এদের কি, কাপড়ের দাম বাড়লেই বা এদের কি! এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বন-প্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস জোগায়।

এদের জিজ্ঞেস করা হোল—চাল যখন না পাওয়া যায়, তখন কি খাবি?

একটি মেয়ের নাম বুধ্‌নি কুই, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হোল তার কথাবার্তা শুনে। কুই হো-জাতির কুমারী মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার হয়।

সে বললে—কেন, বনে খাওয়ার জিনিসের অভাব আছে নাকি?

—কি খাবার পাওয়া যায়?

—কন্দমূল। কত রকমের কন্দ পাওয়া যায় বনে। যারা জানে তারা তুলে আনে। বর্ষাকালে আমাদের দু-তিন মাস কন্দ খেয়েই চলে যায়।

কন্দ কথাটা সংস্কৃত হলেও বেমালুম ঢুকে পড়েছে হো-ভাষার মধ্যে, 'কান্দা' রূপে।বাংলা দেশের মেটে আলু জাতীয় একপ্রকার মূল এ জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ল্যাটিন নাম 'ডায়াস্ কোরিয়া', খেতেও বেশ সুস্বাদু। এ জাতীয় লতা এই সব বনে সাধারণত শৈল-সানুর অরণ্যে জন্মায়, নিম্নের উপত্যকাতেও কিছু কিছু আছে।

আমি হিন্দিতে প্রশ্ন করলুম—তোরা জঙ্গলে কন্দ তুলতে যাস, বাঘের ভয় করিসনে?

বুধ্‌নি কুই কিছু বুঝতে পারে না, শুধুই হাসে। এরা বাংলা তো দূরের কথা হিন্দিও বোঝে না, বিহারে বাস করে। কারণ এদের কাছে বাংলাও নেই, বিহারও নেই—ওসব কথার কোনো অর্থ নেই এদের কাছে। এই অরণ্যভূমি এদের মা; নিজের ক্রোড়ে আশৈশব এদের লালন করেছে, ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল জুগিয়ে। একেই চেনে এরা।

হরদয়াল সিং হো-ভাষায় আবার প্রশ্নটি ওদের করলেন। আর বুধ্‌নির উত্তর আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

বুধ্‌নি বললে—আমরা দল বেঁধে যাই, চার-পাঁচজন একসঙ্গে।

—বাঘ-ভালুক দেখিস নে?

—মাঝে মাঝে দেখি বই কি।

—ভয় করে না?

—ভয় করলে কি চলে আমাদের। সঙ্গে তীর ধনুক থাকে। তবে বাঘ বেশি মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। হাতি বেশি খারাপ। হাতি তাড়া করে আসে।

—বাঘ কখনও তাড়া করে নি?

—না বাবু, বাঘ কিছু বলে না।

—আর কি জানোয়ার দেখেচিস?

—ভালুক আছে, ভালুকও বড় খারাপ। কখন যে ঘাড়ে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া সাপ আছে।

—কি সাপ?

—শঙ্খচূড় সাপ আছে, মানুষকে তেড়ে কামড়াবে। ময়াল সাপ আছে, খুব মোটা, সেও মানুষকে ধরে। আমরা ময়াল সাপের মাংস খাই, বেশ ভাল মাংস।

সেই বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে আমাদের এত ভাল লাগছিল যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শাল পাতার পাত্রে ফেনসুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারিতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবনধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্যে আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসছে, এসময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একটা বড় সাপের কথা জানি।

আমি বললুম—কি সাপ?

—পাইথন। আমার অধীনস্থ এক কর্মচারি একবার পাহাড়ি ঝর্ণায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শুনলেন জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় করে শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখলেন একটা প্রকাণ্ড পাইথন সাপ। একটা ছোট হরিণকে প্রায় অর্ধেক গিলে ফেলেছে।

—তারপর?

—তারপর তিনি বনের মোটা লতা দিয়ে সাবধানে সাপটাকে বাঁধলেন। স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে সকলকে সংবাদ দিতেই কুলি ও ফরেস্ট গার্ডের দল হই হই করে গিয়ে সাপটাকে জখম করলে। তখন কিন্তু তারা ভেবেছিল যে সাপটা মরেই গেল। বিকেলের দিকে নিকটবর্তী বন্যগ্রাম থেকে হো-অধিবাসীরা সাপের মাংস নিতে এসে দেখে মৃতপ্রায় সাপটা সেখান থেকে দৌড় মেরেছে। ওদের জান বড় কড়া। সাপটা লম্বায় প্রায় দশ ফুট ছিল।

—আপনি কত বড় সাপ দেখেছেন?

—পালামৌ-এর জঙ্গলে একবার আঠার ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ এক পাহাড়ি জঙ্গলের ঝর্ণার ধারে গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। পাইথন সাপরা সাধারণত ঐ জায়গাতেই থাকে। হরিণ বা খরগোস জল খেতে এলে ঝপ্ করে তাদের উপরে পড়ে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হাড়গোড় চূর্ণ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। অনেক সময় সম্বর হরিণকেও রেহাই দেয় না।

—মানুষ দেখলে কিছু বলে?

—সাবধান না থাকলে একা মানুষকেও ছাড়ে না। আমি জানি উড়িষ্যার জঙ্গলে একবার একজন কাঠুরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি কাটতে গিয়েছিল, গুঁড়িটার চারপাশে বড় বড় বন ছিল, বাইরের থেকে কিছু দেখা যায় না। কাঠুরেটা যেমন সেখানে গিয়েছে অমনি একটা প্রকাণ্ড পাইথন ওর একখানা পা জড়িয়ে ধরে ওকে ফেলে দিলে, তারপর লেজের প্রান্ত দিয়ে গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ওর সর্বদেহে কুণ্ডলীর আকারে জড়াতে লাগল। ভাগ্যে ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল কিছুদূরে। ওর চিৎকারে তারা এসে পড়ে সাপটাকে মেরে ফেলে। দু-তিন মাস ভোগবার পরে লোকটা বেঁচে যায়। আমি শুনেছি চল্লিশ ফুট পর্যন্ত সাপ এ জঙ্গলে দেখা গিয়েছে। ঝর্ণার ধারে গাছের উপরেই এ জাতীয় সাপ সাধারণত বাস করে, কারণও ওখানেই ওদের শিকারের সুবিধা।

ক্রমে রাত্রি গভীর হলো, নানা প্রকার সাপ ও বাঘের গল্প শুনে আমাদের মনে একপ্রকার অস্পষ্ট রহস্যময় ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা সভ্য জগতের অধিবাসী, অন্ধকারময় বনানীর দৃশ্যও আমাদের নিকট গম্ভীর ও সুন্দর বটে, কিন্তু এ অনুভূতিও জনিয়ে দেয় যে এ আমাদের পক্ষে বিদেশ। এখানে বুধ্নি কুই-এর মত হো মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে বিচরণ করতে পারে, বন্য কার্পাস থেকে মোটা কাপড় বুনতে পারে, এরা কন্দমূল ফল আহরণ করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে পারে, এরা করন্জা মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করে তেল তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমরা সঙ্গে করে সভ্য খাদ্যআনলে এখানে তিন দিনও বাঁচবো না। তাছাড়া এসব বনে পাহাড়ি ঝর্ণার জলে স্নান করা বা ঝর্ণার জল পান করা আদৌ নিরাপদ নয়। ম্যালেরিয়ার ভয় যথেষ্ট আছে। বন-বিভাগের কর্মচারিরা বাঁধা নিয়মে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন প্রত্যহ খান, তবুও ম্যালেরিয়ায় ভোগার কথা ওঁদের কাছেই শুনেছি। অথচ এই সবের মধ্যেও নরনারীর সুন্দর স্বাস্থ্য, উচ্ছল জীবনানন্দ দেখে হিংসা হয়। জ্বরজাড়ির নামও ওরা শোনেনি। কুইনাইন চক্ষেও দেখে নি। বিনা নুনে ও বিনা তরকারিতে মোটা চালের ভাত ও জঙ্গলের কন্দমূল খেয়ে অমন স্বাস্থ্য কি করে হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অরণ্যের রহস্য অরণ্যের গোপন অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন থাকুক—আমরা শীতের রাতের শয্যা আশ্রয় করি।

পরদিন সকালে উঠে আমরা আবার মাছ-ধরার বাঁধে গিয়ে বসলাম। কত কি বন্যপক্ষীর কূজন, বনপুষ্পের সুবাস এই স্থানটিতে, সত্যই বড় ভাল লাগে। কাল রাত্রে হয়ত আমরা যেখানে বসে আছি, সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জল খেতে এসেছিল। কংক্রিট বাঁধানো না হলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন থাকতো। আমাদের সাড়া পেয়ে একটা বনমোরগ কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের ঝিলিক খেলে উড়ে গভীর বনান্তরালে অদৃশ্য হোল।

আমি আবার বললুম—এখানে নাইবো?

মিঃ সিংহ বললেন—নাইলেই জ্বর হবে। এসব জল দেখতে ভাল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অব্যবহার্য। হিমালয়ের যে কোনো ঝর্ণার জল সুপেয় ও নিরাপদ—কিন্তু এখানে তা নয়। আমি যখন প্রথম বনবিভাগের কাজ করতে আসি, অনভিজ্ঞতার দরুন এই সব বন্য নদীর স্বচ্ছ জল নির্বিচারে পান করতাম। ফলে ম্যালেরিয়া প্রায়ই হোত। পোড়াহাট ও সারেন্ডা ফরেস্ট ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত।

আমি বললাম—আপনি কবে বন-বিভাগের চাকরিতে যোগ দেন?

—১৯২৫ সালে। প্রথম যেদিন জঙ্গলে চাকরি করতে আসি, আমি তখন অনভিজ্ঞ যুবক। সবে বি.এসসি. পাশ করেছি পাটনা কলেজ থেকে। আরা জেলায় আমার বাড়ি, বনের কোনো ধারণা নেই, আমাদের দেশে দু-দশটা আম গাছ ও মহুয়া গাছের সমষ্টিকে বন বলে। বিন্ধ্যাচলে একবার গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে, সেখানে সামান্য কিছু বন দেখি—তখন তাই আমার কাছে নিবিড়তম অরণ্য।

আমি কখনও বিন্ধ্যাচলে যাইনি, আমার বন্ধু বিভূতি মুখুজ্যে সেখানে গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছিলাম বিন্ধ্যাচলের মাথায় খুব জঙ্গল, সেখানে হরিণ ইত্যাদি চরে। সুতরাং আমি বললাম—কেন, শুনেছি সেখানেও বেশ বন আছে।

মিঃ সিংহ বললেন—সে এক ধরনের বন। এর তুলনায় কিছুই নয়। আমি প্রথম চাকুরি নিয়ে যাই সারেন্ডা ফরেস্টে। সে বন এর চেয়েও ভীষণ। ৪০০ বর্গমাইল অরণ্যানী, তার মধ্যে খানকয়েক বন্যগ্রাম আছে। বন-বিভাগের কাজকর্মের মজুরের জন্যে গবর্নমেন্ট জমি দিয়ে লোক বসিয়েছে। না দেখলে সে বিরাট অরণ্যের ধারণা হয় না।

—তারপর? আপনার অভিজ্ঞতা বলুন শুনি।

—সে এক গল্প। এখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিই চলুন। আজ আমাদের চিটিমিটি যেতে হবে। বৌদিদি তৈরি হয়ে নিন।

—চিটিমিটি কতদূর?

—এখান থেকে ৪০/৪৫ মাইল পাহাড় ও বনের পথ। সকাল সকাল বেরুতে হবে। পথে আমার প্রথম চাকুরি জীবনের গল্প করতে করতে যাবো—আপনাদের লেখার খোরাক হবে।

বেলা দুটোর পরেই আমরা জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে মোটরে উঠিয়ে রওনা হলাম।

চিটিমিটি যাবার পথে মোটর পাহাড়-জঙ্গলের পথে এঁকে বেঁকে নামতে লাগলো বামিয়াবুরু থেকে। আমরা চলেচি—চলেচি—ক্রমাগত চড়াই-উতরাইয়ের পথে।

এক জায়গায় পাহাড়ের নিচে বাঁ-দিকের উপত্যকায় বন-বিভাগের 'রক্ষিত ভূমি'—এর রহস্য হচ্ছে এই যে, এই জায়গাতে প্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ইচ্ছামত বাড়তে। প্রকৃতির উপর কলম চালানো হয় নি। তাই এখানে বড় বড় ৮/১০ ফুট পরিধিবিশিষ্ট শালগাছ যথেষ্ট—মোটা মোটা লতায় লতায় জড়াজড়ি, গাছপালার নিচেও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছোট গাছগাছালির।

আমরা পাহাড়ের গায়ে আবার দেখলুম খনিজ লবণের স্তর, বন্য জানোয়ার ছাড়া এ নুন কেউ ব্যবহার করে না। হরিণ, ভালুক, বাঘ এই তিনটি জন্তু বিশেষ করে। হাতিরা নুন খাওয়া দরকার বিবেচনা করে না কেন তা জানি না। অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো যখন বাঁকাভাবে এসে পড়ে এই খনিজ লবণের স্তরে, শাল অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে, তখন দলে দলে মৃগযূথ আসে নির্জনে লবণের স্তর চাটতে, তাদের সে আনন্দলীলার ছবি হয়তো কবি ভবভূতি আঁকতে পারতেন যিনি প্রস্রবণ-পর্বতের গম্ভীর মহিমা বর্ণনা করেচেন উত্তর-রামচরিতে। অতীত দিনের ভারতবর্ষের কি অদ্ভুত রূপ কল্পনায় ভেসে ওঠে এই পর্বতারণ্যের মধ্যে দাঁড়ালে।

হরদয়াল সিংকে বললাম—আপনারা এখান থেকে নুন বিক্রি করেন না?

—না। ওটা বন্যজন্তুদের ব্যবহারের জন্যই।

—গবর্নমেন্টের বন্দোবস্ত?

—নিশ্চয়। এখানে শিকার করা নিষেধ।

—কি রকম?

—পূর্বে এরকম হয়েচে। হরিণ নুন খেতে এসেচে দলে দলে, শিকারীদের মাহেন্দ্রসুযোগ। লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।

—নিষ্ঠুরতার কাজ বই কি।

এখন বনের সমস্ত salt lick-এ গবর্নমেন্টের খরদৃষ্টি। বন্দুক নিয়ে যাবার জো নেই।

মোটর থামানো হোল। মিঃ সিং বললেন—চলুন, দেখবেন কত জানোয়ারেরপায়ের দাগ—

যেখানে পাহাড়ের গায়ে salt lick, তার নিচে জানোয়ারদের চরবার সুবিধের জন্যে বা দাঁড়িয়ে নুনের স্তর চাটবার জন্যে বন-বিভাগ থেকে পাথর কেটে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নরম সাদা মাটিতে সত্যিই অনেক জন্তুর পদচিহ্ন।

হো-জাতীয় ফরেস্ট গার্ড বললেন—হরিণের পায়ের দাগই বেশি, ভালুকেরও আছে—কোঙরার আছে—

আমি বললাম—কোঙরা কি?

মিঃ সিং বললেন—বার্কিং ডিয়ার—

—কত বড়?

—একটা বড় খাসি ছাগলের মত। বামিয়াবুরুতে সেদিন রাত্রে যার ডাক শুনেছিলেন—

ফরেস্ট গার্ড বললে—বাঘের পায়ের দাগ একদম দেখছি না হুজুর।

আরও মাইল সাতেক গিয়ে আমাদের গাড়ি সমতলভূমিতে নামলো। সেখানকার আরও মনোহারী শোভা—বাঁ-দিকে একটা পাহাড় চলেচে—বন সেখানে তত ঘন না হোলেও বড় বড় শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ ও গোলগোলি ফুলের গাছে সমস্ত পাহাড়ের সানুদেশ ভর্তি। এই ফুলের গাছ দেখতে আমাদের দেশের গাছের মত—অথচ প্রথম বসন্তে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র শ্বেতাভ বৃক্ষগুলিতে যখন সূর্যমুখী ফুলের মত বড় বড় ফুল ফোটে—কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে, মেঘশূন্য নীল আকাশের তলায়, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে কোন্ সৌন্দর্যের মায়ালোকের মধ্যে মনকে একেবারে তলিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে যায় যেন!

যতদূর যাই, সমতলের শোভা আর একরকম। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বন তাদের ঢাকে নি, কোথাও দু-এক ঝাড় পাহাড়ি বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে নেমে নদী চলেচে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে;কোথাও দু-একটি বন্যগ্রাম—

আমার স্ত্রী ক্রমাগত বলছেন—আহা, বেশ জায়গা, দ্যাখো দ্যাখো কেমন ঐ গাঁ-খানা পাহাড়ের কোলে—এখানে একটা বাড়ি করলে হয় না?

আবার কিছুদূর গিয়ে—

—দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর ঝর্ণাটি, বাঁশবন—এখানে একটা বাড়ি করলে হয়—

ডজন খানেক জায়গায় বাড়ি তৈরি করবার পরামর্শ শুনে শুনে মিঃ সিং বললেন—কিন্তু একটা ব্যাপার মিসেস ব্যানার্জি—বাড়ি তো অনেকগুলো করবার প্রস্তাব করলেন—এসব জায়গায় বাস করতে পারবেন?

আমার স্ত্রী বললেন—কেন?

—খাবেন কি? রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে এ সব গাঁয়ে শুধু হো-জাতীয় লোকেরা বাস করে—দোকান-টোকান নেই—

—ওরা জিনিস কোথায় পায়?

—কোনো জিনিসের দরকার নেই ওদের—দেখেই তো এলেন বামিয়াবুরুতে—

কিন্তু আমার স্ত্রীর দোষ নেই, সত্যিই মনে হয় এখানে নানা জায়গায় শুধু বাড়ি করি আর বাস করি। কতবার আমার নিজের মনেও কি উদয় হয় নি সে কথা? বড় বাড়ি নয়, ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। পাহাড়ি বেণুবনের ছায়ায়, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশি বাজবে, পর্ণকুটিরে শুয়ে শুয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুধু শুনবো আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে!

একটা গ্রামে পাহাড়ের নিচে হাট বসেচে।

বললাম—এটা কি গ্রাম?

মিঃ সিং বললেন—ম্যাপ দেখে বলে দিচ্ছি—

মোটর থামানো হোল। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম—এই বন, পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কি জিনিস এখানে কেনাবেচা হচ্ছে দেখতে হবে বৈকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্চি, একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম তাদের কাছে।

আমার স্ত্রী বললেন—ঐ তো কালকের সেই মেয়েটি—সেই বুধ্নি কুই—

মিঃ সিং হো-ভাষায় ওদের কি বললেন। ওরাও কি উত্তর দিলে হেসে হেসে।

আমি বললাম—কি বলচে ওরা?

—বলচে, বাবুরা হাট দেখতে এলি?

—মেয়েগুলি কোত্থেকে এসেচে!

—ওরা বুধ্‌নি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব। হাট দেখতে এসেচে। জিনিসপত্র কিনুক না কিনুক ভাল সাজগোজ করে এদেশে সবাই হাটে আসবেই। হাট ওদের উৎসবের জায়গা। এখানেই সাত দিন পরে পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়—হাটের দিন ওদের কাছে একটা আমোদের দিন—

আমরা সকলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অনেক হো-নরনারী জড়ো হয়েচে। মেয়েদের চুলে প্রচুর করন্‌জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তীর ধনুক। তীর ধনুক না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথ চলে না।

বিক্রি হচ্ছে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণত বিক্রি হয়ে থাকে। বীচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুঁট্‌কি মাছ, জোঁদা অর্থাৎ নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, বাখর অর্থাৎ মহুয়ার মদ তৈরি করবার মশলা—দেখতে কদমার মত; সুন্দর সরু সীতাশাল চাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মহুয়ার তেল, করন্‌জার তেল এবং তাঁতে তৈরি মোটা কাপড় ও গামছা। এদেশে মোটা চাল তত বেশি দেখা যায় না, যত দেখা যায় সরু সাদা ধবধবে সীতাশাল চাল। পাহাড়ি পাথুরে জমি নাকি সরু ধানের পক্ষে অনুকূল।

বুধ্‌নি কুইকে জিজ্ঞাসা করা হোল—কি কিনবি রে হাটে?

সে হাসতে হাসতে বললে—কিছুই না।

—তবে কেন এসেচিস্?

—মুরগির লড়াই দেখতে।

—হ্যাঁ—এই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। দশক্রোশ হেঁটে এরা আসতে পারে মুরগির লড়াই দেখতে।

—কোথায় মুরগির লড়াই হচ্চে রে!

—হয় নি। ওই গাছের তলায় হবে। হাট ভেঙে গেলে হবে, নয়তো মুরগির লড়াই আরম্ভ হোলে হাটে কে থাকবে?

কথাটা সত্যি বলেছে বুধ্‌নি। কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিস। এর কি দাম আছে জীবনে? আসল জিনিস হোল মুরগির লড়াই। গাছের তলায় মাদল বাজচে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা দুটো লড়াইয়ের মোরগের ঝটাপটি দেখচে, টুপটাপ মহুয়ার ফুল ঝরে পড়চে ওদের মাথায়, আশেপাশে সামনে দূরে নীল শৈলমালা...

জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-মুহূর্ত।

এদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার বিষয় বটে।

কি জানি হয়তো চক্রধরপুরের নিকটবর্তী অরণ্যে শৃঙ্গানপুরের গিরিগুহার চিত্রাবলী এদের পূর্বপুরুষেরা এঁকেছিল কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগে!

আমার স্ত্রী নারীসুলভ বস্তুপ্রিয়তা প্রদর্শন করে বললেন—একখানা নক্‌শা করা চাদর কিনবো—

আমি চাদর ক্রয়ের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখালুম অবিশ্যি, কিন্তু কিছুই খাটলো না।

আবার আমরা পথে বেরুই। এবার কি বেজায় ধুলো শুরু হোল। স্টিয়ারিংয়ের তলাকার কোন্ ফাঁক দিয়ে ফোয়ারা থেকে জল বেরুবার মত ধুলো ঢুকতে লাগলো।

আর একটা বন্যগ্রাম ও পথের পাশে তাদের মৃতদের উদ্দেশে প্রোথিত প্রস্তররাজি। এইগুলো যেখানেই দেখি, সেখানে প্রায়ই থাকে একটা প্রাচীন বট বা মহুয়া গাছ। পাহাড়ের পাশে যদি হয় মনে কেমন এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে আসে।

এমনি এক সমাধিস্থানের বর্ণনা করেছি আমার লেখা 'আরণ্যক'-এ। সে স্থান গয়া জেলার প্রান্তে, দক্ষিণ-বিহারের শৈলমালার নিবিড়তম অভ্যন্তরে অবস্থিত—অথচ আজ সেই সব দৃশ্যের কথাই আমার মনে আবার নিয়ে আসে এই বন্যগ্রাম ও এদের সমাধি প্রস্তরের চৌরস সারি।

তিনটি বন্যগ্রাম পার হয়ে তবে চিটিমিটি। গ্রামগুলির নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আমার স্ত্রী একটি ছড়া তৈরি করলেন—

আগে হোল পেটাপেটি

বাঁকে, রুয়াউলি, করজুলি

তারপর চিটিমিটি—

এর কবিত্ব প্রশংসনীয় না হোলেও, নামগুলো মনে রাখার সুবিধে হয়। যেমনমুখস্থ করেছিলুম কোন্ ছেলেবেলা—

ষোলশ সাতাশ অব্দে জাহাঙ্গীর ম'ল

সাজাহান ভারতের বাদশাহ হোল—

এখন কত উপকার দেয়!

বেলা চলে যাচ্চে, এমন সময় উপরোক্ত ছড়ার প্রথম গ্রামটির মধ্যে গাড়ি ঢুকলো। এবার ধুলো-ভরা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথে উঠচি, একটা পাহাড়ের ওপারেই পেটাপেটি গ্রাম। এখানে যদি বা বাড়ি করে বাস করবার লোভ সম্বরণ করা চলে, কিন্তু পরবর্তী তিনখানি গ্রামের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষকে সভ্য জগতের কথা একেবারে ভুলিয়ে দেয়।

আমি এই সময় মিঃ সিংহকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার চাকরি-জীবনের প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতাটার কথা বললেন না?

—চলুন, চিটিমিটি বাংলোতে বসে চা খেতে খেতে আরাম করে শুনবেন। সে সত্যিই শোনাবার মত বটে—

—কোনো বন্যজন্তুর হাতে পড়েছিলেন?

—ঠিক সে ভাবের নয়, তবে পড়লে বিস্মিত হবার কারণ ছিল না।

এমন একটা উঁচু জায়গা দিয়ে আমাদের মোটর যাচ্চে যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকা-বাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্ছি—কখনও শৈলগাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে, আবার কখনও দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেচে আগে আগে।

বাঁকে গ্রামখানির দুদিকে পাহাড়, সামনে ক্ষুদ্র একটি পার্বত্য নদী বয়ে চলেছে কুলু-কুলু শব্দে। পাহাড়ের ওপরে বন্যবাঁশের বন, শালবন, শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ। যার কোথাও বাড়ি করবার প্রবৃত্তি হয় না—নিতান্ত আরব বেদুইনের মত যে ছন্নছাড়া ও ভ্রাম্যমাণ—তারও অভিলাষ জাগবে মনে, ঐ পাহাড়ি ঝর্ণার পাশে কিছুদিন বাস করি!

রুয়াউলি।

সাদা কোয়াৎর্জ পাথরের ridge একদিকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়—অধিত্যকার মাঝে মাঝে শালবন। পাহাড়ের গায়ে রোদ পড়ে বেশ দেখাচ্চে।

করজুলি।

দূরে একটা গ্রাম দেখচি থাকে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেচে করজুলিতে হো-অধিবাসীদের ঘরগুলি শালপাতায় ছাওয়া, রাঙামাটির দেওয়াল, পাহাড়ের গম্বুজ উঠেচে দূরের কালো বনরেখার ওপরে; জ্যোৎস্নারাত্রে এই গ্রামগুলি মায়াময় হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারচি।

বেলা যাবার দেরি নেই—পশ্চিম দিগন্তে দূর বরকেলা শৈলশ্রেণীর ওপরে সূর্য ঝুঁকে পড়েচে। এমন সময় মোটর আবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে শুরু করলে।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই দেখুন চিটিমিটি বাংলো থেকে দেখা যাচ্চে পাহাড়েরমাথায়—ওখান থেকে ওপারের সমতলভূমির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়—

একটু পরে বনপথে উঠে আমাদের গাড়ি একটা ছোট বাংলোর সামনে দাঁড়ালো।

চিটিমিটি বাংলোটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট বাংলো, অনেক নিচে সমতল ভূমি, সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট। কার্সিয়াং থেকে নিচের দিকে যেমন সমতল ভূমি দেখা যায়, অনেকটা তেমনি দৃশ্য। পেছন দিকে পাহাড়ের নিচে উপত্যকার বনের আড়ালে করজুলি গ্রামের হো-অধিবাসীরা মাদল বাজিয়ে গান ধরেছে। বাংলোর মধ্যে ঢুকে দেখা গেল অনেকদিন এখানে কেউ না আসার দরুন আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় নেই। দুটিমাত্র ছোট ঘর। রাত্রে এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা।

হরদয়াল সিং প্রস্তাব করলেন, এই রাত্রেই চাঁইবাসা ফেরা যাক।

এই বরকেলা শৈলমালার বিপজ্জনক নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে মোটর রোড ঘুরে ঘুরে নিচের সমতলভূমিতে নেমেচে। অন্ধকারের মধ্যে সে পথে মোটরে যাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। অগণন জোনাকিপুঞ্জ জ্বলছে গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়। দশ-বিশ হাত অন্তর ফাঁকা। একপাশে গভীর খাদ। তার পরেই বনাবৃত উপত্যকা! ওপারে একটা বেজায় উঁচু পাহাড় খাড়া উঠেচে। মোটর খুব জোরে চলতে পারচে না।

আমি বললুম—কোনো বিপদ নেই তো?

হরদয়াল সিং বললেন—বুনো হাতি ছাড়া।

—বুনো হাতির হাতে পড়েচেন এমন অবস্থায়?

—একবার পড়েছিলুম। এই সংকীর্ণ পথে এমন অন্ধকারে।

—বলেন কি?

—মোটরে যাচ্চি, হাতি সামনে এসে দাঁড়ালো—আর নড়ে না। মোটর ফেরাবার জায়গা নেই। অগত্যা মোটর থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতি পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়তে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে কেন যে চলে গেল তার কারণ কিছু বলতে পারবো না। সমস্ত রাতও দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সব পথে বিশ্বাস নেই। পরের বাঁকেই হাতি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বরকেলা পাহাড়ে হাতির বড় উপদ্রব।

আমরা পাহাড়ের পথে নামছিলুম। আশেপাশে ঘনীভূত অন্ধকার। নির্জন অরণ্যপথ—গাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে আমরা চার-পাঁচটি প্রাণী, কোনোদিকে লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না, দূরে বা নিকটে আলো কোথাও জ্বলে না—কেবল নৈশ আকাশে অগণন ঝক্‌ঝকে নক্ষত্ররাজি, গাছের ডালে ডালে জোনাকির ঝাঁক, গাড়ির মধ্যে দু-একটা জ্বলন্ত সিগারেটের ক্ষীণ দীপ্তি।

গল্প যদি শুনতে হয় তবে এই সময়।

আমি বললুম—চা আছে ফ্লাস্কে?

মিঃ সিংহের আরদালি বললে—আছে হুজুর।

আমি প্রস্তাব করলাম—গাড়ি একটা ভাল জায়গা দেখে থামিয়ে চা খাওয়া এবংকিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। এই সময়ে মিঃ সিংহ তাঁর প্রথম চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। গল্পটা মুলতুবি রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

আরও পনেরো মিনিট পরে বাঁদিকে একটা বড় শিলাখণ্ড পাওয়া গেল, যেন শান-বাঁধানো চাতাল। এর পাশে আমাদের গাড়ি থামানো হোল। বেশ আরামে বসে চা খাওয়া গেল পাথরের চাতালে বসে। পাশের খাদে যেন একরাশ নিবিড় অন্ধকার জমে। দু-একটা নৈশ পাখির ডাক বনের মধ্যে। মিঃ সিংহ বললেন—সে হোল ১৯২২ সালের কথা। সেবারে আমি প্রথম বনবিভাগে ট্রেনিং-এ গেলাম। অর্ডার পেলাম, পোংসাতে গিয়ে বনবিভাগের কর্মচারির কাছে কাজ শিখতে হবে।

—পোংসা কোথায়?

—যখনকার কথা বলছি, তখন আমিও জানতাম না। শুধু এইটুকু আমায় বলে দেওয়া হয়েছিল, বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের মনোহরপুর স্টেশনে নেমে সেখানে যেতে হয়।

—কত মাইল?

—ষোল-সতেরো মাইল।

—রাস্তা ভাল?

—সেইটাই আমার গল্পের বিষয়। এ গল্প প্রধানত রাস্তার গল্প। আজ এই অন্ধকার রাত্রে বনের পথে সে কথা বড় বেশি করে মনে হচ্ছে। শুনুন তারপর। মনোহরপুর স্টেশনে নেমে ওখানকার বন-বিভাগের বাংলোতে লোকজনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদেরই মুখে শুনলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে ১৫/১৬ মাইল দূর। বেলা তিনটা। আমার সঙ্গে সাইকেল ছিল, দেশ থেকে এক পাচক ঠাকুরও এনেছিলাম। আমি ভাবলাম, এ আর এমন বেশি দূর কি! সাইকেলে চট করে চলে যাওয়া যাবে! কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম বাধা হোল পাচক ঠাকুর। সে পথ চেনে না। একা এ পথে যেতে পারবে না। অগত্যা আমরা কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে পদব্রজে কইনা নদী পার হয়ে ওপারে গেলাম। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকালই ভালবাসি, নীল পাহাড়শ্রেণী দেখে মনে বড় আনন্দ হোল। ওখান থেকে যেতে পথের ধরে ধারে দু-দশটি শালগাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়, তার ওপর গাছপালা। আমার বন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই পূর্বেই বলেছি। বিন্ধ্যাচলে বন দেখে ভেবেছিলাম এই বুঝি নিবিড় অরণ্য। এর চেয়ে আর কি বড় বন হতে পারে? আমার দেশ আরা জেলায়, বন বলে কোনো জিনিস নেই, শুধু ক্ষেতখামার আর চষা জমি। জমির বড় দাম, এতটুকু পড়তে পায় না।

আমি বললাম—কত দাম জমির?

—পাঁচ-ছশো টাকা বিঘে। তাও ভাববেন না খুব ভাল জমি।

—তারপর?

—তারপর মাইল পাঁচেক পথ এসে কোল বোংসা বলে একটা ছোট গ্রাম।হো-জাতীয় অধিবাসীদের বাস। সেখানে এসে কুলিরা আর যেতে চাইলে না। তারা বললে সে গ্রামেই তাদের বাড়ি। আর এক পাও তারা নড়বে না, তাদের মজুরি চুকিয়ে দেওয়া হোক। অগত্যা আমাদের সেখানে রাত কাটাতে হোল গ্রামের প্রান্তে বন-বিভাগের একটা ছোট খড়ের ঘরে। ঘরটাতে কেউ থাকে না, ঘরের চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ, সারা রাত্রি ধরে শিশির পড়তে লাগলো, যেন মনে হচ্ছিল, টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা ছিল কার্তিক মাস।

—খেলেন কি?

—আমার পাচক ঠাকুর দুটি ভাত রান্না করলেন, তাই খেয়ে শুয়ে পড়ি। পরদিন সকালে উঠে জিজ্ঞেস করে জানলাম পোংসা সেখান থেকে দশ মাইল রাস্তা। পাচককে বললাম, কুলি জোগাড় করে আমার পরে পোংসা রওনা হতে। আমি তখনই সাইকেলে চললাম। ঠাকুর বারণ করলে তখন যেতে। আমি বললাম—বন তো ফুরিয়ে গিয়েছে।এ রাস্তা বিশেষ খারাপ হবে না। বন যে আরম্ভ হয় নি তখন কি তা জানি?

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—পোংসাতে আমিও ছিলাম ট্রেনিং-এর সময়। দেরাদুনে ফরেস্ট কলেজে যাওয়ার পূর্বে। ওখানে বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানির আপিস ছিল সে সময়।

মিঃ সিংহ বললেন—কোল-বোংসা থেকে মাইলখানেক রাস্তা বেশ বন পেলাম। কিন্তু নিকটেই গ্রামের গরু মহিষ চরছে কাঠুরে কাঠ কাটচে, সুতরাং তত ভয় হবার কথা। নয়। তারপরে মহাদেবশাল বলে একটা ঝর্ণা পার হলাম, নিবিড় বনের মধ্যে ঝির ঝির করে বইছে পাথরের ওপর দিয়ে। ভাবলাম, বন আর কতদূর হবে? এই শেষ হয়ে গেল। ক্রমে পাহাড়ের ওপর রাস্তা উঠতে লাগলো, উঠচে, উঠচে, সাইকেলে যেতে যেতে পা ভেঙে পড়চে, বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্চে, এদিকে বন ক্রমশ নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে লাগলো। জনমানবহীন সুনির্জন সুনিবিড় বনানী সেই ক্রমোচ্চ পাহাড়ি পথের পাশে। আরা জেলার অধিবাসী আমি, অমনতর বনের ধারণাই নেই আমার। ভয়ে বিস্ময়ে আমি কেমন হয়ে গেলাম। একটা মানুষ কি নেই সেই পথে?যত যাই পথেরও কি শেষ নেই? অত বেলা হয়েছে কিন্তু সে বনে ভাল করে কখনও সূর্যের কিরণ পড়ে নি। এ রকম আবার বন হয়!

আমরা যেখানে পাথরের চাতালে বসে গল্পটা শুনছিলাম, বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সানুপ্রদেশের বনানীর মধ্যে সেখানে অন্ধকারে চারিদিকে, যেন মিঃ সিংহের এ অভিজ্ঞতা নিজেদের কাছেই বাস্তব হয়ে উঠেছিল। এ গল্প শুনতে হয় এমন জায়গাতে বসেই বটে!

মিঃ সিংহ বললেন—তারপর এক জায়গায় আমার সত্যিই মনে হোল পোংসা নামক জায়গাতে বেঁচে থাকতে আর বোধ হয় পৌঁছবো না। তখন নতুন বিয়ে করেছি। মনে হোল এখানে বসে পকেটের কাগজ নিয়ে একটা উইল লিখে রাখি। এই যেন হাতি কি বাঘ এসে ঘাড়ে পড়লো বলে। আর কোনো আশাই নেই। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে মনের জোরে পথ চললাম। অবশেষে বন ক্রমে যেন একটু পাতলা হয়ে গেল।একটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট বাংলো পাওয়া গেল। লোকালয় দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তখন বেলা তিনটে। জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে আরও মাইল কয়েক। কোল-বোংসায় যে বলেছিল দশ মাইল, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। আবার বন। তবে আমার মনে অনেকখানি ভরসা হয়েছে।

আমি বললাম—কখন পৌঁছলেন—

—প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওপরওয়ালা কর্মচারি ছিলেন এক পাঞ্জাবী, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বাসা দিলেন, প্রায় আধ মাইল দূরে এক ছোট্ট খড়ের ঘরে। সারাদিন সাইকেল চড়ার পরিশ্রমের পরে সেই ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর বিনা বিছানাতে বিনা লেপে শুয়ে রইলাম। দুর্দান্ত শীত। অনেক রাত্রে পাঞ্জাবী কর্মচারির চাকর আমায় খানকতক রুটি আর একটু ডালদিয়ে গেল। পরদিন দুপুরের সময় আমার পাচক এসে পৌঁছুল আমার জিনিসপত্র নিয়ে। সে নাকি ঐ রাস্তায় একটা বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। বিচিত্র নয়!

মিঃ সিংহ গল্প শেষ করলেন। আমরা আবার মোটরে উঠে সৈদবার পথে বরকেলা পাহাড়শ্রেণী থেকে নেমে এসে রাঁচি-চক্রধরপুর রোড ধরলাম। রাত দশটায় চাঁইবাসা।

আমি বললাম—পোংসায় আর কিছু ঘটে নি আপনার চাকরির প্রথম দিনে?

মিঃ সিংহ বললেন—আর বিশেষ কিছু নয়, তবে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। কেবল ভাবি, যেমন বন-জঙ্গল দেখচি, হয়তো বাঘ-ভালুক ঢুকেই পড়বে ঘরের মধ্যে। তার উপর ভীষণ শীত, আমার সঙ্গে একখানা মাত্র আলোয়ান এবং সেই একমাত্র শীতবস্ত্র।এত অসুবিধের মধ্যে ঘুম যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হয়েছিল।

—কোথায় শোবার জায়গা দিয়েছিল?

—একটা ছোট্ট ঘরে। তার একদিকে জঙ্গল ও ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ি ঝর্ণা। গ্রাম থেকে সিকি মাইল দূরে।

এ সব প্রশ্ন সেদিন অত খুঁটিনাটি ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম এবং তার উত্তর এত আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম যে, গৃহ ও পরিবারবর্গের অঙ্ক থেকে সদ্যবিচ্যুত একটি অনভিজ্ঞ যুবকের সেই দিন ও রাত্রির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং পথের পাশে অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় চা-পানের পরের বৎসর আমি নিজে যখন মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে মনোহরপুর থেকে কোল-বোংসা হয়ে পোংসা এলুম, এমন কি ছোটনাগ্‌রা গ্রামের সেই কুঁড়েঘর দেখলুম যেখানে মিঃ সিংহ রাত কাটিয়েছিলেন—তখন আমার কল্পনায় অঙ্কিত সব ছবির সঙ্গে এত গরমিল হোল যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম।

গত ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি মিঃ সিংহের সঙ্গে সিংভূমের বিখ্যাত সারান্ডা ফরেস্ট ভ্রমণ করি। মিঃ সিংহ তিন মাসের জন্যে সারান্ডা বিভাগে বদলিহয়েছিলেন, আমিও ঐ দুই মাসের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে ওঁর সঙ্গে সারান্ডা ভ্রমণে বের হই।

মনোহরপুর থেকে মোটর ছেড়েই আমরা কইনা বলে একটি পার্বত্য নদী পার হলুম।

তারপর রাঙা মাটির আঁকা-বাঁকা পথ এঁকে-বেঁকে যেতে যেতে সাত-আট মাইল দূরবর্তী সপ্তশত শৈলযুক্ত সারান্ডা (Saranda of seven hundred hills) অরণ্যপ্রান্তরের নীল রেখার সঙ্গে মিশে গিয়েচে, পথের পাশে এখানে একটা ডুংরি (অনুচ্চ পাহাড়), ওখানে একটা ছোট শালবন, কোথাও বা একটা হো-অধিবাসীদেরগ্রাম।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সেই পথ, মনে আছে আমার গল্প?

আমি তখনও পর্যন্ত বন দেখি নি সে পথে। বললাম—কেন, এ পথ মন্দ নয় তো?

মাইল ছ-সাত পরে কোল-বোংসা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। উনি বললেন—চলুন, এ গ্রামে যেখানে রাত্রিযাপন করেছিলাম দেখিয়ে আনি।

মোটর থেকে নেমে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর ক্ষুদ্র একটি কুটিরের সামনে এক বৃদ্ধ লোক খামারে ধান ঝাড়চে, কুমড়োর লতা উঠেচে কুটিরের খড়-ছাওয়া চালের ওপর; কুটিরের দাওয়া থেকে সম্মুখের সারান্ডা-বনকান্তারের শৈল-শ্রেণীর গম্ভীর দৃশ্য হিমালয়ের পার্বত্যভূমির সৌন্দর্যের কথাস্মরণ করিয়ে দেয়।

হিংসে হোল বৃদ্ধ ব্যক্তিটির ওপর, এমন সুন্দর জায়গায় ওর বাড়ি।

মিঃ সিংহ তাকে বললেন—কি জাত?

লোকটা বললে—'গোঁসাই'। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এ দেশে ব্রাহ্মণকে বলে'গোঁসাই'। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, ওর গলায় মলিন পৈতা ঝুলচে বটে।

সে পাহাড় থেকে আমরা ওপারের সমতলভূমিতে নেমে আসল গ্রামে পৌঁছুলাম।

গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা কুঁড়েঘর দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন—এই ঘরে সেদিন রাত কাটিয়েছিলাম।

কুটিরটির চারধারে বড় বড় শালগাছ, একটু দূরে একটা কালো পাথরের ডুংরি অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। সে পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের (Butea superba) জড়াজড়ি। বসন্তকালের রক্তপলাশের মেলা যখন শুরু হয়ে যাবে বনে বনে, তখন যে কোনো কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকের পক্ষে কিংবা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন সাধুর পক্ষে এই নিভৃত বনকুঞ্জবর্তী কুটিরটি অতি লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

কোল-বোংসা গ্রামে বাস করে হো-জাতীয় অধিবাসীরা, ঘরদোর তাদের অত্যন্ত খারাপ—নিতান্ত দীনহীন, কিন্তু তারা এক রমণীয় পার্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্বদা থাকে, ওদের কুটিরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা ও বনকান্তারের কি শোভন রূপটিইচোখের সামনে ফুটে ওঠে। অনেক বড়লোকের বাড়ি হয়তো কোনো এঁদো গলির মধ্যে এক ইটের স্তূপ মাত্র, দরজার একপাশে দেখা যাবে ডাস্টবিন; গোটাকতক কাক আর খেঁকিকুকুর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্চে—এমন নীল বনানীর শোভা, এমন রক্তপলাশের উৎসব সেখানে কোথায়?

কোল-বোংসা গ্রাম ছেড়ে মহাদেবশাল বলে একটি পার্বত্য নদী নিবিড় বনের মধ্যে বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেচে। নিভৃত ছায়াবিতান রচনা করেচে সারাণ্ডা অরণ্যপ্রান্ত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে মোটর উঠতে লাগলো। পরক্ষণেই কি নিবিড় বন শুরু হোল রাস্তার দুদিকে, কি দূর সমতলভূমির দৃশ্য। ওই দূরে মনোহরপুর ইস্টিশান, ওই ট্রেনের ধোঁয়া উড়চে, ওই সেই কোল-বোংসা গ্রামে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গোঁসাইয়ের কুটির ও খামার।

এক এক জায়গায় বনের গম্ভীর দৃশ্য মনে ভয়ের সঞ্চার করে, তবুও আমরা মোটরে চলচি, সঙ্গে এতগুলো লোক। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ যুবক যেদিন এই বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে একা সাইকেলে গিয়েছিল, তার সেদিনকার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলাম।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সেই পথ, দাদা।

—বেশ বুঝতে পারচি।

—এখনও কিছু দেখেন নি। আরও আগে চলুন।

চৈতন্যদেবের সেই "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"! বন কি নিবিড় হয়ে উঠেচে, কাছির মত মোটা চীহড় লতা (Bonhivia vallai) বিশাল বনস্পতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকার লতাকুঞ্জের সৃষ্টি করেচে পদে পদে, অত বেলাতেও সূর্যের আলো পড়েনি।

একটা জায়গা দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন, এখানে এসে এমন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম যে, ভাবলুম একটা উইল লিখি ও পকেটে একখানা পরিচয়পত্র রাখি।

আমি বললাম—বন্যজন্তু আছে এইখানে?

—সারান্ডাতে বন্যজন্তু নেই? বাঘ বলুন, বুনো হাতি বলুন, ভালুক বলুন—অভাব কি? বাইসন, সম্বর হরিণ পর্যন্ত। বাদ নেই কিছু।

দেড় ঘণ্টা মোটর চালানোর পর বন একটু পরিষ্কার হোল। দূরে দেখা গেল লাল টালির দু-চারখানি ঘরবাড়ি। মিঃ সিংহ বললেন—ওই হোল পোংসা—

পোংসাতে বি.টি.টি. কোম্পানির (ব্রিটিশ টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানি) বড় আড্ডা। এই কোম্পানির অংশীদারেরা হচ্ছে বিলাতের বড় লোকেরা, এমন কি পার্লামেন্টের মেম্বার পর্যন্ত আছে ওদের মধ্যে। বিদেশীর স্বার্থে আমাদের দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসরে সিংভূমের এই অপূর্ব অরণ্যভূমি অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করচে বিলাতের বড় মানুষেরা, আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।

সেই বনাবৃত স্থানে ছোট্ট একটি গ্রাম। একখানা সাহেবি ফ্যাসানের খড়ের বাংলো ঘরের মধ্য থেকে একজন সাহেব বার হয়ে এল আমাদের মোটরের শব্দ শুনে।

মিঃ সিংহ বললেন—শুনি বি.টি.টি. কোম্পানির ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার ভাল লোক।

একদিকে একটা লম্বা খড়ের ব্যারাক-মত বাড়ি। একটি বাঙালি বিধবা মহিলা একখানা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে। শুনলাম ও বাড়িখানা কেরানিদের থাকবার জায়গা। এতদূরে এই বনের মধ্যে দু-একটি বাঙালি পরিবার কি ভাবে নির্জন জীবনযাপন করচেন চাকুরির খাতিরে—ভাবতে ভাল লাগে।

মিঃ লক্‌নারের মোটর আছে, তিনি মোটরে মনোহরপুর যেতে পারেন মানুষের মুখ দেখতে, কিংবা যেতে পারেন একশ মাইল দূরবর্তী দুধিয়া ও চিড়িয়া খনিতে, সেখানে শ্বেতকায় ম্যানেজার আছেন। কিন্তু এই বাঙালি কেরানিদের বাড়ির মেয়েছেলেরা জেলে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে কিভাবে দিন কাটান, কি করে বলবো?

আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে ওই বাঙালি বাবুদের বাড়িতে চলে যাই, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ওদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিই—ঠিক বলতে পারি ওঁরাও খুব খুশি হবেন আমাকে পেয়ে।

পোংসা থেকে কিছুদূর এসে আবার আমরা ঘন বনের পথে ঢুকে পড়লুম, বাঙালি বাবুদের বাসা ও সাহেবদের বাংলো অনেক পেছনে পড়ে রইল।

মিঃ সিংহের সঙ্গে পোংসা থেকে বার হয়ে কিছু দূরে বনপ্রান্তে এসেচি, একটা লোককে খাটিয়াতে শুইয়ে চারজন কুলিকাঁধে খাটিয়াসুদ্ধ মানুষটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা বালিশ মাথা দিয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে আছে অচৈতন্যভাবে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কুলিদেরকে এ বাবু?

—বি.টি.টি. কোম্পানির লোক।

—কি হয়েছে?

—বেমার।

—কোত্থেকে আসচে?

—জঙ্গলের মধ্যে কাজ করছিল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—পোংসা। সেখান থেকে মনোহরপুর হাসপাতালে।

—বাঙালি?

—হাঁ বাবুজী।

—নাম জানো?

—চক্কটি বাবু।

বড় ইচ্ছে হোল এই রোগগ্রস্ত প্রবাসী বাঙালি ভদ্রলোককে নিজে একবার দেখি, দুটো কথা ওঁর সঙ্গে বলি। কিন্তু তিনি জ্বরে বেহুঁশ, আমারও সময় নেই।

মিঃ সিংহ বললেন—ভীষণ ম্যালেরিয়া মশাই, সারান্ডার ভেতরে।

—লোক থাকে না?

—হো যারা, তারা ভোগে না, ভোগে বিদেশীরা।

সারান্ডা ফরেস্টে পক্ষপাতিত্ব আছে বেশ!

—শুধু ম্যালেরিয়া?

—ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার।

খাটিয়াসুদ্ধ রোগী পোংসার দিকে বাহিত হয়ে চলে গেল। আমরা আরও কিছুদূর এসে উসুরিয়া নামে একটা পার্বত্য ঝর্ণা বা ক্ষুদ্র নদী পার হলুম। মিঃ সিংহ বললেন—অনেকদিন আগে গ্রেগরি বলে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বাস করতো উসুরিয়া ঝর্ণার ধারে একটা বাংলোতে—আমাকে মাঝে মাঝে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতো তার বাংলোতে। চলুন সে জায়গাটি দেখে আসি।

১৯২৫ সালে গ্রেগরি ওখনে থাকতো।

উসুরিয়া পাহাড়ি নদী। খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে দিয়ে—দুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হচ্ছে উসুরিয়া ঝর্ণার নির্মল জলধারা। অপরাহ্ণে ছায়া পড়ে এসেচে, হল্‌দে রোদ উঠেচে গগনচুম্বী তরুশ্রেণীর শীর্ষদেশে।

কতক্ষণ নদীর তীরে শিলাসনে বসে রইলুম। উসুরিয়ার কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত।

মিঃ সিংহ দেখে এসে বললেন—গ্রেগরি বাংলোর চিহ্ন নেই, সেখানে ঘোর বন।

—গ্রেগরি কি করতো এখানে?

—কোম্পানির করাতের কারখানা ছিল উসুরিয়ার পাড়ে। সাহেব ছিল কারখানার ম্যানেজার।

—কারখানা উঠে গেল কেন?

—ঠিক জানি নে। শুধু সাহেবের বাংলা নয়, কুলিদের ব্যারাক ছিল, কারখানা ঘর ছিল। দেখচি কিছুরই চিহ্ন নেই।

—১৯২৫ সালের পর এই প্রথম এলেন ১৯৪৩ সালে?

—তাই। উনিশ বছর পরে।

—"পুরা যত্র স্রোতঃ" কালিদাসের সেই শ্লোক জানেন তো? নগরী হচ্ছে বন, বন হচ্ছে নগরী। কালিদাসের কালেও তো এমন ধারাই ঘটতো। আজ দেখচেন পোংসায় বি.টি.টি. কোম্পানির আপিস, মিঃ লনার তার বড় সাহেব। দু-দিন পরে সব জঙ্গল হয়ে যাবে, বুনো হাতির ভয়ে দিনমানে মোটর চালানো দুষ্কর হবে।

এইভাবে সেদিন আমি মিঃ সিংহের গল্পে বর্ণিত পথ নিজের চোখে দেখেছিলুম। কিন্তু আমি সারান্ডা ফরেস্টের গল্প বলতে বসি নি, বলছিলাম চিটিমিটি থেকে আমাদের চাঁইবাসা ফিরবার গল্প। সেই গল্পই আবার আরম্ভ করি।

গাছতলা থেকে চা খেয়ে ও মিঃ সিংহের গল্প শুনে উঠে দেখি রাত অন্ধকার,গভীর অন্ধকার। বন্যহস্তীর ভয়ে সেই পার্বত্যপথে সাবধানে গাড়ি চালিয়ে আমরা বরকেলা শৈলমালা থেকে ধীরে ধীরে নেমে সমতলভূমির পথে নামলুম। সৈদবা কলি আমাদের ডানদিকে। এবার আর পথের ধারে গভীর খাদ নেই, সুতরাং নিরাপদ পথে দ্রুত ছুটলো মোটর।

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—ঐ সামনেই রাঁচি রোড—

একটু পরেই আমরা পিচ-ঢালা চওড়া রাঁচি রোডে এসে উঠলাম। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রোরো নদীর সেতু পার হয়ে চাঁইবাসা টাউনে প্রবেশ করলুম-রাত তখন দশটা এ কথা আগেই বলেছি।

চাঁইবাসা ফিরে ঠিক করা গেল পরদিনই আমরা জয়ন্তগড় ও চম্পুয়া যাবো এবং বৈতরণী নদীর ধারে মাঠে ও বনে আমাদের নিক্‌পিক্! প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, যে বনভোজনে বাড়ি থেকে তৈরি খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়া হয় তার নাম হোল নিক্‌পিক্—আর যেখানে রান্না করে খাওয়া হয় সেটা নিক্‌পিক্। নিক্‌পিকেরআয়োজন সম্পূর্ণ করলেন বৌমা,

সুবোধের স্ত্রী। তাঁর নিপুণ ও শিল্পহস্তের তৈরি অনেক কিছু সুখাদ্য অ্যালুমিনিয়ম লম্পুটকে ভর্তি হলো, তবে চা নাকি তৈরি হবে বৈতরণী নদীতীরের চমৎকার মাঠে ও বনের ধারে—তাই চায়ের সাজসরঞ্জাম নেওয়া হোল সঙ্গে।

আমরা জন-পাঁচেক একটা মোটরে। হাট-গামারিয়ার রাস্তায় মোটর হু হু চললো। দুধারে গ্রানাইটের অনুচ্চ পাহাড়, চাঁইবাসার আশেপাশে দক্ষিণ ধলভূমের সর্বত্র এই ধরনের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় কালো পাথুরে কয়লার একটি স্তূপ। পাথরগুলোও অনেক জায়গাতেই অমনিতর ছোট ছোট ও আলগা। পাহাড়ের ওপর শিশুগাছ (Dalbergia sishu) অনেক দেখলুম এ অঞ্চলে। শিশুগাছ সাধারণত পাহাড়ে দেখা যায় না, বনে পাওয়াও কঠিন। বাংলাদেশে যা শিশুগাছ বলে চলে, তা হোল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি রেইন ট্রি। অনেক জেলা-বোর্ডের পথের ধারে বাংলাদেশে এই জাতীয় গাছ যথেষ্ট দেখা যায়।

মিঃ সিংহ বললেন—কাছেই একটা ভাল ঝর্ণা আছে।

—কতদূর?

—রাস্তা থেকে এক মাইল। বনের মধ্যে।

—এখন যাওয়া যাবে?

—ফিরবার পথে সুবিধা হবে, এখন থাক।

এ পথে হাট-গামারিয়া একটি ভাল জায়গা। মহারাজা শ্রীশ নন্দীর চীনামাটির খনি আছে এখানে। আর একটা আছে কিছুদূরে, সেটার মালিক জনৈক ধনী মাড়োয়ারি মহাজন। ধু ধু মাঠ ও রুক্ষ গ্রানাইট পাথরের অনুচ্চ টিলার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা লোকালয়, বাজার, চায়ের দোকান, খোলার চালার দোকান-ঘর, একটি ডাকবাংলো—এই নিয়েহাট-গামারিয়া। তারপর আবার চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা সীমাহীন অনুর্বর প্রান্তরের বুক চিরে সোজা চলেছে বহুদূরস্থ কেউনঝর-স্টেটের শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। মাঝে মাঝে ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ি নদী ঝিরঝির করে বইছে। আর একটা কি গ্রাম পড়লো, শুনলুম, অনেক সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের বাস সে গ্রামে। একটা মসজিদও দেখা গেল। বন কোথাও নেই—দু-একটা শাল মহুয়া গাছ মাঠের মাঝে মাঝে।

অনেক দূর গিয়ে সামনে পড়ল একটা নদী, তার ওপর বাঁদিকে একটা ভাঙা পুল। রাস্তা বেঁকে চলে গেল নদী পার হয়ে একটা নতুন তৈরি পুলের ওপর দিয়ে। নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল গাড়ি। সুবোধবাবু বললেন—বৈতরণী পার হলেন এবার।

—বলেন কি? এত সহজে?

—তাই।

—এখন কোথায় যেতে হবে?

—তিন মাইল দূরে চম্পুয়াতে যাবো।

—সে তো কেউনঝর রাজ্যে!

—বৈতরণী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেউনঝর রাজ্যে পা দিয়েচেন।

—সীমান্ত রক্ষী-টক্ষী নেই?

—ও সবের বালাই নেই এদিকে।

আমরা একটি দৃশ্য দেখলুম—কেউনঝর স্টেট থেকে লুকিয়ে চাল এনে বিক্রি করছে গরিব চাষিরা। বৈতরণীর এপারের ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম গ্রামে গাছতলায় চোরাই চালের হাট! খরিদ বিক্রি বেশ জোর চলছে। ক্রেতা বেশির ভাগ মাড়োয়ারি মহাজন।

দূরে মাঠের মধ্যে বেশ সুন্দর একটি অট্টালিকা দেখা গেল।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই হোল চম্পুয়া ফরেস্টার্স ট্রেনিং একাডেমি।

—কেউনঝর স্টেটের?

—আমাদের গভর্নমেন্টের।

স্কুলটা আমরা দেখতে গেলুম। সাহাবাদ জেলার একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্কুলের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট। তিনি অত্যন্ত যত্ন করে মেয়েদের নিয়ে ক্লাসরুম, মিউজিয়ম, বোর্ডিংঘর ইত্যাদি দেখালেন। বড় বড় ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো ক্লাসে ক্লাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। নূতন পালিশ করা 'চেয়ার বেঞ্চ'। বেশ ভাল ব্যবস্থা পড়াশুনোর।

মিউজিয়ম সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বনের বিভিন্ন শ্রেণীর টিম্বার, লতা, বীজ, বনজাত দ্রব্যাদি দিয়ে সাজানো। এখানে প্রথম গিলে বীজ দেখলুম—গিলের সাহায্যে ধুতি পাঞ্জাবি কোঁচাতে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা কি জানতাম না। মহিষের সিং-এর মত প্রকাণ্ড এক প্রকার ফলের মধ্যে যে বীজ তাই হোল গিলে। একটা ফলের মধ্যে আটটা করে বীজ থাকে। নানা রকমের আঁশ—যা থেকে নাকি রেশমের চেয়েও ভাল কাপড় হতে পারে, তবে হয় না। মিউজিয়মের বাইরে ওসব আর কোথাও দেখা যায় না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন—আপনাদের একটু চা—

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—না না থাক, তার আর দরকার নেই। বেলা গিয়েছে।

একটু পরে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম জয়ন্তগড়। বৈতরণী-তীরে সুন্দর ডাকবাংলো ও মাঠ। বৈতরণীর একটা ছোট খাল, ডাকবাংলোর মাঠের এক ধার বেষ্টন করে রেখেচে। খালে এখন জল নেই। খালের ধারে জলজ ঘাস। স্থানটি বেশ নির্জন ও মনোরম।

সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, ওরা ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলো মাঠে। মেয়েরা চায়ের জল চড়াবার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। নিক্‌পিকের আয়োজন পুরোদমে চললো।

আমরা তিনটি পুরুষ-মানুষ নদীর ধার ঘেঁষে চেয়ার পেতে বসে যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্চা করি। একটি ছেলে এসে বললে—মা বলে দিলে কাঠ নেই—

আমি অবাক হয়ে বলি—কাঠ?

—হুঁ!

মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলি—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে?

মিঃ সিংহ সুবোধের দিকে চেয়ে বললেন—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে?

সুবোধ ছেলেটির দিকে চেয়ে কড়া সুরে হেঁকে বললে—কাঠ নেই বলে দিগেযা—

আমি বললাম—তা হোলে চা-ও থাকবে পড়ে। মেয়েরা কাঠ জোগাড় করবে কোত্থেকে?

একটু পরে ছেলেটি আবার ফিরে এসে বললে—মা বললে কাঠ না পেলে চা হবে না—

আমি সংক্ষেপে বললাম—খুব লজিক্যাল কথা।

সুবোধ চটে উঠে বললে—তবে ব্যবস্থা করুন।

—সবাই মিলে কাঠ কুড়ুতে যাই চলুন।

মিঃ সিংহ বললেন—খুব ন্যায্য কথা!

সুবোধ নিরুপায় হয়ে বললো—ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিই কাঠ আনতে।

আমি বলি—অভাবে শুকনো খড়।

চমৎকার নিক্‌পিক্ ঘটে গেল জয়ন্তগড়ের ডাকবাংলোর সামনের মাঠে বৈতরণীর তীরে। প্রচুর জলখাবার তার সঙ্গে গরম চা। শীত পড়েছিল, আমরা বেলা সাড়ে চারটের সময় মোটরে উঠলুম আবার। বেশি দেরি করা উচিত হবে না। মাইল সাতেক গিয়ে একটা চীনেমাটির খনি। ধনী মালিকের প্রাসাদোপম বাসগৃহ কারখানা ও আপিস ঘরের হাতায়। আমরা গিয়েছি শুনে ম্যানেজার নিজে এসে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। এই মাটি দিয়ে চায়ের ডিশ পেয়ালা তৈরির পরীক্ষা চলছে সেখানে।

আমি বললাম—মালিক কোথায় থাকেন?

—ওঁর দেশ গোয়ালিয়র, তবে চাঁইবাসাতে বাড়ি আছে।

—ভাল কাজ চলছে?

—কাজ দশগুণ বেড়ে গিয়েছে যুদ্ধের দরুন। গভর্নমেন্ট থেকে বহু চায়ের ডিশ পেয়ালার অর্ডার পেয়েছি।

—ডিশ পেয়ালা হচ্ছে ভাল?

—পরীক্ষা চলছে, এখন যা হচ্ছে তা ভেঙে যায় সহজে।

—এ মাটিতে টেকসই হবে?

—নিশ্চয়ই। মাস দুইয়ের মধ্যে আমরা গভর্নমেন্টের অর্ডারে হাত দিতে পারবো।

তাঁর অনুরোধে আমরা মালিকের প্রাসাদের ছাদে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তখন সূর্য অস্ত যাচ্চে দূরে গুয়া আর নোয়ামুণ্ডি পাহাড়-জঙ্গলের পেছনে। পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভ আকাশপটে এই নীল অরণ্যানীর দৃশ্য যেন ছবির মত আঁকা। সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধনী মালিকের শ্বেত প্রাসাদটি যেন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল, যেখানে আশেপাশে বহুদূরের মধ্যে গ্রানাইট পাথরের গণ্ডশৈল ও মুণ্ডারি অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির।

আমরা বললাম—এ বাড়িতে মালিক থাকেন কখন?

ম্যানেজার হেসে বললেন—যখন তাঁর মর্জি হয়। বাড়ি তৈরি শেষ হয়েছে। অল্পদিন।

—এর মধ্যে আসেন নি?

—না। তবে দেখতে আসবেন জানিয়েছেন।

—কত টাকা খরচ হোল বাড়িতে?

—চল্লিশ হাজারের ওপর খরচ হয়ে গিয়েছে।

ম্যানেজার আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে চাইলেন—কিন্তু আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হাট-গামারিয়া চীনেমাটির খনিতে পরেশ সান্যাল কাজ করেন। তিনি অনুবাদ-সাহিত্যে হাত পাকিয়েচেন। আমাদের ইচ্ছে হোল ঘোরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাট-গামারিয়া এসে ডাকবাংলোর পেছনে বাসা খুঁজে বার করা গেল। কিন্তু একটি ছোট মেয়ে ভেতর থেকে এসে জানালো, কাকা তো বাড়িতে নেই—বাজারের দিকে গিয়েচেন। বাজারে এসে খোঁজাখুঁজি করতে পরেশবাবুর দেখা পাওয়া গেল। সেই তেপান্তর মাঠের মধ্যেকার ক্ষুদ্র গ্রামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকেন এঁরা, অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি বাঙালির মুখ দেখে পরেশবাবু খুব খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ি গিয়ে আমরা ফিরে এসেচি এতে খুব দুঃখিত হোলেন না। বললেন—চলুন, একটু চাখেয়ে আসতে হবে। আমরা বললাম, আজ রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। আর একদিননিশ্চয়ই হবে।

সুবোধবাবু বললেন—আপনি কাল আসুন না চাঁইবাসায়।

—যাব।

—আপনি এলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাব।

আমরা বিদায় নিলাম পরেশবাবুর কাছ থেকে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

বার বার আমার মনে হচ্ছে বনের সেই অদেখা ঝর্ণাটির কথা। যদি এতরাত্রে এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে যাওয়া যেত। কিন্তু কোনো কথা বলতে ভরসা হোল না, রাত প্রায় দশটা বাজে। সুবোধবাবু বললেন—কাল সেরাইকেলা যাওয়া যাবে যদি পরেশবাবু আসেন—

মিঃ সিংহ বললেন—এবার কিন্তু আর নিক্‌পিক্ নয়, পুরো পি্‌পক্‌নিক্‌ই হোক—

—অসুবিধে আছে। ওসব হাঙ্গামা পোষাবে না। নেমন্তন্ন, মানে পার্টি আছে সেখানে।

—আমরা বিনা নিমন্ত্রণে পার্টিতে যাই কি করে?

—তাতে কিছু আটকাবে না। এ সব নিজেদের মধ্যের ব্যাপার।

পরদিন আমরা বেশ একটা বড় দল সেরাইকেলার পথে রওনা হলাম। ও পথে মাইল পাঁচেক যাবার পরে মুক্ত প্রান্তরের এখানে ওখানে অসংখ্য গণ্ডশৈল আমাদের চোখে পড়লো। আরিজোনার 'পেইন্টেড ডেজার্ট' ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। কি অদ্ভুত ছন্নছাড়া মুক্তরূপা প্রকৃতি! ধরণীর অরুণোদয় এখানে বাধাবন্ধহীন, নিজের মহিমাতে নিজে ভরপুর। ঘরদোরের পাঁচিল দেওয়াল এরা একমুহূর্তে ভেঙে দিয়ে মনটাকে গৃহবিবাগী, উদাস বাউল করে তোলে। কোনো পাহাড়ের ওপর কোনো গাছ নেই—শুধু কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তূপ, কোনো কোনোটাতে সামান্য একটু ঘাস। দূরে পশ্চিম দিগন্তে সুদীর্ঘ বরকেলা শৈলমালা, দূরত্বের কুয়াশাতে কিছু অস্পষ্ট। ওরই ওপরে কোথাও সেই চিটিমিটি-বাংলো। ওরই সানুদেশের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে সেদিন মোটরে চড়ে নেমে আসা!

একটা কি নদী পার হোল গাড়ি। নদীর জলে এখানে ওখানে ডুবে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। সামনে একটা অপকৃষ্ট খোলার বস্তি নজরে পড়লো। নিচু খোলার বস্তির একপাশে একটা সাদা চুনকাম-করা অট্টালিকা।

আমি বললাম—ওটা কি?

সুবোধ বললে—ওই সেরাইকেলা।

সেরাইকেলা ক্ষুদ্র টাউন। ঢুকতেই কতকগুলি খোলার বস্তি, মাঝে মাঝে দু'চারটি চুনকাম করা সাদা একতলা দোতলা বাড়ি। বাজারে অনেক দালান পসার, তবে সবাই যেন গরিব লোক, কাঠের কারিগরেরা বারকোশ খেলনা ইত্যাদি তৈরি করচে ছোট ছোটখোলার ঘরে বসে। বাজারের ভেতরটা বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেও আমার মনে হোল না।

ঢুকেই যেখানে গেলাম, সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, টাউনে বেজায় কলেরা দেখা দিয়েচে। আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তবে এখানে আমাদের কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

পি.ডবলিউ.ডি.আপিসে বসে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। একটি বাঙালি যুবক-কর্মচারি আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। তিনি সুলেখক মানিক ভট্টাচার্য মহাশয়ের কি আত্মীয় হন। আমি মানিকবাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম তাঁকে; শুনলাম ভট্টাচার্য মহাশয় আওরঙ্গাবাদে (গয়া জেলার মহকুমা) শিক্ষকতা করেন এবং বর্তমানে সেইখানেই আছেন।

একটু পরে চা লুচি ও সন্দেশ আসতে আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম।

—এসব—

—কোনো ভয় নেই, সব বাড়ির তৈরি।

—কিন্তু জলটা—

—ও এই বাংলোর হাতার ইঁদারার। তাও ফুটিয়ে নেওয়া।

—তাই তো—

—কোনো ভয় নেই। দোকানের কোনো জিনিস নেই।

জলযোগ সেরে আমরা রাজবাড়ি দেখতে গেলাম, এমন খুব বড় বাড়ি নয়, বাংলাদেশের গ্রাম্য জমিদারবাড়ির মত সাদাসিদে, আড়ম্বরশূন্য। আমরা দরবার-হলে নীত হলাম। এই হলের দেওয়ালে চারিদিকে রাজপরিবারের ব্যক্তিগণের বড় ছোট তৈলচিত্র, একপ্রান্তে থিয়েটারের স্টেজ। এই সেরাইকেলার রাজপরিবার, নৃত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, এঁরা অনেকে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মহাত্মা গান্ধীর সামনে এম্পায়ার থিয়েটারে যে ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তার একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখলাম এখানে। পাতিয়ালার রাজবংশের সঙ্গে সেরাইকেলার রাজবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ বিখ্যাত ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন আমি, পরিমল গোস্বামী, 'বঙ্গশ্রী'র সহকারি সম্পাদক কিরণবাবু ও বন্ধুবর প্রমোদ দাশগুপ্ত যাচ্ছিলাম সম্বলপুর জেলার দুর্গম পর্বতারণ্যের অভ্যন্তরে বিক্রমসোল নামক স্থানের অজানা শিলালিপির সন্ধানে। সিনি জংশনে আমরা এই বিয়ের জনসমাগম ও শোভাযাত্রা দেখি। সে হোল ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের কথা।

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা স্থানীয় মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এটি বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সব খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই মিউজিয়ম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারবাবু হরিদাস মহান্তি আমাদের সে সব দ্রব্য বিশেষ করে দেখালেন। খনিজ অ্যাসবেস্টাস্ এখানে প্রথম দেখলুম একটা কাচের আলমারির মধ্যে।

বললুম—এটা কি জিনিস? কিসের সুতো?

কারণ একগোছা সরু রৌপ্যসূত্রের মত দেখতে জিনিসটা।

হরিদাসবাবু বললেন—ও হোল অ্যাসবেস্টস্। খনি থেকে ওঠানো অবস্থায়।

আরও নানা ধাতু দেখলাম বিভিন্ন কাচের আলমারিতে।

বিকেলের দিকে আমরা সেরাইকেলা থেকে বার হই।

আমাদের গাড়িতে এক হাঁড়ি খাবার তুলে দিলেন এঁরা।

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলম আসবার সময় পথের ধারে যে সব শৈলমালা দেখে এসেচি, ওদের মধ্যে কোনোটার ওপর বসে নিক্‌পিক্—কিংবা

নিক্‌পিক্‌ই হয়ে গেল ঠিক।

আমাদের মধ্যে তর্ক বাধলো। কেউ বলে, "এই পাহাড়টা ভাল—", কেউ বলে, "ওটা ভাল"।

অবশেষে বন্ধুবর পরেশ সান্যাল একটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন—"দেখুন এটাই সব চেয়ে ভাল হবে।"

বড় সুন্দর পাহাড়টি, বড় চমৎকার সেই বিস্তৃত প্রান্তর—ঠিক যেন ফিল্মে দেখা আরিজোনার সেই 'পেইন্টেড ডেজার্ট'।

তখন বেলা পড়ে এসেচে।আমরা অনুচ্চ পাহাড়টিতে উঠলাম, ওর সমতল শিখরদেশে আমরা শতরঞ্জি পেতে বসলাম। আমাদের চারিদিকে অনুচ্চ, রুক্ষ, অনুর্বর অসংখ্য পাহাড়—নানা আকৃতির, নানা ধরনের। কোনোটার আকার পিরামিডের মত, কোনোটার বা মন্দিরের মত, কোনোটা ক্যাস্‌ল-এর মত, কোনোটা বিরাটাকার শিবলিঙ্গের মত, কোনোটা গম্বুজাকৃতি। কোনোটার রং কালো, কোনোটা মেটে সিঁদুরের মত রাঙা, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঝকঝকে মিছরির মত সাদা কোয়ার্টজ পাথরের। প্রত্যাসন্ন শীতের অপরাহ্ণে রাঙা রোদ কোনো কোনোটার মাথায়। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে, খড়কাই নদীর দিক থেকে। পশ্চিমে বহুদূরে দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে সুদীর্ঘ বরকেলা পাহাড়শ্রেণী, তারই পেছনে এখন টক্‌টকে রাঙা সূর্যটা অস্ত যাচ্চে। চারিপাশের সেই সব অদ্ভুতদর্শন পাহাড় দেখে মনে হয় আমেরিকার কোনো ছন্নছাড়া মরুভূমির মধ্যে বসে যেন space-এর সমুদ্রে ডুবে আছি, থই থই space-এর সমুদ্র, কূলকিনারা দেখা যায় না।

মনে হয় কলকাতার সরু এঁদো গলির মধ্যে আলোবাতাসশূন্য একতলা ঘরে যারা বাস করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যারা সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ পায় না, মুক্তরূপা ধরণীর সৌন্দর্য, প্রসারতা, অপরাহ্ণের ছায়া-নেমে-আসা বিরাট প্রান্তরের ছবি যারা কখনও দেখে নি, নির্জন পাহাড়ের সমতল শিলাসনে বসে দূরের গিরিমালার দিকে চেয়ে থাকে নি কখনও যারা, তাদের নিয়ে আসি, তাদের সব দেখাই। এমন অনেক গরিব গৃহস্থের কথা আমার মনে হয় এই সব মুক্ত স্থানে বসলেই। আমি জানি তাদের, কি ভাবে তারা থাকে।

ওদেরই মধ্যে একটি বধূ আমাকে বলেছিল—দাদা, তারকেশ্বর কোন্ দিকে?

—কেন?

—সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে—

—গেলেই হয়। বেশি দূর তো নয়।

—তাই তো দাদা, পয়সায় যে কুলোয় না! উনি যা পান তাতে এই ঘরভাড়া দিয়ে খেয়ে দেয়ে কি থাকে বলুন। কতদিন থেকে ভাবচি—

—এই বাসায় কতদিন আছ তোমরা?

—হয়ে গেল সাত বছর। আমার ঐ খুকির বয়েস, দাদা।

—কোথাও যাওনি এই সাত বছরের মধ্যে?

—হ্যাঁ, যাচ্ছি! কোথায় যাবো? আপনি পাগল! পয়সা কোথায়?

যখন কোথাও যাই, কোনো ভাল জিনিস দেখি, তখন আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই বধূটির কথা মনে পড়ে।

পরেশবাবু একটা গল্প জুড়ে দিলেন। আমরা খাবারের হাঁড়ি খুলে শালপাতায় খাবার ভাগ করে দিতে থাকি। তারপর সবাই খাই, আর চারিদিকে চাই।

এ ঠিক আরিজোনার মরুভূমি, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখনি দূরে কোথাও কোয়োট্ ডেকে উঠবে, যার ছন্নছাড়া চিৎকার শুনলে নির্জন মরুপ্রান্তরে অতি বড় সাহসী পথিকেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

সেই পাহাড়টিতে আমরা বসে রইলুম সন্ধ্যার একপ্রহর পর পর্যন্ত। হাসি গল্পে সময় কাটলো।

মোটরে চাঁইবাসা ফিরবার পথে আমরা জল্পনা-কল্পনা করলাম, একটা জ্যোৎস্না রাত দেখে শিগ্‌গির আবার একদিন ঐ পাহাড়টাতে এসে পিক্‌নিক্ করতে হবে। বড় সুন্দর প্রান্তর, বড় সুন্দর পাহাড়টি। এ ধরনের জল্পনা অনেকক্ষেত্রে অনেকবার হয়, কিন্তু আর কার্যে পরিণত হয় না। কোনো ভাল জায়গায় বেড়িয়ে ফিরবার পথে মনে হয়—ও, এই তো! এখানে আবার কতবার আসবো, এই এতো কাছে!

কিন্তু ওই পর্যন্তই। যাওয়া আর ঘটে না।

এখানেও তাই। সেরাইকেলা ভ্রমণের পরে দু'বছর কেটে গিয়েচে—অথচ সেই নির্জন শৈল সন্দর্শনের সৌভাগ্য আর কখনও ঘটে নি আমাদের।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচীর পথে বিখ্যাত হিড্‌নি জলপ্রপাত। অনেকদিন থেকে আমাদের দেখবার ইচ্ছে ছিল। গত বৎসর ভাদ্র মাসে (১৩৫০ সালের ভাদ্র) আমি ঘাটশিলা থেকে সাহিত্যসভা উপলক্ষে চাঁইবাসা যাই। সভা শেষ হোল রাত দশটায়।

গুমট্ গরম। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ি আহারাদি সেরে অনেক রাত পর্যন্ত কোলহান পার্কের বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করলাম। কোলহান পার্ক চাঁইবাসা টাউনের একটা সম্পদ বলে মনে করি। মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ধারে ফুলের বাগান, হু হু করচে জলের হাওয়া, ভুর ভুর করচে হাস্‌নুহানার সুবাস বাতাসে, ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্না, নির্মেঘ আকাশ। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আবৃত্তি করচেন, কেউ গান করচেন, রাত যে কতহয়েচে সেদিকে কারও খেয়াল নেই। হঠাৎ বন্ধুবর সুবোধ ঘোষ বললেন—চলুন, শোওয়া যাক গে, রাত বোধ হয় বারোটা একটা হয়ে গেল—

বাস্তবিক সে একটা অদ্ভুত রাত্র কাটিয়েছি কোলহান পার্কের জলের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে। পাঁচ-ছ'জন বন্ধুবান্ধব, সবাই মিলে গানে গল্পে কোন্ দিক থেকে সময় কেটে গেল, ঘুমোবার ইচ্ছে নেই কারও।

এই সময় মিঃ সিন্‌হা বাড়ি থেকে ঘড়ি দেখে এসে বললেন—রাত তিনটে—আমরা সবাই চমকে উঠি।

—তিন-ন-টে?

—খাঁটি তিনটে। এক মিনিট কম নয়!

—তাই তো!

সুবোধ প্রস্তাব করলে—তবে আর শুয়ে কি হবে?

আমিও এতে সায় দিলাম।

পরেশবাবু বললেন—আমারও তাই মত।

আমি বললাম—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

সবাই বললে—কি?

—এখুনি চলুন সবাই বেরুনো যাক একসঙ্গে। কাল সকালে হিড্‌নি ফল্‌সে নিক্‌পিক্ করা যাবে—

সবাই মিলে হইহই করে উঠলো। বেশ ভাল প্রস্তাব। পরেশবাবু বললেনআমারও অনেকদিন ওটা দেখার ইচ্ছে ছিল—তাই চলুন। সুবোধ মোটর বার করতে চলে গেল। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ি গিয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে-ছেঁদে নিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্তী ঘন অরণ্য-মধ্যে অবস্থিত হিড্‌নি জলপ্রপাতের কাছে বনভোজন করবার সব আয়োজন ঠিক করে মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি কেবল বললেন—আমার আজ যাওয়া হবে না। ঘাটশিলায় ফিরতে হবে, আমাকে দয়া করে চক্রধরপুরে বম্বে মেল ধরিয়ে দেবেন—

এখন রাত চারটে। চক্রধরপুর মাইল ষোলো-আঠারো রাস্তা। আমরা জ্যোৎস্নালোকিত রাঁচি রোড দিয়ে রোরো নদীর পুল হয়ে সবেগে মোটর ছুটিয়ে দিয়েচি। দুধারে ছোট বড় পাহাড়, বর্ষায় বনানী সবুজ হয়ে উঠেচে, জ্যোৎস্না পড়েচে পাহাড়ি নদীর জলে, মাঝে মাঝে দু-একটা হো-অধিবাসীদের বন্যগ্রাম। পরেশবাবু প্রকৃতিরসিক ব্যক্তি। বললেন—এদিকে কখনও আসি নি—ভারি চমৎকার তো? কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে!

সুবোধ বললে—আরও আগে চলুন, আরও ভাল দেখবেন—

একটু পরে সঞ্জয়-নদীর পুল পার হয়ে আমরা দুরে চক্রধরপুরের সাদা সাদা বাড়ি দেখতে পেলাম। ঘাটশিলার বন্ধুটি তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, পাঁচটা বাজবার দেরিনেই, বম্বে মেল পাওয়া যাবে তো?

চক্রধরপুর স্টেশনের বাইরে আমরা মোটর থামালুম, বন্ধুটি নেমে গেলেন।

মিঃ সিন্‌হা বললেন—একটু দুধের জোগাড় করলে হোত। সকাল হলেই তো চা চাই। দুধ নেই সঙ্গে।

সুবোধ বললে—শেষ রাত্রে এখানে দুধ পাওয়া যাবে বলে মনে তো হয় না। চেষ্টা করতে পারেন।

কিন্তু সুবোধের কথাই ঠিক হোলো। কোথাও দুধ মিললো না চক্রধরপুর স্টেশনে।

আমরা মোটর ছাড়লাম। আরও আধঘণ্টা পরে আমরা কিছু দূরে টেবো পাহাড়শ্রেণী দেখতে পেলাম। কেউ কেউ এটাকে সেরাইকেলা পাহাড়শ্রেণীতে বলে।

পাহাড়ের ওপরে ঘুরে ঘুরে রাঁচি রোড উঠেচে ওপরে। পাহাড়ে উঠবার কিছু আগে রাস্তার ধারে ইংরিজিতে লেখা আছে'এখান থেকে ঘাট আরম্ভ'—পাহাড়ি রাস্তাকে এদেশের ভাষায় "ঘাট" বলে।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি এসব দিকে আসি নি। আমাদের এক গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোক চক্রধরপুরে কি কাজ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম চক্রধরপুরে রাঁচি রোডের দৃশ্য অপূর্ব, বিশেষ করে রাস্তা যখন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর ওঠে। মনে আছে, আমি তাঁকে এ পথের দৃশ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তত বর্ণনা দিতে পারেন নি, মোটামুটি বলেছিলেন, 'ভাল'। কিন্তু শুধু 'ভাল' বা "চমৎকার' শুনে আমার মন তৃপ্ত হয় নি, আমি চেয়েছিলাম যা, তিনি তা আমায় দিতে পারেননি।

সে আজ অন্তত সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা।

তখন জানতাম না, একদিন শরৎকালের শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মোটরে সেই অরণ্য-পর্বতের পথে প্রমোদ-ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে ঘটবে। সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো এতদিন পরে। তিনিই প্রথম এ রাস্তার সৌন্দর্যের কথা আমায় বলেন, এ পথ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। যতদূর জানি, তিনি এখন আর ইহলোকে নেই, শেষ বয়সে বিদেশে কোথায় কন্ট্রাক্টারি করতেন, সেখানে মারা যান।

তিনি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেন নি দেখলুম। পথ ঘুরে ঘুরে যখন উঠতে লাগলাম টেবো পাহাড়ে, তখন মনে হলো, এ পথে সবারই একবার বেড়িয়ে যাওয়া উচিত। অপূর্ব দৃশ্য। পথের দুধারে বড় বড় গাছপালা, বড় বড় পাথর, মায়াময় শিখরদেশ জ্যোৎস্নামাখা, বনের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে।

প্রকৃতিরসিক পরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—চমৎকার!

আমরা সকলেই এক বাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলুম।

পাহাড়ের ওপর রাস্তার দুধারে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির কি অপূর্ব শোভা! কেঁদ গাছের কালো কালো পাতায় জ্যোৎস্না পড়ে চক্‌চক্ করছে। ঘন, নির্জন বনানীর নৈশনিস্তব্ধতা মনে ভয়-মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করে।

আমি বললাম—এখানে মোটর থামিয়ে একটু বনটা দেখা যাক—

সুবোধ আপত্তি করলো—এখানে বাঘের ভয়, বিশেষ করে এই রাতের বেলায়। মোটর থামিয়ে নামা উচিত হবে না।

মিঃ সিংহ বললেন—কিছু হবে না। নামা যাক।

পরেশবাবুও আমাদের মতেই মত দিলেন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মোটর থামানো হোল—আমি, পরেশবাবু ও মিঃ সিংহ নেমে রাস্তার ধারে বনের প্রান্তে একখানা বড় পাথরের ওপর বসলাম। সুবোধ গাড়ির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

সে নৈশপ্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিস। লোকালয় থেকে বহুদূরে পাহাড়ের মাথায় ঘন বন, শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় আমরা ক'টি প্রাণী সেখানে চুপ করে বসে আছি, যে কোনো মুহূর্তে বাঘ বা যে কোনো বন্যজন্তু বেরুতে পারে, বন্যহস্তীর তো কথাই নেই—এসব বনে হাতির সংখ্যাই বেশি, ভালুকও যথেষ্ট। বিপদের মধ্যেই ভ্রমণের আসল আনন্দ, অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে, সে জায়গা যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন, বেড়িয়ে সে ভয়, সে উত্তেজনার সন্ধান মেলে না। অনুভূতির নতুনত্বই মানুষের জীবনের বড় সম্পদ। মিনিট পনেরো পরে আমরা মোটরের কাছে গিয়ে সুবোধকে ঘুম থেকে ওঠালুম। এতক্ষণ সুবোধই চালাচ্ছিল, মিঃ সিংহ বললেন—তোমার হাতে আর বিশ্বাস নেই এই পাহাড়ি রাস্তায়, ঘুমকাতুরে চোখে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। সরো, আমার হাতে স্টিয়ারিং দাও—

রাত শেষ হয়ে আসচে।

সেই গভীর গিরিবনে হেমন্ত রাত্রির কুয়াশা হঠাৎ ঘনিয়ে আসতেই কেউ আর কিছু দেখতে পায় না। মিঃ সিংহ ভরসা করে গাড়ি জোরে চালাতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে কুয়াশা নেমে চারিধার ঢেকে ফেলেছে, পাহাড় দেখা যায় না, জঙ্গলের গাছপালাও খুব স্পষ্ট নয়। সামনে পিছনে সব যেন ঘষা পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। সন্তর্পণে গাড়ি চালাতে লাগলেন মিঃ সিংহ। একটু অসাবধানে গাড়ি চালালে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মোটর চুরমার হয়ে যাবার ভয়। এমন সময় পরেশবাবু চেঁচিয়ে উঠে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, ঐ—ঐ—কি ওটা, দেখুন দেখুন—সকলে চেয়ে দেখলাম কি একটা জানোয়ার মোটরের হেড্‌লাইটের আলোয় মোটরখানার সামনে ছুটে চলেছে।

সুবোধ বললে—হরিণ।

আমি বললাম—বাঘ।

পরেশবাবু বললেন—ভালুক।

সেটা যে জানোয়ারই হোক, রাস্তা ছেড়ে দিতে জানে না দেখা গেল। সামনে সেটা চলেচে গাড়ির আগে আগে দৌড়ে—পাশ কাটিয়ে আমাদের পথ দেবার কোনো চেষ্টাই তার নেই। সমানে ছুটেচে। আমি বললাম—স্পীড্ বাড়িয়ে ওটাকে চাপা দিলেকেমন হয়, মিঃ সিংহ?

মিঃ সিংহ বললেন—হয় ভালই, কিন্তু গাড়ি জোরে চালাতে সাহস করি নে এই কুয়াশার মধ্যে।

প্রায় মাইল খানেক পথ গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবার পরে জানোয়ারটা হঠাৎ লাফ দিয়ে বাঁ দিকের কুয়াশাবৃত বন-মধ্যে অন্তর্হিত হোল। এর আগেও সে অনায়াসেই যেতে পারতো, কেন যে যায় নি সে-ই বলতে পারে।

এই সময়ে সকলেরই ভীষণ ঘুম পেয়েচে। ভোর পাঁচটা, ঘড়িতে দেখা গেল। ফুটফুট করচে জ্যোৎস্না, যেন রাত দুপুর। নির্জন নিস্তব্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন বনানী আমাদের চারিদিকে ঘিরে। মিঃ সিংহ একবার গাড়ি থামিয়ে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিলেন। খুব ঘুম পেয়েচে তাঁরও।

আমি বললাম—গাড়ি একপাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিন মিঃ সিংহ, এ অবস্থায় গাড়ি চালানোটা—

সুবোধ বললে—খুব বিপজ্জনক। কিন্তু এখানে গাড়ি রাখাটা আরও বিপজ্জনক—

—কেন?

—বাঘের ভয়।

শুনে পরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—তবে চলুন চলুন, যাওয়াই যাক—

আমি বললাম—হেসাডি ডাকবাংলো আর কতদূর?

মিঃ সিংহ বললেন—বেশিদূর বোধ হয় না—কুয়াশার মধ্যে কিছু যে বুঝতেই পারচি নে—

আমি বললাম—তা হোক মশাই, রাখুন এখানে গাড়ি। ঘুমন্ত অবস্থায় মোটর চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে—

সুবোধ ও পরেশবাবু মহা আপত্তি তুললে। এখানে গাড়ি রাখা যায় না এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যানীর মধ্যে, এগিয়ে যাওয়াই ভাল। আরও মিনিট পনেরো কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চালানোর পরে বাঁদিকে বনের মধ্যে হেসাডি ডাকবাংলো চোখে পড়লো। আমাদের গাড়ি ডাকবাংলোর হাতায় ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছনের সিটে শুয়ে আধমিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভেঙেছে, তখন শুয়ে শুয়েই দেখচি সামনের পাহাড়ে রাঙা রোদ, গাছের মাথায় রাঙা রোদ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি গাড়ির মধ্যে কেউ নেই। চোখ মুছে উঠে দেখি পরেশবাবু ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করচেন। বললাম—সুপ্রভাত, এঁরা কোথায়?

—সব ঘুমুচ্চে।

—ওঠান সব, বেলা হয়েচে অনেক।

একটু পরে আমরা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের টেবিলে ভিড় করেচি, কিন্তু সেই পুরাতন সমস্যা, দুধ নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে বলা গেল। তম্বি-গম্বি করা হোল—দুধ নেই। লেবু আছে, তাই দিয়ে করা যেতে পারে না চা?

মিঃ সিংহ বললেন—চমৎকার হবে। তাই হোক। ইটালিতে দেখেচি লেবুর চাক্‌লা কেটে চায়ে ডুবিয়ে চাম্‌চে দিয়ে চেপে চেপে খায়। সে বেশ লাগে।

খাবারদাবারের মধ্যে দেখা গেল ছোলা—রাশীকৃত ছোলা ছাড়া আর কিছু খাবার নেই;অত ছোলা কি হবে? কে খাবে অত ছোলা?

সুবোধ বললে—অত ছোলা খাবে কে?

আমি বললাম—তাই তো! কি হবে অত ছোলা?

মিঃ সিংহ বললেন—না হয় কিছু থাকবে এখন। হিড্‌নি ফলস্‌ গভীর বনের মধ্যে, সেখানে গিয়ে আমরা খাব। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখা গেল একদানা ছোলাও অবশিষ্ট নেই, এমন কি টেবিল থেকে গড়িয়ে যেসব ছোলা মেজেতে পড়ে গিয়েছিল—শেষে দেখা গেল সবাই তাও কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছি।

সুবোধ বললে—আরও কিছু হোলে হোত দেখা যাচ্ছে!

আমি বললাম—আমারও তাই মনে হচ্ছে বটে।

আরও এক মাইল এগিয়ে গেলাম মোটরে। তারপর মোটর রেখে আমরা রাস্তার ডানদিকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলুম। চারদিকে গভীর বন, উঁচু শৈলমালা, একটা পাহাড়ি নদী—পাহাড়ি রাস্তার নিচে দিয়ে বয়ে চলেচে। সামনের দিকে বন গভীরতম।

খানিকদূর গিয়ে আমরা একটু নিচু উপত্যকার মধ্যে নামলাম, আবার সেই পাহাড়ি নদীটার উপলবিছানো পথে পার হলাম। এইবার দূর থেকে জলপতনের গর্জনশব্দ শোনা গেল—আরও একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো পেঁজা তুলোর বস্তার মত জলরাশি পাহাড়ের ওপর থেকে, বনের মাথা থেকে উপচে পড়চে। আবার একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নিচে নামতেই বাঁদিকের বনের আড়ালটা সরে গেল। জলপ্রপাতটা একেবারে চোখের সামনে আমাদের।

পরেশবাবু কবি লোক, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—বাঃ, অতি চমৎকার!

আমরা সবাই সায় দিলাম। জায়গাটা যেন আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো—কোথাও এতটুকু মাটি বা বালি নেই। স্তরে স্তরে নেমে গিয়েচে পাথরের ধাপে ধাপে—যেন পুকুরের সান বাঁধানো ঘাট।

মিঃ সিংহ বললেন—আমরা সকলে স্নান করে নেবো চলুন ওই জলে।

পরেশবাবু বললেন—ম্যালেরিয়া হবে না তো নাইলে?

সুবোধ বললে—না, এখানে ম্যালেরিয়া কোথায়?

আমরা বসে বসে দেখলুম কতক্ষণ।

স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য দেখবার জিনিস। শুধু বর্ণনায় পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না। যে উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে, তার চারিপাশে ঘন বনানী, চুনাপাথরের প্রাচীর। যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ল্যান্টানা ক্যামেরা ফুলের গাছ—ফুল ফুটে আছে।

তারপর আমরা জলপ্রপাতের তলায় স্নান করতে গেলাম।

সে এক চমৎকার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা।

প্রতি মুহূর্তে মনে হবে অত জল আর অত জোরে যদি গায়ে এসে পড়ে, তবে পিঠ দুমড়ে বেঁকে যাবে। তা অবিশ্যি হয় না, কিন্তু এটা মনে হয় যে খুব ভারী কি একটা জিনিস দুড়দাড় করে পিঠে পড়চে। মিঃ সিংহ আবার আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন প্রপাতের ধারার পেছনে, পতনশীল জলধারা আর পর্বতের প্রাচীর—এ দুয়ের মাঝখানে।

বললাম—কেন?

—আসুন আসুন, মজা হবে।

—আমার মজায় কাজ নেই মশায়, ওখানে যাব না।

—একটুখানি এসে দেখে যান—

আমিও যাব না, মিঃ সিংহ নাছোড়বান্দা।

কিন্তু সেখানে যাওয়া সোজা কথা নয়, প্রপাতের সেই বিরাট জলের ভল্যুম এড়িয়ে পার হয়ে। মারা যাব।

দৃঢ়ভাবে বললাম—আপনি যান। আমাকে মাপ করুন।

মিঃ সিংহ সত্যিই গেলেন সেখানে। পতনশীল সেই বিশাল জলধারার ধোঁয়ার আড়ালে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুনরায় তিনি না বার হয়ে আসা পর্যন্ত সত্যিই অস্বস্তিবোধ করা যাচ্ছিল।

স্নান সেরে আমরা রওনা হবো, কারণ সঙ্গে খাবার নেই, খেতে হবে সেই চাঁইবাসায় ফিরে। একজন বন্যলোক হঠাৎ সেখানে এসে পড়লো—হো-ভাষায় তাকেপ্রশ্ন করলেন মিঃ সিংহ, সে যা বললে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

—কি করবি এখানে?

—কেন?

—বল না।

—মাছ—

—মাছ ধরবি?

—হ্যাঁ।

—নাম কি?

সে নিরুত্তর।

—নাম কি?

একপ্রকার অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ।

মিঃ সিংহের কথোপকথন শেষ।

লোকটার হাতে বন্য ডালপালার তৈরি একরকম ছোট খাঁচার মত ব্যাপার। তাই হোল সম্ভবত তার মাছ ধরবার যন্ত্র। কিন্তু এ জলপ্রপাতের উচ্ছল জলধারার মধ্যে মাছকোথা থেকে আসবে তা আমরা বুঝতে পারলাম না, কি মাছ এখানে পাওয়া যাবে তাও জানি না।

পরেশবাবু আমাদের পেছনে শিলাসনে বসে মনের আনন্দে গান ধরেচেন। সুবোধ মহা ব্যস্ত সর্বদাই, সে ইতিমধ্যে কখন মোটরে গিয়ে বসেচে, আমরা তা জানি নে, দেখি নি তার চলে যাওয়া, পরেশবাবুই প্রথমে বললেন—সুবোধবাবু কোথায়?

আমি বললাম—তা কি জানি, এই তো এখানে বসেছিল।

আমরা সকলেই আশ্চর্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে থাকি। এই ছিল, গেল কোথায়? বাঘে নিয়ে গেল নাকি? জায়গাটা তো ভাল নয়।

মিঃ সিংহ বললেন—না না, সে মহা ব্যস্তবাগীশ, সে চলে গিয়েচে গাড়িতে ফিরে। গাড়িতে বসে আছে রাঁচি রোডে।

তখন আমরা সবাই মিলে ফিরলাম।

আর দেরি করা উচিত নয়। লোকটাকেও দেখা উচিত, ক্ষিদেও পেয়েছে যথেষ্ট।

এবার অন্য একটা পথ ধরে রাঁচি রোড় ফিরি। আগে সুবোধ যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার চেয়ে এটা যে কত ভাল!

এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া সর্বত্র। এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। সারাপথ যেন ঋষিদের পবিত্র তপোবন। জনমানবশূন্য। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাঁচি রোডে এসে মোটরে চড়লাম। হু হু করে মোটর ছুটলো কাল রাত্রিকার দৃষ্ট সেই টেবো অরণ্যভূমি ভেদ করে। কাল দেখেছিলুম শেষ রাত্রের মায়াময় জ্যোৎস্নায়, আজ দেখছি দুপুরের খর রোদে। রাস্তার পাশে ২০০০ ফুট উঁচু টেবো পাহাড়ের উপর টেবো বাংলো।

কেমন সুন্দর নির্জন স্থানে বাংলোটি। দেখে বাস করবার লোভ হয়। চারিধারে বনশ্রেণী, উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাংলো। শিউলি ফুল ফুটে আছে।

সুবোধকে বললাম—একটা প্রস্তাব করি—

—কি?

—এই টেবো পাহাড়ের ওপর লেখকদের জন্যে একটা বাংলো করান—

—তারপর?

—তারপর গবর্নমেন্টকে লিখুন লেখকদের সেখানে ফ্রি থাকবার ব্যবস্থা করতে—

—তারপর?

—তারপর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, তার জন্যে নামমাত্র দাম নেবে গবর্নমেন্ট। যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারে, তবে নিতান্ত বিনা কারণে নয়, বিশেষ কোনো বই লেখবার বা চিন্তা করবার বা প্ল্যান করবার সময় যখন লোকালয় থেকে নির্জনে থাকবার দরকার হবে—তবে গবর্নমেন্টকে লিখলেই—

—তিনি যদি কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে বাংলো দখল করেন?

—কোন্ পাগল এই বাঘভালুক-ভরা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে বিনা কারণেআসতে যাবে? যে আসবে সে কাজ ছাড়া আসবে না। জনমানব নেই, চায়ের দোকান নেই, খবরের কাগজ নেই, আড্ডা নেই, কে থাকবে মশাই ওখানে?

পরেশবাবু বললেন—যে থাকবে সে সত্যিকার লেখক জানবেন—

মিঃ সিংহ বললেন—অথবা ভ্যাগাবন্ড—

আমি বললাম—বেশ। সে কি কাজ করচে না করচে তা তদারক করবার ব্যবস্থা না হয় থাক—

সুবোধ বললে—কে সেটা তদারক করবে? ডাকবাংলোর চৌকিদার অথবা রোড ওভারসিয়ার?

—কেন?

—তাও কালেভদ্রে ঐ চৌকিদারই ভরসা। লেখা হপ্তায় হপ্তায় সাবমিট করতে হবে ওর কাছে।

—রাজি। তবে একটা কথা।

—কি?

—গবর্নমেন্টকে এটাও লিখবেন, চাঁইবাসা থেকে টেবো পাহাড় পর্যন্ত আসার ব্যবস্থাটা গবর্নমেন্ট থেকে করা হবে। এত মাইল রাস্তা আসবে কিসে একজন দরিদ্র লেখক? সব সুবিধে করে দিতে হবে গবর্নমেন্টকে। তার লেখা বা চিন্তার জন্যে যা কিছু দরকার।

—আর কিছু?

আমি রাগ করে বললাম—এ ঠাট্টার কথা নয়। আজ যদি আমাদের নিজেদের গবর্নমেন্ট হতো—

—কোন্ দেশের গবর্নমেন্ট তাদের দেশের লেখকদের জন্যে এমন ব্যবস্থা করে রেখেচে আমি জানতে চাই—

—আমিও বলতে চাই যে যদি না করে থাকে, তাদের করা উচিত। গবর্নমেন্ট যারা চালায় তাদের কল্পনাশক্তি কম, নিরেট বেশির ভাগ। কবি ও লেখকদের পরামর্শ এ সম্পর্কে তারা যেন নেয়। না নিলে তারা সভ্যনামের উপযুক্তই নয়। দেশের লেখকদের এ সুযোগ দেওয়া, এসব সুবিধে করে দেওয়া যে কোনো গবর্নমেন্টের উচিত। বেশিদিন নয়, দু-একমাস নির্জনে থাকবার পরে আবার লেখক কাজ শেষ করে চলে যাবেন। দেশের দশের কাজই তো। কেন গবর্নমেন্ট করবে না? করা নিশ্চয় উচিত।

বলা বাহুল্য আমার সে উপদেশ কোনো কাজে এল না। মূল্যবান উপদেশগুলো বৃথাই গেল। গাড়ি পাহাড় থেকে নামলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু পাহাড়ের নিচে নাকটি ডাকবাংলোতে জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। চক্রধরপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে জল আনিয়ে খাওয়া গেল। চাঁইবাসায় ফেরা গেল বেলা তিনটের মধ্যে।

এই ভ্রমণের কিছুদিন পরে আমি ঘাটশিলা ফিরে আসি। একদিন সন্ধ্যায় আমার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়। সে কথাটা এখানে বলি।

এ অঞ্চলে শঙ্খচূড়া বা king cobra-র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে—এ কথা আমি পূর্বেও শুনেছি। কিন্তু অত বনে বনে বেড়িয়েও কখনও আমার চোখে পড়েনি।

একদিন আমি রাস্তা থেকে কিছুদূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই; পাহাড়টার নাম উল্‌দাডুংরি। ওদিকের ওসব পাহাড়ে গরু চরে, লোকজন ওঠে নামে, কিন্তু দূর থেকে এ পাহাড়ের দৃশ্য দেখে আমার মনে হল এ পাহাড়টাতে কেউ ওঠে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।

ভাবলুম, পাহাড়টাতে উঠে কোনো শিলাখণ্ডে বসে সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক। সামান্য খানিকটা উঠে লক্ষ্য করলাম পাহাড়টাতে বেজায় কাঁটাবন। ওপরে আর উঠবার উপায় নেই। অনেকগুলো ঝরা শুকনো পাতা সেই কাঁটাগাছগুলো থেকে ঝরে আমার আশেপাশে সর্বত্র পড়ে স্তূপাকার হয়ে আছে পাথরের ওপরে। কাঁটাগাছ যে খুব বড় তা নয়, আমাদের দেশের ছোট ছোট বৈঁচি গাছের মত।

বড় চমৎকার শোভা হয়েছে পশ্চিম আকাশের, সেদিকে সুবর্ণরেখার ওপারে পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্যদেব অস্ত যাচ্চেন। শালবনের মাথায় রাঙা সূর্যাস্তের আভা। হু হু হাওয়া বইছে ওদিক থেকে। নির্জন জায়গা, কেউ কোনোদিকে নেই।

একমনে দেখতে দেখতে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, এমন সময় ঝুপ করে কি একটা শব্দ হলো। শব্দটা একটা অদ্ভুত ধরনের। শুকনো লতাপাতার উপর ঝুপ করে যেন একটা ভারী জিনিস পড়লো। পিছন ফিরে দেখি শুকনো ঝরাপাতার রাশির ওপর একটা বড় মোটা মিশ-কালো সাপ। কিন্তু সাপটার মুখ আর লেজটার দিক চোখে পড়ছে না। আমি মাত্র তার মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছি। আমি যেখানে বসে, সাপটা সেখান থেকে হাত আষ্টেক দূরে। ও-ধরনের মোটা সাপ আমি আর কখনও দেখিনি।

হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো। এই নির্জন পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ভীষণদর্শন সাপের হাতে পড়লে নিজেকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাড়া যদি করে পালাতে পারবো না এই কাঁটাগাছ ঠেলে।

আমার হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে নামতে যাবো, এমন সময় সাপটা যেন পাশের দিকে অগ্রসর হয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। এখনও ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং ও আমাকে টের পায়নি।

নামতে গিয়ে মনে হোতে লাগল পাহাড়ের প্রত্যেক ফাটলে অসংখ্য ভীষণদর্শন সাপ বাসা বেঁধেছে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেচে; ভাল কিছু দেখতেও পাচ্ছি নে। কাঁটাগাছে হাত-পা ছড়ে রক্তপাত হতে লাগলো। প্রাণভয়ে সব অগ্রাহ্য করে কোনো রকমেনামতে লাগলাম। পথও যেন ফুরোয় না। ওঠবার সময় বেশ উঠেছিলাম। এখন সেই পথ দুর্গম ও কঠিন হয়ে পড়েছে।

অন্ধকারও এখন বেশ। যা হোক অতি কষ্টে এক রকম করে তো নামা গেল। ছুটতে ছুটতে শালবনের মধ্যে এসে পড়লাম। উল্‌দাডুংরি আর চাঁইবাসার রাস্তার মধ্যে (জায়গাটা রাখা মাইন্‌স ও চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছাকাছি) এই চারা শালবন। অদূরে পথ। গালুডির হাট থেকে কয়েকজন বুনো লোক ফিরছিল। তারা আমাকে ওভাবে শালবনের মধ্যে হাঁটতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কি বাবু?

তখন তাদের খুলে বললাম।

ওরা বললে—সন্দেবেলা ও-পাহাড়ে কেউ যায়? দেখতে পান নি গরু চরে না ও-পাহাড়ে! যে পাহাড়ে গরু চরে না সে পাহাড়ে বিপদ আছে বুঝতে হবে।

—কি আছে ওখানে?

—ওটা শঙ্খচূড় সাপে ভরা। দিনমানেও কেউ যায় না।

—তোমরা দেখেছ?

—বাবু, এই চন্দ্ররেখা গ্রামের একজন নাপিত ওই পাহাড়ে পাকা কুল তুলে আনতে গিয়েছিল। তখন অনেক কুলগাছ ছিল ওখানে। দুপুর বেলা কুল পাড়তে গিয়ে দ্যাখে মস্ত বড় তিনটে শঙ্খচূড় গাছের গুঁড়ির গায়ে জোট পাকিয়ে রয়েছে। ওকে দেখে একটা তো তেড়ে এল, ও ছুট দিলে। কিন্তু ছুটবে কোথায়? দেখেছেন তো কেমন কাঁটা। কাঁটা পায়ে বিঁধে পাথরের ওপর পড়ে গেল। ওর পড়ার শব্দে কি রকম ভয় পেয়ে সাপটা পালিয়ে গেল তাই রক্ষে, নয়তো নাপিতের পো সেদিন জন্মের মত কুল খেত। ওসব পাহাড়ে আর কখনও এমন সময় উঠবেন না।

এদিন ছাড়া আর কোনোদিন সাপ দেখিনি।

তবে একবার সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ের নিচে একটা সাপের খোলস দেখেছিলাম মস্ত বড়। সে কি জাতীয় সাপের খোলস তা আমি বলতে পারবো না। তবে সে সাধারণ সাপ নয়, এটা ঠিক। সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। আমি, অমরবাবু, তিনু ও আমার ভাগ্নে শান্ত আমরা সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ে যাই। আমাদের বাড়ি থেকে সে পাহাড় প্রায় সাত মাইল দূরে। পাহাড়ে উঠে সে পাহাড় পার হয়ে ওধারের বনাবৃত উপত্যকার ঠিক ওপরেই আমরা বসলুম, তখন বেলা তিনটে। রোদ বেড়ে চলেছে। আমাদের স্নান করার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের নিচে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। পাহাড় চুঁইয়ে সেখানে টুপ টুপ করে জল পড়ছে, অনেকটা জল সেখানে। একটা মানুষ কোনো রকমে নেমে নাইতে পারে।

শান্ত বললে—মামা, এই ঝর্ণার কি নাম?

—না, কোনো নাম নেই।

—আমার নামে এর নাম দেবেন?

—যাও, আজ থেকে এর নাম শান্ত-ঝর্ণা।

এটা অনেকটা হোল সাঁওতালদের পাহাড় যৌতুক দেওয়ার মত। মেয়ের বিয়ের সময় ওরা জামাইকে যৌতুক দেয়—যাও, ওই পাহাড়টা তোমায় দিলাম।

সে পাহাড় হয়তো গবর্নমেন্টের রিজার্ভ ফরেস্ট। জামাতা বাবাজী সেখানে যদি একখানা শুকনো ডাল ভাঙতে যান, তবে তখুনি বনের চৌকিদার তাকে চালান দেবে বেঁধে। কার পাহাড় কে দেয়!

সে যাই হোক আমি সে জলে নামতে গিয়েই চমকে উঠলাম। প্রকাণ্ড এক সাপের খোলস সেই গর্তের গায়ের পাথরে জড়িয়ে। বিরাট খোলস। আমরা কাঠি দিয়ে সেটাকে তুলে দেখি আট-দশ হাত কি তার চেয়েও লম্বা খোলসটা। মোটাও তেমনি। এমনি একটা বিরাট সাপের খোলস ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে সিংভূমের সারান্ডা অরণ্যে রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত আমায় দেখান। খোলসটা আমি মুড়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। বারো হাত লম্বা আর তেমনি মোটা। এ খোলসটাও ছিল একটা গুহার মধ্যে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেছিলেন—পাইথনের খোলস।

শান্তকে অমর করে রাখার পরে সেই বনপথে অগ্রসর হয়ে চলি।

সামনেই যে ঝর্ণা তার নাম দেওয়া গেল তিনুঝর্ণা, সাঁওতালদের বিয়ের যৌতুকরূপে পাহাড় দান করবার মত। তবে আজকাল ও দেশে ওর নাম তিনুঝর্ণাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েচে। বনবিভাগের একজন কর্মচারি, আমার বিশেষ বন্ধু, বলেচেন বনবিভাগের ম্যাপ ও নক্সায় আমাদের দেওয়া এই নামটি তিনি ব্যবহার করেন। সেজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

অতি চমৎকার বনভূমি। বসন্তের প্রারম্ভে গোলগোলি ফুল ফুটেছে বনে বনে।

সিংভূমের অরণ্যভূমির এ সুন্দর বনফুলের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বসন্তের প্রথমেই এই ফুল পাহাড়ি বনে ফুটতে আরম্ভ করে—দেখতে অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মত। তিনটি কারণে এ ফুল অতি সুন্দর দেখায়। প্রথম, নিষ্পত্র প্রকাণ্ড গাছে এ ফুল ফোটে; দ্বিতীয়, সাদা কোয়ার্ৎজ পাথরের অথবা কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে, সবুজ অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ ঠেলে ওঠে, এখানে ওখানে সাদা ডালপালাওয়ালা নিষ্পত্র গাছ; তৃতীয়, ফুলের রং ও গড়ন অতি সুন্দর। পুকারের বিখ্যাত বই হিমালয়ান জার্নালের মধ্যে এই ফুলের উল্লেখ আছে ও ছবি আঁকা আছে।

তিনু বললে—দাদা, চলুন আমরা পাহাড়ে ঘুরে যাই।

পাহাড় ঘুরে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দেখি গোলগোলি গাছের মেলা। তার নিচেই ধাতুপ ফুলের বন রাঙা হয়ে আসচে নব মুকুলের আবির্ভাবে। এই আর একটি চমৎকার ফুল—মধু চুষে খাওয়া যায় বলে এ ফুল ছেলেপিলের বড় প্রিয়, আরও প্রিয়তর বন্য ভালুকের।

ভালুকের ব্যাপারও অনেকরকম শোনা গিয়েছে এসব বনে।

আজ থেকে বছরখানেক আগে ঘাটশিলার নিকটবর্তী এঁদেলবেড়া বনে একটি কাঠুরে লোককে ভালুকে জখম করে। লোকটা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ একটাভালুক গাছের ডাল থেকে নেমে ওর দিকে তেড়ে আসে। ভালুক কেন গাছে উঠেছিল জানি না, বোধ হয় সেই গাছে মৌচাক ছিল। লোকটা হাতের কুড়াল নিয়ে ভালুকের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য হয় নি। ভালুকটা ওকে জমিতে শুইয়ে ফেলে ওর বুকে নাকি চড়ে বসে। ওর মুখ ও নাক থাবার আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়।

স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে লোকটা সেরে গিয়েছিল বলেই শুনেছিলাম।

আর একটা মজার গল্প শুনি দুব্‌লাবেড়া ফরেস্টে।

গত ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমি দুব্‌লাবেড়া পাহাড় ও বনাঞ্চলে কয়েকদিন যাপন করি মিঃ সিংহের সঙ্গে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। বনাঞ্চল ভালবাসি বলেই ভগবান নানা সুযোগ ও সুবিধে আমায় ঘটিয়ে দিয়েছেন অতি অদ্ভুত সব beauty spot দেখবার ও বেড়াবার। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার বনভ্রমণের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই মনে করি। কিন্তু এ ভ্রমণকাহিনীটি বিস্তৃতভাবে এখন বলচি নে, শুধু ভালুকের গল্পটি আমার কাছে বড় মজাদার মনে হয়েছিল বলেই এখানে উল্লেখ করি।

এ দুব্‌লাবেড়া অরণ্যের মাঝখানে একটা উপত্যকা, দুদিকে দুই পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে।এই পাহাড়-শ্রেণীর ওপরে বেশ জঙ্গল তবে তত ঘন নয়; বেশির ভাগ শাল ও কেঁদগাছের বন, তবে একটা পাহাড়ে অজস্র বন্যশেফালি বৃক্ষ। শুধুই শেফালি নয়, শেফালির জঙ্গলও বলা যেতে পারে। এর নাম চরাই পাহাড়, আর ওপারের পাহাড়ের নাম আটকুশি রেন্‌জ্‌। আটক্রোশ দীর্ঘ বলেই বোধ হয় এর এরকম নাম, তবে আমি সঠিক জানি নে ওটা আটক্রোশ লম্বা কিনা।

এই উপত্যকায় ছিল আমাদের তাঁবু, চরা পাহাড়ের ঠিক নিচের ঢালুতে।

রাত্রিকালে একদিন এখানে একজন লোক এল। সে এসে ওখানকার ভাষায় বললে—বড্ড বিপদে পড়েছিলাম ওই পাহাড়ের নিচেটাতে।

লোকটি হাঁপাচ্চে। আমরা বলি—কি হয়েছিল?

বাবু, ভালুকে পথ আটকেছিল।

—কি রকম?

সে আসছিল উপত্যকার মুখে যে বনগ্রাম আছে সেখান থেকে। সন্ধ্যা তখনও ভাল রকম হয় নি। জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা ভালুক মহুয়াফুল খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তার ওপর মাতলামি করছে দেখতে পায়। আর কিছুতেই সে নড়তে পারে

না। এদিকে ওদিকে কোনোদিকেই যাবার উপায় নেই। মাতাল হয়ে ভালুক পথ আটকেচে। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে বাবু!

আমরা বললাম—কি রকম মাতলামি করছিল?

—ঠিক যেমন মানুষে করে। হেল্‌ছিল, টলছিল।

—আপন মনে?

—একদম আপন মনে!

—তারপর?

—তারপর আর কি। সেখানে দু ঘণ্টা বসে। রাত হয়ে গেল। তারপর ভালুকটার কি খেয়াল গেল, পথ ছেড়ে টলতে টলতে বনের মধ্যে ঢুকলো। তাই এই আসচি।

—মাতাল ভালুকে কিছু অনিষ্ট করে?

—বাবু, ও জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। বাঘকে বিশ্বাস করা যায় তবু ও জানোয়ারকে না। ওর মাতলামি দেখলে না হেসে থাকা যায় না বটে, কিন্তু বাবু, সাহস করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। যদি ঘুরে দাঁড়ায়।

সে কথা ঠিক।

এই গেল সিংভূম অরণ্যের ভালুকের কথা। ওদিকে এমন অনেক লোক দেখেছি, যার হয়তো নাক নেই, কি একখানা হাত নেই। ভালুকের হাতে সেগুলো খোয়াতে হয়েছে। পাকা কুল ও মহুয়া ফুলের সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের দিকে বনের পথে একা না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাবধানের বিনাশ নেই।

সিংভূমের বাঘ সম্বন্ধে আরও দু-একটি গল্প এখানে করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সিংভূমের বনে লেপার্ড জাতীয় বাঘ এবং রয়েল বেঙ্গল জাতীয় উভয় প্রকারের বাঘই আছে। উভয় জাতীয় বাঘই ভীষণ হিংস্র। রয়েলবঙ্গল বরং ভাল, লেপার্ড জাতীয় বাঘ বেশি শয়তান। গত বৎসরে আমি সংবাদ পাই স্থানীয় থানায় একটা বাঘ ও একটা মানুষের মৃতদেহ আনা হয়েছে, পরস্পর পরস্পরকে মেরেছে। ব্যাপার শোনা গেল বাসাড়েরা নামে একটি বন্য গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে বর্শা পুঁতে বাঘ মারবার ফাঁদ তৈরি করে। একটা বড় বাঘ ঐ অঞ্চলে উপদ্রব করছিল। সন্ধ্যার দিকে বাঘটা গর্তের মধ্যে পড়ে। বাঘের অবস্থা দেখতে যেমন গিয়েছে, অমনি বৃদ্ধ শিকারী পড়ে গেল বাঘের হাতে। দুইজনে জড়াজড়ি করে ঘোর যুদ্ধ। বাঘ প্রচণ্ড থাবার ঘায়ে লোকটাকে ভীষণ জখম করলে, লোকটাও বর্শার ঘায়ে বাঘটাকে ততোধিক জখম করলো। তারপর লোকজন ছুটে এসে পড়ে, তখন বাঘটা মারা গিয়েছে কিন্তু মানুষটা বেঁচে আছে।

ঘাটশিলার হাসপাতালে আনবার পথে বৃদ্ধও মারা গেল।

একবার আমরা এক অদ্ভুত কথা শুনি। সৌরীনবাবু বলে আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেছেন? সেখানে আমরা পূর্ণিমার রাত্রে গিয়ে দেখেচি ময়ূরেরা এসে নাচে!

—কি রকম?

—একটা পরিষ্কার জায়গা আছে বনের মধ্যে। সেখানে এসে ওরা গভীর রাত্রে নাচে। পূর্ণিমার রাত্রে কিন্তু। অন্য রাতের কথা আমি বলিনি।

—ময়ূরেরা যে এমন কবি, তা জানা ছিল না। দেখাবেন আপনি?

—খুব।চলুন না।

সোরু ঝর্ণা কোথায় কতদূরে সে সন্ধান দিতে পারলেন না সৌরীনবাবু। তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর কোনো ধারণাই নেই। তবে সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বনের মধ্যে এটা তিনি ঠিক জানেন।সে বড় দুর্গম জায়গা।

আমরা এক রবিবারে সুবর্ণরেখার ওপারে পিক্‌নিক্‌ করতে গেলাম। আমার ভাই নুটু, তার বন্ধু সুরেশ, আরও দু-তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপটুপ গাছের তলায় পড়চে, লতাপলাশের ফুল ফুটেচে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেচে। পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কতদূর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় সুমিষ্ট ফল। আমরা উঠিয়ে দিলাম একটা লোককে গাছে। সে উঠে গাছ ঝাড়া দিয়ে অনেক কেঁদফল পাড়লো। স্থানীয় হাটে পাকা কেঁদফল শালপাতার ঠোঙায় বিক্রি হয়। আট-দশটা ফল এক পয়সায়।

পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা অনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেচি কতদূর। চৈত্রের রোদ চড়চে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়চে গাছতলায়। ঝাঁটিফুলের মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে, একস্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেচে। ঝর্ণার দুপাশে বন্য জামবৃক্ষের সারি। ছায়া পড়েচে জলে।

আমরা এই জায়গাটা পিক্‌নিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গরুর গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামানো হোল। সবাই বললে, এখানে ছায়া আছে। এখানেই রান্নাবান্না হোক। সবাই মিলে লেগে গেলো কাজে।

আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথ-রেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম। দেখি না, ওদিকে কি আছে।

আপন মনে পথ চলেচি, বড় রোদ, পাথর তেতে উঠেচে রোদে, মহুয়া ফুল কুড়িয়ে খেতে খেতে চলেচি। পাহাড়শ্রেণী চলেচে এই ক্ষুদ্র পথটির সমান্তরাল ভাবে বামে ও দক্ষিণে।

অনেক দূরে এসে একটা গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা নয়, একটা বড় কুসুম গাছের তলায় ঘর-পাঁচ-ছয় লোক বাস করচে। গ্রামের একটা লোক গাছের তলার ছায়ায় বসে পাহাড়ি চীহড়লতার ঝুড়ি বুনচে। আর শালপাতার পিকার ধূমপাম করচে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতা জড়ানো খানিকটা তামাকপাতা। এক রকম বিড়ি বলা যেতে পারে। কাছে একটা মস্ত কুকুর। কুকুরটাকে দেখে মনে হোল, সেটা বাঘকেও ভয় করে না। করবার কথাও নয়।

বললাম—এটা কি গাঁ রে?

—বালজুড়ি।

—ক' ঘর আছিস্‌ রে?

সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই যে ক'ঘর দেখচিস্‌ রে।

—তোর নাম কি?

—চুক্‌লু।

—কি করচিস্‌?

—দেখতে তো পাচ্চিস্‌। ঝুড়ি বাঁধচি।

—এখানে তো চারিদিকে বন, থাকিস্‌ কি করে?

—হোই। বেশ থাকি।

—হাতি আছে রে?

—হাতি আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে।

বলেই চুক্‌লু আমার চোখের সামনে একটা আশ্চর্য ব্যাপার করলে। অতিথিসৎকারের জন্যে একটা কাঁচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে সে দুখানা কাঠ ঘষে আমার সামনে আগুন জ্বালাল। বললে—ধরাও—

আমি অবাক! এই যুদ্ধের বাজারে দেশলাই কবে পাওয়া যায় না যায়। এ কৌশলটি শিখে রাখলে মন্দ কি? আমি কৌশল শিখতে চাইলাম। চুক্‌লু হেসে সামনের পড়াশি গাছের একটা ডাল ভেঙে এনে তার মধ্যে দা দিয়ে ছোট্ট একটা বিঁধ করলে। আর একটা সরু ডালের এক দিক ছুঁচলো মত করে, সেই বিঁধে বসিয়ে দু হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলে। বিঁধওয়ালা কাঠখানার তলায় রাখলে কয়েকটি শুকনো শালপাতা। দেখতে দেখতে শুকনো পাতা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। চুক্‌লু ফুঁ দিতেই দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বিড়ি ধরিয়ে নিলাম।

আমি ওখানে বসে পড়লুম। আমার উদ্দেশ্য হচ্চে সোরু ঝর্ণার সন্ধান নেওয়া। জায়গাটিও চমকার লাগচে। চৈত্র দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে চারিদিকে। দুদিকে পাহাড়শ্রেণী, মধ্যে এই সংকীর্ণ বনাবৃত উপত্যকা। প্রথম বসন্তে পাহাড়ের বনে কোকিল ডাকচে। মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ গরম বাতাসে। চুক্‌লুর দুখানা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালা। কাচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে খাওয়া। মুক্ত জীবনের ছন্দে মুখর দুর্লভ মধ্যাহ্নটি।

ওকে বলি—চুক্‌লু,ময়ূর দেখেচ বনে?

—মজুর? আছে, অনেক আছে। মজুর কত নিবি?

—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচিস্?

—হ্যাঁ, ক্যানে শুনবে না।

—ওখানে ময়ূর আছে?

—মজুর সব বনেই আছে। এই সব পাহাড়েও আছে। এখানে বোস, সাঁজের সময় কত মজুর দেখবি।

কিন্তু পূর্ণিমায় সোরু ঝর্ণার শিখী নৃত্য?সেটা উপকথা না কিংবদন্তি! তার মূলে কিছু আছে কিনা, সে সন্ধান এখানেই আমার আজ নিতে হবে। সে সন্ধানেই বেরিয়েছিআজ।

থলকোবাদে একরাত্রি

['বনে-পাহাড়ে' রচনার পৃষ্ঠপট সারান্ডা অরণ্যে ভ্রমণের সময় বিভূতিভূষণ বনগ্রামবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রাকারে তাঁহার এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাটি লিখিয়া পাঠান। এই পত্রটি 'পল্লীবার্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। বস্তুত ইহাই বনে-পাহাড়ের সৃষ্টিকেন্দ্র। তৎসত্ত্বেও এই রচনার একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, সেই জন্যই এটি পৃথক রচনা হিসাবে এই গ্রন্থে মুদ্রিত করা হইল।—সম্পাদক : বিভূতি রচনাবলী।]

শ্রীচরণেষু,

নিবিড় বনমধ্যস্থ এক বনবিভাগের বাংলো থেকে লিখছি এ চিঠি। গত ৯ই তারিখে ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে রেলে এসেচি চাঁইবাসা, তারপরে মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে এসেচি ৬৭ মাইল কুমডি বাংলোতে। গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি হয়ে। গুয়া ছাড়িয়ে এই ২৭ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই—সারান্ডা অরণ্য, ছোটনাগপুরের সর্বাপেক্ষা নিবিড়তম অরণ্য। ১৬ দিন এই গভীর অরণ্যের মধ্যে বনবিভাগের বাংলোতে ও তাঁবুতে থেকে সারান্ডা অরণ্য সবটাই ঘুরবো। কোথাও ডাকঘর বা লোকালয় নেই—এই চিঠি বন বিভাগের পেয়াদা ২০ মাইল হেঁটে বনপথে জেরাইকেলা নিয়ে গিয়ে ডাকে দেবে। যেতে লাগবে ২ দিন ডাকঘরে। কবে চিঠি পান দেখবেন তো? ক'দিনে বনগাঁ যাবে এ বড় কৌতূহলজনক।

কাল গিয়েচে পূর্ণিমা। বাংলো একটা বনাবৃত ছোট পাহাড়ের চূড়ায়। মধ্যে একটা উপত্যকা। যেদিক থেকেই দেখি নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলচূড়া ঘিরে আছে চারিদিকে। গভীর রাত্রে কাল জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যে যখন ময়ূর ও সম্বর হরিণের ডাক শুনলুম, তখন সত্যই মনে হোল কোথায় আছি? বন্য হস্তীর উপদ্রব সর্বত্র। যেখানে সেখানে হাতির নাদ পড়ে আছে।

কাল বড় মজা হয়েচে। চা খেয়ে আমি, মিঃ সিংহ ও রেঞ্জ অফিসার মিঃ গুপ্ত তিনজনে বাংলো থেকে নেমে বনপথে বেড়াতে গেলুম হেঁটে। কি সুন্দর অপরাহ্ণের ছায়াবৃত সে অপূর্ব বনকান্তার! ময়ূর-নিনাদিত বনভূমি বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল দেখে মিঃ গুপ্ত বল্লেন, চলুন, অন্ধকারে হাতি বেরুবে। যদিও পূর্ণিমা কিন্তু এ বনে চতুর্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। এই এক ঘণ্টা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত বনের মধ্যে এক পাথরের ওপর বসে থাকা নিরাপদ নয়। এমন সময় মানুষের গলা শোনা গেল পায়ে চলা সরু পথটার ও-প্রান্তে। যারা আসচে তারা আমাদের দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। আমরা ডাক দিলুম, দুজন হো জাতীয় লোক। তারা বল্লে—বালজুড়ি থেকে চাল কিনে আসচি। হো ভাষায় বল্লে, মিঃ গুপ্ত জানেন এ ভাষা। বালজুড়িকোথায়? ওরা বল্লে, বোনাইগড় স্টেট। কখন বেরিয়েচ? বল্লে, বেলা দশটায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অরণ্যভূমির ওপারে উড়িষ্যার বোনাইগড় করদরাজ্য। সেখানে চাল ছ'সের টাকায়। লোক দুটি সেখানকার সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বনে বনে পালিয়ে আসচে সস্তা চাল নিয়ে। আমাদের ভেবেচে সারান্ডা বনের সীমান্তরক্ষী। তাই এই ভয়।

কিন্তু কি অপূর্ব সৌন্দর্য হোল পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল সে বনভূমির। গম্ভীর অরণ্যানী, চতুর্দিকে পাহাড় আর বনাবৃত উপত্যকা। পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় সে সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। চলে আসচি, গভীর বন কুকুর-ডাকার মত শব্দ। মিঃ গুপ্ত বল্লেন, ও কুকুর নয়, লোকালয় নেই, কুকুর কোথা থেকে আসবে? ও বার্কিং ডিয়ার, এক প্রকার হরিণ। কে বর্ণনা দিতে পারে এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমির?গম্ভীর অরণ্যে দূরের কোনো পার্বত্য নদীর অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও ঝিঁঝি পোকা এবং নৈশ পাখির কুজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস। না দেখলে উপলব্ধি হবেই বা কেমন করে! বনের মধ্যে পাষাণময় তীরভূমির মধ্যে দিয়ে কোইনা নদী বয়ে যাচ্ছে, জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা সেখানে রাত্রে পিকনিক করতে যাবো ঠিক হয়েচে।

এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বতশিখর শশাংদাবুরু ৩০৩৮ ফুট উঁচু। সারা সকাল ধরে বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরশু আমরা এই শিখরে উঠেছিলুম। অত্যন্ত দুরারোহ ও ঘন বনে আচ্ছন্ন সরু পথ দিয়ে উঠচি, উঠচি, তার যেন আর শেষ নেই। এক একটা শাল গাছ কলের চিমনির মত ঠেলে উঠেচে আকাশে, কোথাও বন্য দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, আরও কত কি বনকুসুম ফুটে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, কে তাদের নাম জানে? কোথাও ঝর ঝর করে পড়ছে পাহাড়ি ঝরনা—শশাংদাবুরু শিখরদেশ থেকে খাড়া নিচে পড়চে, বনে বনে প্রধ্বিনিত হচ্ছে তার শব্দ। কোথাও বনের মধ্যে বুনো রামকলা গাছ, কে খায় সে কলা হাতি আর বাঁদর ছাড়া! এই সারান্ডা অরণ্য অবিচ্ছেদ্য ৪০০ বর্গ মাইল, জনহীন, শুধু বন বিভাগের বাংলো ছাড়া কোনো থাকবার জায়গা নেই, বনবিভাগের তৈরি মোটর রোড ছাড়া রাস্তা নেই। উঠতে উঠতে ঘন ঘন হাঁপাচ্চি, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা মারচে, পা সামান্য তুলতেও কষ্ট হচ্চে। আবার বনের মধ্যে এত বেলাতেও সূর্যের আলো পড়েনি, সে নিবিড়তা ও গাম্ভীর্যের তুলনা কোথায়?

ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম, সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে ফরেস্ট গার্ড কুড়ুল দিয়ে একটা আমলকী গাছের ডাল কাটলে। তখন দেখি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েচি, কত নিচে উপত্যকা—দূরে দূরে শুধুই বননীল শৈলশিখর। যেদিকে চাই, পাহাড় আর বন, বন! বড় বড় কেলিকদম্বের পাতা বিছিয়ে বসেচি খাড়া বাঁকা পথটার গায়ে, গড়গড়িয়ে যদি পড়ি, তবে ২০০০ ফুট নিচু উপত্যকার পাষাণময় ভূমিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবো। ওপরে উঠে গেলুম তখন বেলা দুটো। ওপরে উঠে দেখি, বা রে, যেন খয়রামারির মাঠ। অনেকখানি সমতল মাঠ২ মাইল লম্বা, প্রায় দেড় মাইল চওড়া। বা রে মজা! মাঠের মাঝে মাঝে কেলিকদম্ব, দেবকাঞ্চন ও শাল। এক জায়গায় একটা জলাশয়। তার তীরে নরম কাদায় বহু গরু ও মহিষের পদচিহ্ন। আমি বল্লুম এখানে গরু চরে কাদের? রেঞ্জ অফিসার গুপ্ত হেসে বল্লেন, গরু কোথা থেকে আসবে এ জনহীন অরণ্যে ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায়? ওগুলো বাইসন আর সম্বর হরিণের পায়ের দাগ। ফরেস্ট গার্ড হো-জাতীয় বন্য লোক, সে সব পায়ের দাগ দেখে বল্লে, বুনো শুয়োর, বাইসন আর সম্বরের পায়ের দাগ। হাতিও আছে। বাঘ? এখানে জল খায় না।

ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। সঙ্গে খাবার নিয়ে উঠেছে দুজন ফরেস্ট গার্ড। এক পাথরে বসে পেট পুরে খেলুম। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চা হোল। ওঁরা তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, চলুন, বড় বাইসন আর হাতির ভয়। আবার নামি সেই উত্তুঙ্গ পর্বতশিখর থেকে নিম্নের ঘন বনের মধ্যেকার সরু দুর্গমপথ দিয়ে। ওটাও যেমনি, নামতেও তেমনি। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় নিচে নামলুম বটে, কিন্তু নামলুম কোথায়? বনের মধ্যেই। বনের ছায়া নিবিড়তর হয়ে সান্ধ্য অন্ধকারে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েচে। ফরেস্ট গার্ড বলচে, হুজুর হাতি বেরুবে, জলদি চলুন। কিন্তু বল্লেই ত হয় না। আরও আড়াই মাইল হেঁটে তবে আমাদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছবো।

মোটর পর্যন্ত পৌঁছতে সন্ধ্যা হোল। হঠাৎ গার্ড বল্লে, হাতি! হাতি! চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের গায়ের বনে রাঙাধুলোমাখা হাতি একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। তখন সন্ধ্যা, ভাল দেখা যায় না—কেউ বলে হাতি, কেউ বলে না। আমরা মোটরের ভেঁপু বাজাতেই দেখলুম, রাঙাধুলোমাখা জিনিসটি গাছতলা থেকে সরে গেল, সুতরাং নিশ্চয়ই হাতি।

—শুক্লাচতুর্দশীর অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠলো তখন আমরা পার্বত্য কোইনা নদীর উপলাত্তীর্ণ তীরে পৌঁছে গিয়েছি। দুধারের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। বল্লুম, চা খাওয়া যাক। চা আছে, চিনি আছে, দুধ নেই। আগুন করা গেল হাতির ভয়ে। বাংলো আরও ২ মাইল দূরে। ডালপালার আগুনে কেটলিতে জল চড়িয়ে দেওয়া হোল। যেদিকে চাই সেদিকেই ঝিল্লীমুখর বনানী। জ্যোস্নাস্নাত প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্মমরণভীতিভ্রংশি কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যাঁর করুণায় আজ আমার মত

দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটলো। তাঁরই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠচে।

এই পর্যন্ত লিখে বেলা সাড়ে পাঁচটার পরে সিংহ, আমি ও গুপ্ত বনের পথে বেড়িয়ে এলুম। আজ আবার প্রতিপদ, চাঁদ উঠতে দেড় ঘণ্টা দেরি। বনানীর চেহারা দেখে অন্ধকারে আমার বড় ভয় হোল ফিরবার পথে। আমি বলি, চলুন, হাতি বেরুবে। আব ঠিক সন্ধ্যায় কাঁকাঁ শব্দে কি ময়ূরই ডাকচে বনে। এদিকে একটা ডাকে, ওদিকে গভীর বনে একটা তার উত্তর দেয়—ওদিকে আর একটা ডাকে, অন্যদিক থেকে তারউত্তর আসে, যেন পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি চলচে। বাংলোতে ফিরে এসে দেখি একদল হো নরনারী হো নাচ দেখাতে এসে বসে আছে। তারা রাত দশটা পর্যন্ত নাচলো, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে বেশ নাচলে। দু টাকা বকশিশ পেলে।

এইখানে কালও আসবো। পরশু যাবো ১৫ মাইল বনপথে তিরিশপোখী। সেখান থেকে ছোটনাগরা, তারপর সলাই, সেখান থেকে Ankua water falls দেখতে যাবো গভীর বনের মধ্যে ২২ মাইল। ১৬ দিনের টুর প্রোগ্রাম আছে। তবে বড্ড ভীষণ শীত পড়েচে। থলকোবাদ বাংলো, যেখানে বসে লিখচি, এর উচ্চতা ১৮৩০ ফুট। তিরিশপোখী ১৯৭৫ ফুট, এত উচ্চ স্থান, বনে ঘেরা—৪০০ বর্গমাইল গভীর অরণ্যের মধ্যে, সুতরাং শীত তো হবেই। Ankua waterfalls নাকি একটি চমৎকার দৃশ্য, মিঃ সিংহ বলছিলেন।

এদিকে চাল ৪ সের টাকায়—অবিশ্যি এ বনে নয়। এখানে লোকালয় নেই—গুয়া নামক স্থানের বাজারে দেখে এসেচি। বোনাইগড় স্টেটে ৬ সের টাকায়, সেখান থেকে অনেকে বনপথে চাল লুকিয়ে আনতে যায়—কারণ স্টেট থেকে বার করে আনবার জো নেই। ওখানে কেমন?

আপনি কেমন আছেন? মিতে কোথায়? আপনাদের কথা মনে হয় বড্ড। কালও সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যপথে বেড়াবার সময় ভাবছিলুম এতক্ষণ দূর বনগ্রামের একটি ছোট্ট ঘরে আপনারা বসে গল্পগুজব করচেন। যতীনদা এসে সকলকে হাসাচ্ছেন, আপনি ঘন ঘন তামাক সাজচেন, শিবেনদা চুপ করে বসে আছেন, বিনয়দা গল্প করচেন, সুবোধদা কত সস্তায় ওবেলা মাছ কিনেচেন সেই গল্প করচেন, জয়কৃষ্ণবাবু তামাক খাচ্চেন, হরিদা এত রাত্রে নেই, ঠাণ্ডার ভয়ে বিকেলেই বাড়ি চলে গিয়েচেন, মনোজবাবু বোধহয় আজকাল আসে না, মিতেও আসে না—কনট্রাকটরি নিয়ে ব্যস্ত। বেশ লাগে ভাবতে এত দূর থেকে—মনে হয় ওরাই সব আমার আপন লোক, কতদিনের নিবিড় পরিচয়ের প্রিয় সাথীবৃন্দ, কত ভালবাসি সকলকেই। ওদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা জানাবেন, আপনি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। দুলিকে আশীর্বাদ দেবেন, সে কি আমার কথা মনে করে? যতীনদাকে কতদিন দেখিনি, বড্ড মনে হয় যতীনদার কথা। ইচ্ছে হয় আপনাকে ও যতীনদাকে নিয়ে এসে বিশ্বশিল্পীর এ সৌন্দর্যভূমি দেখাই, কিন্তু তা কোথায় হচ্ছে! স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আশা করি যতীনদা কুশলে আছেন।

পুঃ—এই চিঠিখানা মনোজবাবুকে দেবেন 'পল্লীবার্তা'য় ছাপাতে। চিঠির আকারেই দেবেন। প্রুফটা যেন মনোজবাবু* ভাল করে দেখে দেন। তাঁকে প্রীতি জানাবেন।

আপনাদের—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* মনোজকুমার রায়

১৯৩৪

১লা জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৭ই পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

আগের দিন কল্‌কাতায় এসেচি বনগাঁ থেকে দারোগার সঙ্গে। অনেক রাত পর্যন্ত দেশে আগের (?) রাত্রে পট্‌কাত (?) সাহাদের বাঁশী শুনেচি [।]

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৪শে পৌষ, ১৩৪০।সোমবার

দেবব্রতের ব্যাড্‌মিন্টন মাঠে এদিন গিয়ে অনেকদিন পরে খেলেচি।

১০ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৬শে পৌষ, ১৩৪০। বুধবার।

কানাই-এর সঙ্গে রায়চৌধুরীদের বাড়ি গেলাম হরি ঘোষের স্ট্রীটে। পথে হোস্টেলে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৮শে পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে সরস্বতী পুজোর ঠাকুর ঠিক কর্তে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে কুমারটুলি গেলাম। সঙ্গে যতীন, মোহিত ইত্যাদি। একটা দোকানে চা খাওয়া গেল। তারপর ট্রামে বাসায়। তার আগে বিভূতিদের ওখানে গেছ্‌লাম। বিভূতির সঙ্গে দেখা। মন্মথদের কাছেও গেলুম। বাসায় এসে দেখি দক্ষিণাবাবু ও ছোটমামা বসে। ছোটমামার সঙ্গে বার হয়ে মানিকতলা গেলুম বাড়ি ঠিক কর্তে। পরে রমেশ কবিরাজের আড্ডায় গেলাম। দক্ষিণ হাওয়া দিচ্চে। গত বছরের ডায়েরি খুলে দেখলুম গতবারও ঠিক আজকার দিনটিতে কুমারটুলিতে ঠাকুর বায়না দিতে গেছ্‌লুম।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২৯শে পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে খুব কুয়াশা। রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম। একটা পুরোনো পথ দিয়ে যেন যাই মাঝে মাঝে। ওই পথের ধারে একটা বাড়ি আছে মাঠের মধ্যে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দেবার পরে গেলাম সুশীলবাবু ও নীরদবাবুর ওখানে। চা খেয়ে বিভূতিদের ওখানে। তাদের নাটক হবে তাই select করে দিলাম। অনেক রাত্রে পুরোনো সেই গলির মধ্য দিয়ে চলে এলুম। পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে তিলের নাড়ু তৈরি করচে।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৩০শে পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

পৌষ সংক্রান্তি, অনেককাল আগে এই কল্‌কাতাতেই কাশী মিত্রের ঘাটে মার সঙ্গে নাইতে যেতে যেতে হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তিলুয়া কিনে খেয়েছিলুম—তিলের লাঠি গোছের—মা কিনে দিয়েছিলেন—মনে পড়ে গেল।

সকালে মণি বোসের বাড়ি গিয়ে সুধীর চৌধুরীদের সঙ্গে দেখা হোল। খেয়ে বেলঘরে গেলুম। এসে আবার মণির বাড়িতে মণির মা নিমন্ত্রণ করেছিলেন—সেখানেই খেলুম। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১লা মাঘ, ১৩৪০।সোমবার

সকালে উঠেই স্নান না করে ব্রজেনদার কাছে—প্রবাসীর কপি দিতে। সেখানেভাগলপুরের জ্যোতিনাথবাবু বসে। তারপর গেলুম ট্রামে সজনী দাসের কাছ হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি। পথে কার্জন পার্কে ডালিয়া ফুল দেখতে গেলুম। বিভূতিদের বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছি—এমন সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প। দারোয়ানরা ছুটতে ছুটতে বার হয়ে আসচে। সবাই গিয়ে রাস্তার ওপর দাঁড়ালুম। তারপর থেমে গেলে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সরমপ্রসাদ ও যুগল মণ্ডলের সঙ্গে দেখা। কথাবার্তা হোল [—] ঘণ্টুকে কাছে নিয়ে বসলুম। তারপর ট্রামে বঙ্গশ্রী হয়ে নীরদবাবুর flat-এ পিঠে খেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। ওয়াছেল মোল্লার দোকান হেলে পড়েচে দাঁড়িয়ে দেখচে সবাই। ভিক্টোরিয়া হাউস ফেটে গেছে। ওখানথেকে আমি, পরিমল, প্রমথ হেঁটে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বাসা।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা মাঘ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে উঠে সিরাজুলের বাড়ি? স্ট্রীটে হাব্‌লাকে সঙ্গে নিয়ে। সেখান থেকে উদয়ন হয়ে স্কুল। তারপর বিভূতিদের বাড়ি [।] স্কুল থেকে প্রবাসী। প্রবাসী থেকে রমেশবাবুর আড্ডা হয়ে—পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৩রা মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

আজও সকালে সুপ্রভার হোস্টেল হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে উদয়ন—সেখানে থেকে হেঁটে প্রবাসী। প্রবাসী থেকে নীরদবাবুদের flat-এ। সেখান থেকে রাত দশটায় মেস্।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৪ঠামাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে ট্রেনে বনগাঁয়ে এলাম। ভয়ানক শীত। এ ধরনের শীত ভাগলপুর ছাড়া দেখিনি। তফাৎ এই যে সেখানে পশ্চিমে হাওয়া এর ওপর [—] বরং এখানে সেটা নেই।

এসে খয়রামারির দিকে গেলাম তারপর—স্নান সেরে খুকির চড়ুইভাতির রান্না খেয়ে বেড়াতে গেলাম। বীরেশ্বরবাবুর ওখানে গেলাম। তারপর একটু শুয়ে উঠে দেবেনের সঙ্গে বাড়িতে গেলাম। সেখানে হাটে পালং শাক্ আলু সিম্ কিন্‌লাম। হরিপদদাদা-ফণিকাকা, শ্যামচরণদা সবার সঙ্গে আলাপ হোল। মাখনের দোকানে তামাক খেলাম। তারপর চলে এলাম। দেশকে এত ভাল লাগে। দারিঘাটার কাছ থেকেই আমি হাঁ করে চেয়ে থাকি গ্রামের দিকে।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই মাঘ, ১৩৪০।শুক্রবার।

সকালে উঠ্‌তে একটু দেরি হোল। যখন খয়রামারি মাঠে গিয়েচি তখন রৌদ্র উঠেছে। তারপর এসে লিখলাম। স্নান করে খেয়ে একটু ঘুমুলাম। উঠে হাটে গুড় কিনে আনলাম। তারপর—খয়রামারির মাঠে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয়েচে। ফিরে এসে মন্মথ মোক্তারের বাসায় গিয়ে কালীপদ যাদুকরের গল্প শুন্‌লাম। সেখান থেকে মুন্সেফ বাবুর সঙ্গে দেখা কর্তে বিনয় দত্তর বাড়ি গেলাম। রাত্রে ফিরেচি।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৬ই মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে সরস্বতী পুজোর জন্যে ব্যস্ত রইলুম। সকালে স্নান সেরে এসে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম। কালীপদ যাদুকরের খেলার জন্যে সকালে থানায় তাকে ডাকানো হোল। বৈকালে তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালুম [—] কিছুই হোল না। টরু ও কালো দুপুরে আমার কাছে এল, আমি ঘুমিয়ে উঠেচি।ওদের নিয়ে স্কুলে গেলাম। যতীশদা খেতে বললে আমি খেলাম না। মন্মথ মোক্তারের বাসায় গেলুম। সেখান থেকে ফিরে খয়রামারিতে গেলাম। রাত্রে মন্মথর ওখানে আড্ডা দিলাম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৭ই মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে গেলাম—তখন খুব সকাল—ফেরবার সময় সূর্য উঠল। থানার মাঠে কালীপদ খেলা দেখালে। তারপর খেয়ে একটু বিশ্রামের পরে মুন্সেফ্ বাবুর বাসায় কালীপদর খেলা দেখতে গেলাম। ফিরে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গল্প করলুম। তারপর মিতের মোটরে স্টেশনে এলাম। আমি, সুনীল ও মিতে। সারা পথ গল্পে কাটল। কলকাতায় এসেই হেঁটে গেলাম স্কুলে। পথে সরস্বতী পুজোর ধুমধাম। ছেলেরা খাওয়ালে।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩৪।৮ই মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুলের ছুটি হোল। বঙ্গশ্রী আপিসে শিশুত্রাণ সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি, অনাথবাবু ও সজনী বসে রইলুম। অনাথবাবুর মুখে শুনলাম বড় বাসা ভেঙে গেছে—ভূমিকম্পে। তারপর উদয়ন আপিস হয়ে একটা সেলুনে চুল ছেঁটে বাসায় ফিরি।

আজ শীত কম।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই মাঘ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে গিরীন সোম এল বিচিত্র জগতের জন্যে। স্কুলের ছাদে আমি আর মৌলবী রোদ পোয়ালাম। ঘোলা বলে পার্শী ছেলেটাকে ডেকে তার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করি। বেশ ইংরেজি বলে। তারপর টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। রঞ্জনের ক্লাসে আজকাল পড়াই। রঞ্জনকে কটা বেজেচে দেখতে পাঠিয়ে সকালে ছুটি দিলাম। প্রবাসী আপিসে গেলাম—আশু সান্যাল সেখানে ছিল। তার সঙ্গে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে এলাম। একা P. C. Sircar-এর দোকানে গেলুম। সেখান থেকে College Sqr.-এ বসে ভাবলুম ১৯১৮ সালের এই সময়ে এই সব বেঞ্চিতে বসে ভাব্‌তুম।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১০ই মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে পি. সি. সরকার এল বিচিত্র জগতের জন্য। তারপর আমি স্কুলে গেলাম। সেখান থেকে টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলাম। ছুটির পরে এলাম প্রবাসীতে। একশো টাকা আদায় করে নিয়ে আবার গেলুম পি. সি. সরকারের সঙ্গে কথা বলতে বঙ্গশ্রীতে। বার হয়ে নেড়ার কাছ থেকে ২ টাকা নিলাম ধার বাবদ। Wide World কিনে নীরদবাবুর flat-এ। সেখান থেকে বার হয়ে সতীশের দোকানে জামা নিয়েই বাসায় এসে দেখি পশুপতিবাবুর ‘পরলোকের কথা’ ২য় সংস্করণ একখানা দিয়ে গেলেন।

বেজায় ধোঁয়া কল্‌কাতায়।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১১ই মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উদয়ন প্রুফ নিয়ে গেল। আমি খাবার উদ্যোগ করলুম। স্কুলে গেলুম। সেখান থেকেই টিফিনে বঙ্গশ্রী ও সকালে বার হয়ে হেস্টিংস স্ট্রীটের পি. সি. সরকারের বাসায়। সেখান থেকে আবার বিরাজের মেসে এলুম substitute ঠিক কর্তে। তারপর বেরিয়ে ওয়াছেল মোল্লার দোকানে মোজা কিনে একটা দোকানে খাবার খেয়ে ট্রামে বাসায় এসে দেখি তিনু ও বনগাঁয়ের সে কালো ছেলেটা বসে আছে। জিনিসপত্র গুছিয়ে ভাটপাড়ায় এলুম সাড়ে দশটার সময়। অনেক শীত।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৪।১২ই মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

খুব সকালে উঠে কুয়াশায় গঙ্গার নদীঘাট হয়ে প্রমোদবাবুর বাসায় গেলুম। প্রমোদবাবু আমায় দেখে অবাক। চা খেয়ে দুজনে গল্প করলুম। ষাঁড়েশ্বর পার হয়ে বাসায় এলুম। হালার মা এসে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আশার সঙ্গে দেখা হলো—সে অতি বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছে। তারপর মাথা ধুয়ে খেয়ে নিলাম। ঘোড়ার গাড়িতে করে নৈহাটি এলুম। কলকাতায় এসে মেসে এলুম। আমি আর নুটু বেরিয়ে পড়ি। টিকিট করে বম্বে মেলে রওনা। রাত ৯॥০ টায় গালুডিতে নামলুম। প্ল্যাটফর্মে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—তারপর গাড়ি এল—বাংলোতে এলুম।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে দেখি বেশ বাসা। পেছনে একটা পাহাড়। চারিধারেই পাহাড়। একটা দোকানে আমি ও ছোটমামা জিনিসপত্র কিনে সুবর্ণরেখাতে স্নান করতে গেলুম। সুবর্ণরেখার জল ভারি চমৎকার। বৈকালে আবার মামীদের নিয়ে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গেলুম। রাত্রে অতি চমৎকার জ্যোৎস্না। স্থানীয় পোস্টমাস্টার এলেন। আগে মেদিনীপুর ছিল এদের শহর। ৬০ মাইল দূরে। গরুর গাড়িতে যেত। সামনে দিয়ে বরাভূম ও মানভূমের রাস্তা চলে গেছে।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৪ই মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বেড়াতে বেরুলাম। খুব শীত। একটা পাহাড়ের ওপর উঠে খানিকটা বসে রইলুম। তারপর নন্দীবাবুদের খামারের কাছে আর একটা বড় পাহাড় [—] সেইটার ওপর উঠে রইলুম। ছোটমামার সঙ্গে বলরাম সায়ের নামে একটা বাঁধের জলে স্নান করতে গেলুম। ইসমাইলপুরের জীবন মনে পড়ে। জ্যোৎস্না রাত্রে

জনমানবহীন মাঠের মধ্যে বাংলার কাছে পাহাড়টার নিচে বেড়াতে যাই। ভারি ভাল লাগে। বৈকালে ঘুমিয়ে উঠে মামিমাকে নিয়ে আবার সেই পাহাড়টাতে বেড়াতে গেলুম। বাসার সাম্‌নে একটা জায়গায় ঢোল বাজাচ্ছে আর নাচ্‌ছে। গিয়ে দেখি মেয়েরা নাচছে।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৫ই মাঘ, ১৩৪০ সোমবার

সকালে উঠে দেখি মামীমা পাহাড়ের উপর—আমিও পাহাড়ের ওপর উঠে বস্‌লুম। তারপর খানিকটা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখ্‌লাম। বৈকালে হাট হোল—হাটে গেলাম।এখানে সাঁওতাল মেয়েদের স্বাস্থ্য খুব সুন্দর। কথা বাঁকা বাঁকা বাংলা। হাটে গয়না [,] হরীতকী [হরিতকী] বিক্রি হচ্চে। একটা পাথরের ওপর অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৬ই মাঘ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

আজ বড় মেঘলা দিন। সকালে উঠে স্টেশনে ডাক্তার ডাক্‌তে গেলাম। দুপুরের পরে রাখা মাইন থেকে এক ডাক্তার বেড়াতে এল—তার কাছে সুবর্ণরেখার অপর পারের পাহাড় জঙ্গলের বিষয় অনেক কথা শুন্‌লাম। স্থানীয় হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আদিম অধিবাসীদের বিষয় অনেককথা শুন্‌লাম। ডমনচন্দ্র মুরারী বলে একটা মুণ্ডা ছেলেকে ডাকিয়ে বাংলা রিডিং শুন্‌লাম। বাসার চারিধারে পাহাড়—উঁচু নিচু জমি চমৎকার দেখায়। বৈকালে স্টেশনে বেড়াতে গেলুম—স্টেশন মাস্টার আমাদের দেশের লোক—চারুবাবু হেডমাস্টারের ছাত্র। সন্ধ্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠ্‌ল। পূর্বদিকের পাহাড়ের মাথায় বেশ দেখালে। রাত্রে একবার খুব জ্যোৎস্না উঠ্‌ল—চারিধারের পাহাড় প্রান্তর চমৎকার দেখায়। ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ—কেবল তফাৎ এই যে এখানে সংসার ও ঘর গেরস্থালির আবহাওয়া। আমি রোজই ভাবি সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড় যেন Beaver Dam Mountain—বুনো হাতি নামে ওপারের জঙ্গলে।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪। ১৭ই মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে?...গীত গোবিন্দ অর্থাৎ মেঘৈর্মেদুরম্বর [—] খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে। পাহাড়টার দিকে বেড়াতে যাব কি মনে হোল মামিমারা ওই ছোট পাহাড়টার ওপরে বসে আছে। একটু বেলা হোলে বুঝলাম সেটা ভুল। স্টেশনে খুকিদের নিয়ে গেলাম। এই ঘর গেরস্থালি, নন্দীবাবু-?—জমি বন্দোবস্ত—এ বাংলায় ও বাংলায় গিয়ে পড়িয়ে এসব আমার ভাল লাগে না।

রাত্রে কি অপূর্ব জ্যোৎস্না উঠেচে। চারিধারে পাহাড় উঁচু নিচু টিলা, ডুংরি পাহাড়, এক একটা নটরাজের মূর্তি?— weird ও অদ্ভুত দেখায়—জঙ্গলে বুনো হাতি, বনমোরগ, বাঘ, হরিণ, ভালুক—প্রভৃতি আছে এমন পাহাড় ও জঙ্গল—সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ স্টেটের মধ্যে। ডাইনে চাঁইবাসা, নেতার হাটের পাহাড়। একটা পাথরের ওপর কতক্ষণ বসে রৈলুম। ও পাশের পাহাড়টার ওপর দিকে চাঁদ উঠ্‌ছে। ইসমাইলপুরের মনের ভাব আবার ফিরে এসেচে—এ জায়গা প্রাকৃতিক সম্পদে—তার চেয়ে ভাল [—] তবে তেমন নির্জন নয়।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৮ই মাঘ, ১৩৪০।বৃহস্পতিবার

খুব সকালে উঠে পাহাড়ের দিকে গেলাম। আজ খুব শীত। মেঘে কেটেছে। হুহু পশ্চিমে হাওয়া দিলে সারাদিন। ঠায় রোদে খাটিয়া পেতে বসে রইলুম। তবুও শীত কমে না। কাল বাড়ির পেছনে শিলাসনের ওপর বসে লিখেছিলুম—আজ শীত [শীতে] আর পারলাম না। বারোটার পরে বলরাম সায়েরের ওপারের ঘাটটাতে নাইতে গেলুম। একটা চমৎকার গাছ ও পাহাড়ের দৃশ্যটা দুপুরে চমৎকার দেখায়। ঝাঁ করে ডুবদিলাম—নৈলে শীত করে। আসবার সময় রাঙা বালির পথ জাঙ্গিপাড়ার কথা স্মরণকরিয়ে দেয়। দুপুরে লিখলাম ও ভাবলাম। বৈকালে পোস্টমাস্টারের বাড়ি বেড়াতে গেলাম—পথে দামোদরজীর মন্দিরে বসলুম। স্টেশনে হরি ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা হোল—তার ডিসপেন্‌সারিতে বসে। বেরিয়ে অবাক্ হয়ে গেলাম—কি জ্যোৎস্না উঠে গাছ পাহাড় weird করে দিয়েচে—আসবার পথে মনে হচ্চিল সিংভূম অঞ্চলে এইসব

জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে পথের ধারে তাঁবু ফেলে যদি থাকি! বাঘ, বুনোহাতির মধ্যে।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৯শে মাঘ, ১৩৪০।শুক্রবার

আজ সকালে উঠে সুবর্ণরেখা পার হয়ে চাপ্‌ডি তামার খনিতে বেড়াতে এসেচি ও সেখান থেকে একটা নদীখাতের ভিতর দিয়ে গেলুম চারিধারে উচ্চ পাহাড় ও জঙ্গল ঘেরা পাটকিটা বলে গ্রামে। যাবার পথে কি অনাবৃত পর্বত দেহ-স্তরগুলো তির্যক ভাবে উঠেচে—বিরাট শিলাস্তর—আমরা বাংলা দেশের লোক [—] দেখে অবাক হয়ে থাকি। পাটকিটা যেতে অড়রের ক্ষেতে ও পাহাড়ের তলায় ঝর্ণার জলের ধারে কাদায় বন্যহস্তীর পদচিহ্ন দেখলুম। হাতি তাড়ানোর জন্যে ফসল ক্ষেতের মধ্যে বাসা বাঁধা। বানা অর্থাৎ বনময়ূর কুল খেতে রাত্রে আসে দলে দলে। শাল পিয়ালের বনের মধ্যে দিয়ে পথ—আমি এখন একটা পাহাড়ের মাথায় বসে বসে লিখ্‌চি আর খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে জঙ্গলের মধ্যে আড় চোখে চেয়ে দেখ্‌চি ভালুক আস্‌চে কিনা। বাঘ, ভালুক, হাতি, নেকড়ে—সব আছে। জঙ্গলে জারুল ফুল ফুটেছে—চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুলের ঘন সুগন্ধ বার হয়—একজন উড়িয়া খনি ইনস্‌পেকটার আমাকে তামা ore ও mica schist দেখালে। বলে এ পাহাড়ে ১৪ p.c. তামা আছে। সাগই [?] বলে একটা জাত তামা গলিয়ে তৈরি করতো—পথে হাঁটতে হাঁটতে অসংখ্য তামার ore ও লোহার ore [—] এর সঙ্গে তামা পোড়ানো গুল দেখলাম। এই পাহাড় ও জঙ্গলের এই দিকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত এইরকম ঘন। এটা অবিশ্যি সিংভূম। সিংভূমের দৃশ্য অপূর্ব।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২০শে মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকাল বেলা ছোট মামার সঙ্গে বসে গল্প করলুম। খ্যাঁদা এল ১৷৷০টার গাড়িতে টাটানগর থেকে। খ্যাঁদা এল তার সঙ্গে গল্প করলুম। বৈকেলে নন্দীবাবুর গোলার দিকে বেড়াতে গেলুম। শালবনের মধ্য দিয়ে আস্‌তে অন্ধকার হয়ে গেল। রাত্রে বেজায় শীত পড়ল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২১শে মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

ছোটমামা আজ ১টার গাড়িতে চলে গেল। আমার পায়ে বড় ব্যথা। পাহাড়টার দিকে আতাগাছটার কাছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে একটু বসি। বাংলোর পিছনে পাথরের স্তূপে একটা পাথরে বেশ ঠেস্‌ দেবার জায়গা আছে। সন্ধ্যার আগে বাংলার মেয়েরা এসে মামিমাদের নিয়ে গেল মোহিনীবাবুর বাংলোতে। আমি অতিকষ্টে পাহাড় টপ্‌কে স্টেশনে গেলুম ডাক্তারের কাছে। ওস্তাদজী প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে জমি দেখে গেল আমাদের বাংলার? ডাক্তারের ওখানে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—তারপর অন্ধকারের মধ্যেখুঁড়িয়ে অতিকষ্টে পাহাড় টপকে বাংলোতে ফিরি।

রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে আতাতলার দিকে বেড়াতে গেলুম। আর রোজ এই সময়? বাংলার সেই স্ত্রীলোকটি দারোয়ান সঙ্গে নিয়ে আস্‌চে। একটু পরে ভাঙা চাঁদ উঠলে পূর্বদিকের পাহাড়ের মাথায়—দূরে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। ভারি চমৎকার দেখাচ্চে—নক্ষত্রই বা কি চমৎকার। হাড়ভাঙা শীত।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২২শে মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে হাড়ভাঙা শীত। হাত যেন ফেটে যেতে লাগল। একটু বেলা হোলে এখানে বড় বিপদ। হালুয়া তৈরি করলুম নিজে। তারপর বাংলোর পেছনে পাথরটাতে বসে লিখি। আজ হাটবার। স্কুল সকালে ছুটি হয়ে গেল হাটের জন্যে। গায়ে ভয়ানক ব্যথা হয়েছে সেদিন পাহাড়ে ওঠানামা করে। বাড়িতে নাইলুম। বৈকেলে হাটে গেলাম। পান পাতার [?] বলে একরকম কি জিনিস বিক্রি করচে। বরাভূম থেকে লোকেরা হাট করতে এসেচে—বাংলা কথা বল্‌তে বল্‌তে ফিরচে। ভারি সুন্দর। একটা পাথরের ওপর বসে বসে ভাবলুম—আজ বনগাঁয়ে হাট হচ্চে আমাদের দেশে। কেষ্ট শালপাতা জড়িয়ে একটা বিড়ি তৈরি করে দিলে—তাই বসে বসে টানচি—এমনই সময় দেখি মামিমারা হাটে এসেচে। ডাক্তার হরিপদবাবুকেও দেখলুম। তারপর বাড়িতে আস্‌বার পথে ওদেশের লোকেদের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এলুম।

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৩শে মাঘ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

আজ সকালে কন্‌কনে শীত। গায়ের ব্যথা খুব বেশি। বসে রৈলুম সারাদিন। একবার—বাড়ির পেছনে চেয়ার পেতে খানিকটা বসা গেল। বিকেলে কলসী বাংলা থেকে একটি মহিলা বেড়াতে এলেন। বৈকেলে ডাক্তারও এল।

রাত্রে এখান আকাশে নক্ষত্রসংস্থান একটা দেখ্‌বার জিনিস। জ্যোৎস্নারাতগুলো তো আগে অপূর্ব আনন্দ দিয়েচে এখন এই অন্ধকার রাতে কি সব অগণ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্রপুঞ্জ। অসংখ্য জগতের কথা ভাবলে মন কোথায় যে চলে যায়। রাতে টাটানগরের জ্যোতি দেখা যায় আমাদের বাংলোর পিছনের ডুংরি পাহাড়ের পশ্চিমে।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৪শে মাঘ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে বাংলোর পিছনের সেই শিলাখণ্ডে রোদে পিঠ দিয়ে বসে লিখচি। ডাইনে সুবর্ণরেখার ওপরে, ও বাঁয়ে বরাভূমের দিকে পাহাড়শ্রেণী। সাম্‌নে শালবনী গ[—] দূরে রাখা মাইনের চিম্‌নী দেখা যাচ্চে। আজ পা একটু ভাল। তবুও কোথাও বেরুলাম না। বসে বসে ‘Gopalpul’-এর অংশ লিখচি। ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ শেষ করবো [—] এখান বৈকালে পাহাড়ের পেছনে শালবনের রাঙামাটিতে গিয়ে বসলুম। একটা সমতল শিলাখণ্ডে কতক্ষণ বসে আছি। সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ে সূর্য অস্ত গেল। নির্জন বৈকাল। রোদপোড়া সোঁদা মাটির গন্ধ। মনুর সঙ্গে নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে গল্প করিএকটু।

সূর্যাস্ত এখানে অপূর্ব ব্যাপার। কতক্ষণ পর্যন্ত মহাদেব ডুংরি range-এর পেছনেলাল আভা থাকে। আবার এদিকে কালাঝোড়ের গায়ে সিঁদুরে আভা পড়ে অস্ত দিগন্ত থেকে এসে। সে এক অপূর্ব ব্যাপার।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৫শে মাঘ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে পাথরের ওপর বসে লিখ্‌লাম। দূরে রাখা মাইনের চিমনীটা বেশ দেখায় এসময়। আজ পায়ের ব্যথা কম। বাড়িতেই গল্প করলুম। তারপরে খেয়ে শুয়ে রইলুম। বৈকালে বেড়াতে গিয়ে স্টেশনের পাশে একটা পাথরের ওপর বসে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করলুম। তিনি রাজখাওয়নের থেকে দূর জঙ্গলের মধ্যে নোয়ামুণ্ডি মাইনে কাজ করচেন। তিনি বল্লেন, ওখানে বাইসন ও বন্য কুকুর অজস্র থাকে।..[?] Division-এর অরণ্য বিখ্যাত। মহাদেব ডুংরি পাহাড়ে হাতির নাচ দেখেছিলেন কাল তিনি।

অন্ধকার রাত্রিতে পাহাড়ের নিচে আতাতলায় গিয়ে চুপ করে বসি। অদ্ভুত নক্ষত্রের রাত্রি—অন্ধকার প্রান্তরটা নির্জন দেখাচ্চে। পাহাড়ের পেছনে টাটা কারখানায় blast furnace-এর glow যেন কোনো আগ্নেয়গিরির আভা।

সকালে একজন লোক আমার সামনের নিমগাছে নিম পাতা পাড়তে উঠেচে—নাম শম্ভু। বল্লে, বেগুন নিম দিয়ে ছেঁচকি করবে।

সিংভূমেও বেশ বাংলা ভাষার প্রচলন। কে জানতো এখানেও বাঙালি। আসানবনীর হাটে সাঁওতালরা বাঁকে চাল বিক্রি করতে যাচ্চে।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৬শে মাঘ, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে পা সেরে গিয়েছিল। স্টেশনে বেড়িয়ে এলুম। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। একটা ময়ূর বেড়াচ্ছিল—মনুরা ধরতে গেল। তারপর শিলাখণ্ডে এসে বসে লিখলুম চা ও হালুয়া খেয়ে। দেখি পায়ের ব্যথা বেড়েচে। নাইতে গেলুম বলরাম সায়েরে। ওপারের পাহাড়টা কি চমৎকার দেখায়। বাস্তবিক পাহাড় না থাকলে কখনও কি কিছু ভাল দেখায়? সারাদিন পায়ের ব্যথায় বড় নিরানন্দে কাট্‌ল। ফিরে এসে ব্যথা বাড়ল। আসানবনীর হাট। ডাক্তার বাবু এসে গল্প করলেন, এদেশে কচ্‌ড়ার তেল [মহুয়ার তেল] দিয়ে লোকে খায়। শুট্‌কি মাছ খায়। হাঁড়ি রাখে আর জামবাটি রাখে। রোজ ধান কুটে ভাত খায়। টুসু পুজো করে বসন্ত পঞ্চমীতে। টুসু ভাসাতে

গিয়ে নৃত্য করে যুবকযুবতী। হাটে যাওয়া একটা উৎসবের দিন। সেদিন সবাই ভাল কাপড় পরে হাটে আসবে। লোক কুটুম্বের সঙ্গে দেখা হয় ওই একদিনে। কাজ না থাকলেও হাটে আসবে। রাত্রে পা সেরে গেল। আতাতলায় বেড়িয়ে এসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মাঠের মধ্যে বসে নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে কথা হোল।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৭শে মাঘ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে পা সেরে গেছে। মনে খুব আনন্দ। অনেকটা বেরিয়ে এলুম। ওদিকে থেকে লাইন ধরে স্টেশনে এলুম। সেখানে মনু, খোকা ও খুকি উপস্থিত আছে। তারা কবিতা বলে। তারপর আমি ও ডাক্তারবাবু গল্প করতে করতে বাসায় এলুম। লিখতেবসলুম শিলাখণ্ডে। বেশ মিঠে রোদ। আজ ভাবচি আসানবনী বা টাটানগরে যাব। আসানবনীর হাট গিয়েচে কাল শুক্রবার। ঘাটশিলার হাট বুধবারে। গালুডির হাট সোমবার। ওদেশে সব স্থানে হাট আছে। গুরুমৈশানি লাইনে হলুদপুকুর বামুনহাটি খুব সুন্দর স্থান—পাহাড় ও জঙ্গল। জলের বড় কষ্ট। ঝর্ণা শুকনো, মাটি খুঁড়ে জল। draught একটা চমৎকার subject। বহেড়া গাছের তলে দুপুরে বসলুম চেয়ার পেতে [।] heat haze কাঁপচে—কি চমৎকার দেখাচ্চে মহাদেবডুংরি range! বৈকালে চাঁইবাসা রোড দিয়ে বেড়াতে গেলুম। পোস্টাপিসে প্রমোদবাবুর পত্র দিয়ে এলাম। পাঠশালার ছেলেরা আসচে, বল্লে জগন্নাথপুর পাঠশালায় পড়ি। পড়ে নীতিসুধা। পুঁটুলিতে ভেলাগাছের কষা ফল নিয়ে আসচে খাবে বলে। অদ্ভুত ধরনের ফল [—] বীচি বার হয়ে থাকে। একটা সাঁওতাল। বাড়ি তাৎপিড়ি। বল্লে, শুধু ভাত দিয়ে খেয়েচি, নুন লঙ্কা দিয়ে। একটা পাথরের ওপর বসলুম। কালাঝোড় পাহাড়ের সামনে।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৮শে মাঘ, ১৩৪০। রবিবার

দুটি মেয়ে খেলা করচে আমি যেখানে পড়চি তার কাছে ভেলা গাছের তলে। ছোটটি কালো কুচ্‌কুচে—কিন্তু যেন পাথরে খোদা মূর্তি। ওর নাম মৎকুরি, জাতে গোঁড়, বাড়ি রাজগাংপুর। পায়ে পৈরি হাতে কাঁক্‌না। পৈরি অবিকল নূপুর। কাঁক্‌না ভারী কাঁসার বালা।

শীত নেই। রোদ চড়েচে। বলরাম সায়ের থেকে নেয়ে আসবার সময় দূর থেকে পাহাড়টা সেই কি একটা গাছের ভঙ্গি, কি চমৎকার দেখায়। এইসময় ইছামতীতে আমাদের দেশের ঘাটে ও কুঁচঘাটায় ঝোপের ধারে ফণিকাকা নাইতে নেমেচে—কামারপাড়ার বৌয়েরা নাইচে।

বহেড়াতলায় বসে লিখচি। সামনের পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। heat haze কাঁপচে। সামনের হরীতকী গাছটার নিচে।

সন্ধ্যার আগে পাহাড়টার পেছনে শালবনে বেড়াতে গিয়ে শিলাখণ্ডে বসে রইলুম। সূর্যাস্তের রাঙা আভা কতক্ষণ রৈল। আকাশভরা অস্ত দিগন্তের আভা পাহাড়ের বিশাল ঢালুর কেঁদ গাছ, ভেলা গাছ, শাল গাছ, খেজুর ঝোপে পড়েচে। আজ রবিবার। গোপালনগরের হাট—দারিঘাটার পুল দিয়ে লোক ফিরচে হাটে। যেখানে আমের বউলের গন্ধে বাতাস মাতিয়েচে এই বসন্তে। সত্যি, স্মৃতিতে মাধুর্যে বারাকপুর যেন ভরা—ওর মত স্থান আর আমার কাছে কৈ? এখানকার এই ডুংরি, টিলা, শালবন, পাহাড়ের মাথায় দাবানল জ্বলা—এও যেমন অপূর্ব—সেও অন্যদিক থেকে তেমনি মহিমময়। সন্ধ্যার পরে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করলুম। কলসী বাংলায় দারোয়ান আলো হাতে ওদের বৌকে ডাকতে গেল।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৯শে মাঘ, ১৩৪০। সোমবার

বৈকালে হাটে গেলুম ও কেঁদ ফল, কুল, পেয়ারা কিনে নিয়ে চলে গেলুম রেলের বাঁধের ধারে। চমৎকার সূর্যাস্ত হোল সুবর্ণরেখার ওপারে। তারপরে চৌধুরীবাবুদের কাছেবসলুম। বিশ্বনাথবাবু, চৌধুরীবাবু, হেডমাস্টার ওরা সবাই এসে বসেচে। কুলিদের মাইনে নিয়ে কি একটা গোলমাল বেধেচে খুব স্টেশনে। রাত্রে খুব হাওয়া ও ঝড়। মেঘাবৃতআকাশ।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১লা ফাল্গুন, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটা উঁচু পাড়ের ওপর বসলুম আমি ও ডাক্তার। পাথর খাদানে গাড়ি যাচ্চে নদী পার হয়ে। ডাক্তার বল্লে, রাখা মাইনে চলুন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ আছে। আমি তো এতদিন যেতুম পা সেরে গেলে। দুপুরে বসে লিখলুম। তারপরে পোস্ট আপিসে ইউনিভার্সিটির পত্র কিন্‌তে গেলাম। উদয় মুকুটি এখানকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। খুব ধানজমি আছে। নন্দীবাবুর ম্যানেজার। তাঁর ভাগ্‌নে সঙ্গে সঙ্গে এল। খুব কড়া রোদ। মজলিয়া গ্রামের মাঝটায় বড় বড় বিচালীর বাড়ি রাস্তায় লাল ধুলো। ওর ভাগ্‌নে কাকে বল্লে—"ওহে, ও মেহিনটা জোগাড় করলে কোথা থেকে? খোলাডাটির কাছে পাথরের ওপর বসে গল্প করলুম তার সঙ্গে। সে বল্লে, পাটমৈল্লায় জমি আছে। স্টেশনে বসে সাহেবটার সঙ্গে? ও আফ্রিকার গল্প করি। তারপর এসে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে পাহাড়ের কোণে শালবন ও রাঙামাটির টিলাতে বেড়াতে গেলুম। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। রাত্রে ঝড়া ডাক্তার এসে ডাকলে—আমি বল্লুম আর বাহিরে বস্‌বো না।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা ফাল্গুন, ১৩৪০।বুধবার

সুবর্ণরেখার ধারে মোহিনীবাবুর নার্সারিতে বেড়াতে গেলাম। অতি মনোরম স্থান—একটা উঁচু টিলার ওপরে পরিষ্কার ঘরটা। পিচ্‌ কমলা নানাবিধ ফলফুলের বাগান নিচে। ওপরের পাহাড়ের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখায়। ময়ূরভঞ্জে বাড়ি? সাঁওতাল এখানে কাজ করে—সে বল্লে, ওপারে বন ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত—বন্যমহিষ আছে এবং?অর্থাৎ বাইসন আছে। রোজ বলরাম সায়েরে নাইতে যাই—ওদিকের পাহাড়শ্রেণী ও একটা অদ্ভুত ধরনের গাছ পাহাড়ের পটভূমিতে ভারি ভাল লাগে। ইছামতীর কথা মনে আসে। বৈকালে পাহাড়টার ওপাশে বেড়াতে গেলুম। আসানবনীর সেই ফুল ফুটেছে পাহাড়ের গায়ে।

রাত্রে আমি ও ডাক্তারবাবু বসে আফ্রিকার গল্প বলি। তারপর পোস্টমাস্টার এলেন। তিনি বলছিলেন?থেকে Gua পর্যন্ত জঙ্গল খুব। নোয়ামুণ্ডিও খুব জঙ্গল দুইলাইনে। আমাদের বাসায় এই পাহাড়টার নাম নেকড়াডুংরি—এখানে নেক্‌ড়ে থাক্‌চে।...?অর্থাৎ বন্য কুকুর থাকচে। টাটার কাছে ভেলা গাছ আছে—খুব জঙ্গল। চক্রধরপুর থেকে রাঁচী মোটরে ফিরেচি [—] পথে খুব দৃশ্য ভাল। বৈতরণী নদীর ওপরে কেওঞ্ঝর স্টেট—ভয়ানক জঙ্গল। সিম্‌লাখালি পাহাড় আছে—ওখানে বারিপদার কাছে—সেখানে সবরকম বন্য জন্তু আছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

খুব ভোরে উঠে সুবর্ণরেখার ধারে বেড়াতে গেলুম। ভারি সুন্দর জায়গা।উপলখণ্ড সেখানে পড়ে আছে—ওপারের জঙ্গলের দৃশ্য চমৎকার—এপারেও উঁচু পাহাড় ও গাছপালার ভঙ্গি যেন নৃত্যশীল নটরাজের মত ছন্নছাড়া ও উদ্দাম।...জীবন নার্সারিতে গিয়ে পাকাকুল ও কমলালেবু খেলাম।

এইমাত্র রাখা মাইন্‌স্‌ থেকে ফিরে আসচি। রাখা মাইন্‌স্‌-এর সমতল ভূমির আধমাইল পশ্চিমে যে পাহাড় তারই ওপারে গেলুম। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সুউচ্চ চূড়ায় অরণ্যানীশীর্ষে প্রত্যাসন্ন অপরাহ্ণে পীতাভ রৌদ্র, সানুদেশে টকটকে লাল পিরিয়াল ফুলের ঝোপ, নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড ফরদ্‌গাছগুলো কেমন বেঁকে চুরে নৃত্যশীল নটরাজের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল। তার সঙ্গে মিশেচে বিরাটত্ব। ধাতুর একটা বিশাল পর্বত, ধাতুরঞ্জিত, রুক্ষ [রুক্ষ], অনাবৃত গগনস্পর্শী স্তর সংস্থান দেখলে মাথা যেন ঘুরে যায়—তার ওপর করো চারিপাশের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যগজ অধ্যুষিত ঘন আরণ্যভূমি, বিরাট নিস্তব্ধতা—সন্ধ্যার ছায়ায় নিম্নের উপত্যকার ও অপরাহ্ণের রাঙা রোদ মাখানো শৈলশীর্ষের মহিমময় সৌন্দর্য। একটা তুঁতে রংয়ের ঝর্ণা দেখলুম—বল্লেম, তামা ধোয়া জল আসচে। সন্ধ্যার পরে দুধারে শালবনে ঘেরা মুসাবনী রোড্‌ দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, তখন সুবর্ণরেখা পার হলাম। পথেরই বা কি সৌন্দর্য!

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

বৈকালে চন্দ্ররেখা নামে গ্রামে বেড়াতে গেলুম। চাঁইবাসা রোডের ওপর গ্রামখানি। বেশ সমতলভূমি—আসবার সময় চাঁদ উঠেচে দ্বিতীয়বার। একটা বাঙালি ভদ্রলোক এসে আলাপ করলে। একটা পুকুরের ধারে শিব মন্দির। পুরোনো মন্দির। কাঞ্চন ফুল ফুটেচে। আমের বউলের গন্ধ বার হচ্চে। পারিজাত, শেফালি, বট,

নিম—সব রকম ফুল আছে—কাছেই পাহাড়। আমরা পাকা কুল পেড়ে খেলুম গাছ থেকে। বাঁধের জলে মুখ ধুলাম। একটা কাঞ্চন ফুল পেড়ে নিলুম। ফিরবার পথে একটা শিলাখণ্ডে বসে রইলুম। সামনে বহুদূরে কালাঝোর একটু একটু দেখা যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অস্পষ্ট জ্যোৎস্না, নক্ষত্রখচিত সুবিস্তীর্ণ আকাশ, হু হু হাওয়া। নির্জন প্রান্তর ও পথ। আসানবনীর হাট থেকে জনৈক মাড়োয়ারি গালা কিনে ফিরচে। সামনেই পাহাড়টা বাংলা থেকে দূরে এই পথ সিংভূমের প্রান্তর—বড় ভাল লাগ্‌লো। অথচ বাংলাদেশই এটা। সবাই বাংলা কথা বলচে।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার পোসসাইতা। বেলা ৭॥ টা

এইমাত্র ট্রেনে এখানে নেমে চাঁইবাসা রোডে ঘন জঙ্গলের ধারে বসে লিখ্‌চি। কি বনস্পতি দুধারে। অনেক জায়গায় লতা ঝোপে ঝোপে। ফুল ফুটে আছে। এত বড় বড় গাছ যে অন্ধকার চারিদিক। পাথর আছে তবে কিছু কম। বনই বেশি। অদ্ভুত বন [—] বনস্পতি গাছই বেশি। তলায় undergrowthও আছে। খুব নির্জন বনের কতরকম পাখি ডাক্‌চে। নিবিড় ঘন জঙ্গল—এখন আবার একটা পাথরের ওপর বসেলিখ্‌চি। বনে আমলকী ফলে আছে। বেলা হয়েচে আট্‌টা—এখনও রোদ পড়েনি বনের মধ্যে—কি একটা পাখি ডাক্‌চে। কেমন একটা আদ্রর্তা। শাল, কেঁদ, পিয়াল, আমলকী বেশি। ফুল হয় এমন গাছ খুব কম। বসন্তের শোভা কৈ? ন'টা বেজেচে—কল্‌কাতায় এতক্ষণে ছুটতে হোত স্কুলে। মণীন্দ্র বসুর পত্রখানা জঙ্গলে বসে পড়চি। বাবার লেখাটা সেই হিন্দি স্রেফ শুনি। মণীন্দ্রবাবু নামে একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। আসবার সময় surrenda-র বন্‌ পাহাড় দেখে অবাক্‌ হয়ে গেলুম। জানালায় দাঁড়িয়ে চারিধারে চেয়ে দেখি এ ঠিক যেন আমেরিকার সেই ফটোতে দেখা বনের মত। এরই ফটো তুললে খুব দেখাবে ভাল। বন খুব dense-ও আছে যেখানে নদী বা ঝর্ণা। ওরকম জঙ্গল পথে আর কোথাও নেই। চক্রধরপুর, সিনি প্রভৃতি দুপুর রোদে খাঁ খাঁ করচে যেন মরুভূমি। বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল—এই প্রথম বসন্তে সেখানে বাড়ি বাড়ি বাতাবী লেবুর ফুল ফুটেচে, কচিপাতা গাছে গাছে গজিয়েচে, শ্যাম ছায়া পড়ে এসেচে বাঁশবনের মাটির পথটির পরে—ঘেঁটুফুল ফুটেচে মাঠের পথের দুধারে—এদেশ ও সে-দেশ? এদেশ রুক্ষ, ধূসর কিন্তু বড় সৌন্দর্যশালী। এর রুক্ষ সৌন্দর্য অদ্ভুত। সিনি স্টেশনে যেতে খানিকটা ওদিকে অর্থাৎ রাজখর্সাওনের দিকে হাতির মত curious formation-এর পাথরের একটি জমি আছে ও বন আছে—অপূর্ব।

বৈকালে আমি ডাক্তার ও ছোট মামা নেক্‌ড়াডুংরি পাহাড়ে উঠলাম। খুব শিলা বৃষ্টি হোল। এমন দিন কমই দেখেচি।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০।রবিবার

রবিবার। এদিন ছোটমামা চলে গেল একটার গাড়িতে। আমি স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে সাপ দেখ্‌লুম। চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছে পাহাড়টায়। রাস্তার ধারে কতক্ষণ বসে রইলুমসেদিন রাতে পাহাড়ের ওপর। সাপ দেখি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

কয়দিন পরে সকালে শিলাখণ্ডে বসে লিখ্‌চি [—] আজ সোমবার।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে দিঘাগড়া রওনা হওয়া গেল গাড়িতে। দুধারে শাল, আসান, কুচিলা, অর্জুন, মহুয়া, বট, হরীতকী, কেঁদ, পিয়ালগাছ। মেঘের ছায়া। মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা। কুলপাল বলে একটা গ্রাম পেরিয়ে এসে খুব বনঝোপ। শুক্‌নো পাহাড়ের মাথা দিয়ে গাড়ি ঘুরে গেল। জঙ্গলের শোভা অপূর্ব। অসংখ্য গোলগোলি ফুলের গাছে ফুটন্ত হল্‌দে আসানবনীর সেই ফুল অজস্র—তাতে অবর্ণনীয় শোভা হয়েচে। রাঙামাটি, শাল, বহেড়া, লোহাঝাড়ি গাছ চারিদিকে। ছোট বড় শিলাখণ্ড পথে মহুয়া ফুল পেড়ে খাওয়া গেল। বেশ মিষ্টি। ফুলের সুগন্ধ। এই অংশটা লিখচি রামচন্দ্রপুর বলে একটা জঙ্গলে ভরা গ্রামের পাহাড়ে বনের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসে। শিমুল ফুল ফুটে আছে—পথে মাঝে মাঝে কুসুমগাছের কচিপাতা টক্‌টকে রাঙা—দূর থেকে যেন মনে হয় ফুল ফুটেচে। নির্জন, নিরালা, সাঁওতালী গ্রামটা সাম্‌নে।

রামচন্দ্রপুর ছাড়িয়ে জঙ্গলের দৃশ্য অপূর্ব—অনেক দূর পর্যন্ত উঁচু নিচু রাঙা মাটি।...? ফুলের ঝাড় ফুটে আছে। বাঁয়ে পাহাড়—বনানী দৃশ্য অতি রমণীয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

এক জায়গায় বনের মধ্যে গিয়ে কুল খেয়ে একটা গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে এলুম ছায়ায়। সাম্‌নেই পাহাড়—গরুর গাড়িতে আসান গাছের ছায়ায় বসে লিখ্‌চি। ঘেঁটুফুল দেখেচি রামচন্দ্রপুরে।

দীঘা গিয়ে পাথর কিন্‌লুম। একটা সাঁওতাল তরুণী তুলি দিয়ে দেওয়ালে রং করচে—ভারি সুশ্রী সমস্ত মুখ। একটি পাঠশালায় ব্লাকবোর্ডে বাংলা নতুন পাঠ পড়ানো হয়। স্নান সেরে বেরুলাম। পথে একটা শালবনের ছায়ায় পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে আহার করা গেল। অনেকদিন পরে homely [?] wild life যেন ভোগ করচি। সত্যি এত আনন্দ হোল। বসে বসে ভাবলুম এতক্ষণ আমাদের দেশের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে ছায়া পড়ে গিয়েচে।
খেয়ে-দেয়ে সতরঞ্চি পেতে শালবনের ছায়ায় বসে লিখচি এবার। পথে ভালুকের ভয় আছে—দীঘায় সবাই বলেচে।

বুরুডি গ্রাম ছাড়িয়ে জঙ্গলের প্রারম্ভে বসে লিখ্‌চি গাড়িতে। ঘেঁটুফুলের অপূর্ব সুগন্ধ। আমি যেন কোনো নিরালা বড় ঘেঁটু বনের ধারে প্রথম বসন্তে অপরাহ্নের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। এক্ষণে ঘেঁটুবন নিরীহ নয়। পাশেই বিরাট পাহাড়ের সানুদেশের ঘন অরণ্যের প্রান্তবর্তী। বেলা পড়ে এসেচে। বাঁধের ধারে জ্যোৎস্নায় বসে কতক্ষণ আগুনটা দেখলুম। বাংলো দেশের দিকে চেয়ে কত নির্জন ঘেঁটুফুলে ভরা উঁচু ডাঙার কথা মনে পড়ে—সেই আমাদের দেশ। ইছামতী নদী, শীতে জেলের নৌকা, বাঁশের...? মাছ ধরার—কত দূরের কথা সে সব।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৪০।বৃহস্পতিবার

মহাদেব ডুংরির শিখর দেশে বসে লিখচি। ভয়ানক দুরারোহ পাহাড়—তেমনি কাঁটা গাছ ও জঙ্গল। একটা শিব মন্দির আছে। ভালুকের নাচ দেখতে পেলাম। ভাল দেখা যায় না—বড় জঙ্গল। বড় নিস্তব্ধ। জুতো জোড়া না ফেলে উঠতেই পারলুম না—এমনি খাড়া। তখন সকাল বেলা দশটা। তারপর আবার সিদ্ধেশ্বর ডুংরিতে উঠলাম। হাতিতে গাছ ভেঙেচে। সন্ধ্যায় ফিরি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।১১ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখতে বসলুম। তারপর খুব তৃপ্তির সঙ্গে বলরাম সায়ের থেকে স্নান করে এলুম। ১টার গাড়িতে মামিমাকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়ে স্টেশনে নামচি—পানিতরের ইন্দুকাকার সঙ্গে দেখা। তারপর মামিমাকে বাসায় দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি এসে গাড়ি ধরি। ইন্দুকাকা স্টেশনে ছিলেন। স্টেশনে নেমে খবরের কাগজ পড়লুম [—] তারপর বাড়ি এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুয়ে রইলুম। সূর্য যখন পাহাড়ের ওপারে অস্ত যাচ্চে তখন উঠে নেক্‌ড়াডুংরির ওপারের শালবনে কতক্ষণ বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে কি অপরূপ শোভাই হোল—দেখতে দেখতে কত নক্ষত্র ফুটল। বসে বসে দেখছিলুমনির্জন শালবন, পাহাড়-জ্যোৎস্না প্লাবিত মুক্ত টিলা, ডুংরি—দূরে একটা পাহাড়ে আগুন দিয়েচে। বাংলাদেশের কত জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের ভাটবনের কথা মনে পড়লো। ইসমাইলপুরের ঝাউ কাশের বনের মত মনে হোল হঠাৎ যেন ওধারটা। ঝাউ কাশের বনটা কারও নয়—সিধুবাবুর নয় কারুর নয়। মালিক এবার বদ্‌লেচে। আবার তেমনি জ্যোৎস্না—তেমনি সুন্দর। কাশবন যেন হাসচে।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৪০।শনিবার

শনিবার আজ চলে যাব। সকালে উঠে সেদিনকার পর্বত আরোহণজনিত দৈহিক ক্লান্তি দেখি আর নাই। নন্দীর গোলার সামনে সেই ছোট পাহাড়টাতে প্রথম দিন এসে উঠেছিলুম—তাই শেষ দিনটা উঠলাম—চারিধারে দৃশ্য বড় চমৎকার। বরাহভূমের দিকে কেবলই পাহাড় ও শালবন। নন্দীর এখানে বাড়িটি হচ্ছে বড় চমৎকার।

তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আমি সেই বাংলোর পিছনে শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। দূরে রাখা মাইনের সেই চিমনি দেখা যাচ্চে। একটু ঠাণ্ডা আজ। রোদ মিষ্টি লাগচে। বিড়ির কারখানায় লোকেরা ঝগড়া করচে। ছোট পাহাড়টার shiva (?) গাছের নাম লিখলুম।

কলকাতায় এসে শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সজনীরা হই হই করে উঠলো। পশুপতিবাবুকে phone করলুম। তারপর হেমন্তের...কাছে...? মহলে গিয়ে Torch Singer ছবি দেখলুম।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

ভোরে উঠে বনগাঁ। পুকুরে স্নান সেরে এসে বিকেলে বারাকপুর গেলাম। খুব বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধ, আমের বউলের গন্ধ, কোকিলের ডাক চারিধারে। বেশ soft, pretty আবহাওয়া। কাঁঠাল তলায় বসলুম। গজন নাড়ু নিয়ে এল ও এক গ্লাস জল। হারুর পৈতে হয়ে গিয়েচে তারই শেষ অবশিষ্ট। উঠোনে বসে খুড়িমা, ন'দি, বুড়ি পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। কালো এল। বাঁশবনের দিকে বেড়াতে গেলুম, ভিটের দিকে গেলুম। শুকনো বাঁশপাতা, সজনে ফুল, শিমুল ফুল, কোকিলের ডাক, নদীর ঘাটেও গেলাম। পুঁটি দিদি ঘাটে। খুকুর সঙ্গে রোয়াকে বসে গল্প করলাম। রাত্রে নদি, খুড়িমা, খুকু, পরেশ সবাই তাস খেলি।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে প্রথমে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম তারপর ফিরে এসে চালকীর দিদির সঙ্গে দেখা করলুম। বনগাঁয়ে এসে আহারাদি সেরে বেশ ঘুম দিলুম। সন্ধ্যার আগে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত বেড়াতে গেলুম। খুব জ্যোৎস্না। গালুডির মত নয়,—তেমন অপূর্বতা নেই। বাংলাদেশ বেশ soft, বেশ pretty [—]কিন্তু সে রকম নয়। রাত্রে মন্মথবাবুর বাড়িতে আড্ডা হোল। মুন্সেফবাবু এলেন—ভ্রমণের গল্প হোল।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০।মঙ্গলবার

বেশ ফাল্গুনের হাওয়া। সারাদিনই বাড়িতে। বিকেলে খুকিকে নিয়ে নৌকোতে সাতভেয়েতলা গেলাম ছকু মাঝির নৌকোতে। খুব ঘেঁটু ফুল ফুটেচে। আসবার সময়বেশ জ্যোৎস্না।মন্মথবাবুর আড্ডাতে খুব গল্প হোল ভ্রমণের।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে কল্‌কাতা এলুম। বরিশাল এক্সপ্রেস ১ ঘণ্টা লেট্ ছিল। ঘুমিয়ে প্রবাসীতে গিয়ে দৃষ্টিপ্রদীপের proof দেখলুম। তারপর বন্ধুর বাসায় গিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা। বাড়ি এলুম। মেঘ করচে।

অনেকদিন পরে আমার ঘরটা এবং কলকাতা শহরটা সম্পূর্ণ নতুন লাগ্‌চে। ভাল লাগচে না কিন্তু শহরের এই গোলমাল। রাত ১১টা—এখনও খুব গোলমাল। অন্য জায়গা এতক্ষণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গিয়েচে।

২রা ফেব্রুয়ারি[1], ১৯৩৪। ১৯শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের সীমানায় একটা জঙ্গলাবৃত পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে একটা পাহাড়ের মাথায় বসে এটা লিখচি। আজ সকালে গালুডি থেকে বেরিয়েচি—সারাদিন জঙ্গলে ঘুরচি, পাটকিটা নামক একটা চারিধারে জঙ্গলে ঘেরা ও পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম দেখে এলুম। তারপর কতকগুলো লোক টাটা কোম্পানির খনিতে কাজ করে তারাই চনু বলে একজন ছোকরা দিয়েছিল পথ দেখাবার জন্যে। ফিরবার পথে এই জঙ্গলাবৃত প্রকাণ্ড পাহাড়টার ওপর একাই উঠেচি—কাল স্টেশনে মাস্টারের ভাগ্‌নে ভোলাবাবুকে Stone Quarry থেকে ফেরবার পথে ভালুকে তাড়া করেছিল—গল্প শুনেচি। তাই এই লিখবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে খস্ খস্ শব্দ হবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখচি—চারিধারে ঘন নির্জন জঙ্গল—অনেকটা উঠেচি পাহাড়ের মাথায়—শাল, পিয়াল, কেঁদ, জড়িন ফুল,

[1]সিংভূম অঞ্চলে ভ্রমণের সময় ২রা থেকে ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারি পর্যন্ত (১৯৩৪ সালে) বিভূতিভূষণ এই অতিরিক্ত পাতাটি লেখেন। ১লা মার্চ থেকে আবার ফিরে এসেছেন বর্তমান দিনলিপিতে।—নির্বাহী সম্পাদক

পলাশ, আমলকী, শিরীষ, কুল, আকন্দও দেখেচি—এই গাছের জঙ্গলই বেশি। শুধু হাওয়ায় জঙ্গলের ডালপালার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। সামনে বিশাল পাহাড়ের অধিত্যকা জঙ্গলে ভরা—সামনেই কাঞ্চন ফুলের রং-এর জড়ল ফুল ফুটে আছে জঙ্গলে। একা বসে আছি—কেউ নেই। এ ধরনের পাহাড় জঙ্গল আমি কোথাও দেখিনি—পাহাড়ের ঢালুতে ঝোপঝাড় দেখেচি কিন্তু এমন বনস্পতির সমাবেশ কোথায় দেখিচি? বাস্তবিক ভগবান্ যে যা চায়, তাকে তা দেন। এখন বেলা ১২-১৫ মিনিট আমার হাত ঘড়িতে—কলকাতার স্কুলে এখন ঘোররবে কাজ চল্‌চে—আমি একা সিংভূম জেলায় এই পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে বসে বসে নীল আকাশের তলায় চারিধারের নিবিড় জঙ্গলের পত্র মর্মরের মধ্যে বসে এই লাইনগুলো লিখ্‌চি। সিংভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত যে পথটা চলে গিয়েছে—সেই পথটার ডানদিকে এই পাহাড়শ্রেণী। এর পরে পরে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত চলেচে এইরকম পাহাড়। ঘোর জঙ্গলে ঘেরা, মাঝে উপত্যকায় ভূমিজ, মুণ্ডা, সাঁওতালদের গ্রাম। অড়রের ক্ষেতধানের ক্ষেত—বেশ নিকানো পুছানো ঘরগুলি। বনময়ূর, বন্যগজ, ভালুক, বাঘ নেকড়ে, বনমোরগ—সবরকমই আছে এ নির্জন আরণ্যপ্রদেশে। দূরে সুবর্ণরেখা ও তারপরে আবার গালুডির উপত্যকা—পরে আবার বরাহভূমের এদিকে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণী। এইখানে খুব বাঘের ভয়—ভাগলপুরের মণিবাবু সেই বাঘের গল্প করেছিল—সে এই সুবর্ণরেখার ধারে। সেই পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে একা বসে লিখ্‌চি। পায়ের তলায় তামার প্রস্তর, লৌহপ্রস্তর, mica schist অসংখ্য—পথে একজায়গায় সাগা [?] নামে আদিম অধিবাসীরা পাথর গলিয়ে প্রাচীন উপায়ে তামা করেচে তার চিহ্ন দেখ্‌লুম। ঝরা বলে জাত আছে—তারা সুবর্ণরেখার বালু থেকে এখনও সোনা বার করে শুন্‌লুম[—] সুবর্ণরেখা পার হবার সময়ে সাঁওতাল গাড়োয়ানের মুখে। জঙ্গলে মোটা মোটা লতাগাছও দেখ্‌চি। হরিতকীও [হরীতকী] আছে। পিয়ালফুল এখন এই মাঘের শেষে ফুটেচে—গন্ধ নেই। আর কিছুদিন পরে নানারকম বনের ফুলে বনভূমি ও পাহাড়ের নিচে আমোদ করবে। আর হয়তো এখানে আসা হবে না—কল্‌কাতার এত কাছে—এত সুন্দর জায়গা আছে! দূরে বনমোরগ ডাক্‌চে। টাটা মাইনের blasting-এর শব্দ হচ্চে। সাঁওতাল একজন যুবতী এতক্ষণে এক বোঝা কাঠ ও শালপাতা নিয়ে আস্‌চে জঙ্গল থেকে [,] বল্লে পাটকিটা থেকে আস্‌চি। আর একজন লোক, বল্লে নাম হারাণ, পাটকিটা থেকে দুটা বলদের ঘাড়ে কাঠ চাপিয়ে ফিরচে। জাতে সাঁওতাল। বল্লে হাতি এখন নেই—আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে ধান পাক্‌লে ধানের ক্ষেতে নামে। পথে আমি অনেক জায়গায় বুনো হাতির পায়ের দাগ দেখলুম। চাপ্‌ড়ি Stone Quarry র ওপারে পর্যন্তও আছে—বানা অর্থাৎ ময়ূর কুল গাছে পাকাকুল খেতে আসে রাত্রে। কুলামারা, পাটকিটা গ্রামের লোকে বল্লে। কাছেই ওঁরাওগড় বলে একটা জায়গা আছে—সেখানে এখনও কোন্‌কালের তিন চার শো বছর আগেকার বন্য রাজার গড় ছিল। পাহাড়ের ওপর একটা মন্দির আছে—সেখানে তাদের নরবলি ও war dance হোত। বেশি আগে নয়—৫০ বছর আগেও হোত। বলে সেখানে ভূত আছে। রানিঝর্ণা বলে একটা ঝর্ণা আছে—সেখানে রানি স্নান কর্তেন। এখানে ময়ূরভঞ্জের দিকে বুনো বাইসনও আছে। তবে বন বড় deceptive in appearance থাকলেও বাইরে থেকে কিছুই বুঝবার জো নেই। এই যে জঙ্গলে আমি এখন বসে আছি—এটা বন্যজন্তুতে ভরা—অথচ এক ঘণ্টার ওপর বসে আছি—একটা বেড়ালও চোখে পড়ল না। আবিশ্যি সেজন্যে আমি দুঃখিত নই। খুব হতাশ হয়ে পড়িনি। এই বিপদের অনুভূতিটা কিন্তু থাকা ভাল—এটা একটা বড় আনন্দ দেয়। দূরে জঙ্গলের মধ্যে সাঁওতালেরা কাঠ কাট্‌চে—কুড়ুলের শব্দ হচ্ছে সামনের পাহাড়টার ঘন জঙ্গলে।

বেলা একটা বাজে। একরকম পাখি ডাক্‌চে বড় মধুর স্বরে [—] যেন দূরে কোথায় বাঁশি বাজ্‌ছে। এক রকম পাখি ডাক্‌চে পিড়িংপিড়িং—এই জঙ্গলের atmosphereটা ঠিকমত জান্‌তে হবে। সাঁওতালদের প্রধান, ভূমিজ, টারবাঁরো, পাহাড়ের পেছনে সূর্যাস্ত—অধিত্যকার অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত—সিংভূম থেকে ময়ূরভঞ্জযাবার পথে ৬০/৭০ মাইল ব্যাপী নির্জন প্রান্তর, নটরাজের ভঙ্গির গাছ, ডুম্‌রি অর্থাৎ পাহাড়ের টিলা—তামার পাথর ও ম্যাঙ্গানিজ—ময়ূর ও বন্যহস্তী—বড় বড় cave ও ঝর্ণা—হরীতকী, পিয়াল, শালমঞ্জরীর সুগন্ধ—পলাশের আগুনজ্বলা বন—রঙিন ধাতু প্রস্তর—জ্যোৎস্নালোকিত নির্জন উঁচুনিচু দূরে দূরে পাহাড়শ্রেণী ও সাদা boulder ছড়ানো প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে রাস্তা এঁকে বেঁকে চড়াই উৎরাই-এর মধ্যে দিয়ে সিংভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ চলে গেছে—নির্জন প্রান্তরে লতাকাটি কুড়িয়ে রাত্রিযাপন—সাহস চাই— যদি কোনো prospector বা মাইন্ সার্ভেয়ার একাজে লাগে—তার তাঁবু চাই—

অশ্বারোহণে কৃতিত্ব চাই। জঙ্গলের মধ্যে চাল্‌তে গাছের পাতার মত চেহারা—কলাপাতার মত বড় একধরনের কি গাছ লক্ষ্য করলুম—চমু নামে ওই সাঁওতাল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলুম—নাম বলতে পারলে না। কি অনাবৃত পাহাড়ের দেহটা এই জায়গায়—তির্যগভাবে বেঁকে উঠেচে [—] বিরাট আদিমযুগের প্রস্তর—অবশ্য এসব igneous rocks—ধাতুপ্রস্তরবাহী স্তর মাত্রেই আগ্নেয়—অর্থাৎ পৃথিবীর আদিম যুগের গলিত ধাতু ঠাণ্ডা হয়ে এরকম হয়েচে।

সৃষ্টির বিরাটত্ব, cosmic scale-এর বিশালত্ব—এইসব জায়গায় না এলে মানুষে বুঝবে কি করে? বাংলাদেশের নরম পুতুপুতু স্নিগ্ধ শ্যামল ভূমিশ্রীর মধ্যে ফুলের গন্ধই অনুভব করা যায়—এসব বর্বর সৌন্দর্য সেখানে নেই।

কিন্তু মনে হয়—এর কাছে বাংলার সৌন্দর্য লাগে না। তুচ্ছ হয়ে মিলিয়ে যায়। এর বিরাটত্বের কাছে বাংলার নদীবন মাঠের স্নিগ্ধ রূপ দাঁড়াতেই পারে না। কলকাতা থেকে হঠাৎ দেশে গিয়ে প্রথম বেশ লাগে—অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা কর্তে গেলে কিছু পাওয়া যায় না। তবে সৌন্দর্য মাত্রেই মন মুগ্ধ করে—যখন যেখানে থাকে মানুষে, তখন সেটাই ভাল লাগে।

আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা গিয়ে কি হবে যখন কলকাতার এত কাছে এমন সৌন্দর্যভূমি রয়েছে?

নির্জন দুপুর। ওপরে নীল আকাশ। দূর থেকে পাখিটার বাঁশির মত ক্ষীণ সুর আসচে। সামনে বহুদূরে সুবর্ণরেখার ওপারে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর খররৌদ্রে ধূসর অস্পষ্ট দেখাচ্চে। ওর নাম কালাঝোড় পাহাড়।

বেলা প্রায় দেড়টা। কি চমৎকার পাখি একটা ডেকে উঠল জঙ্গলের মধ্যে। বাবার সেই হিন্দি আখরে লেখা শ্লোকের কাগজখানা এইমাত্র আমার খাতা থেকে উড়ে যাচ্ছিল—পড়লাম। সেই কতকাল আগেকার বারাকপুর গ্রামের জীবনযাত্রা মনে পড়ে। বাবা এইরকম দুপুরে ঘরে বসে লিখেছিলেন—আর আমি আজ সিংভূমের পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে বসে পড়চি। এতেই আমায় মুগ্ধ করে।

সইমা কালীপদকে খেপাতো—সে সব অদ্ভুত ধরনের কাজ করতো বলে—গুড় খেয়ে গর্ব করতো—বড় মানুষী দেখাতো—সেই একটা জীবনের সময় গিয়েছে তা থেকে কি আনন্দই পেতাম। অনেকদিন পরে সেই কথা মনে পড়ল।

বড় জল তেষ্টা পেয়েচে। কিন্তু এ পাহাড়ের মাথায় জল কোথায়?পাহাড়ের গাছগুলি অতিপ্রকাণ্ড। বনস্পতি প্রায় সবই। এত বড় গাছওয়ালা পাহাড় আমি খুব দেখিনি।

আগে যেখানে বসে লিখছিলুম—সেখান থেকে আরও চলে এসে আর একটা অধিত্যকার ঘন বনছায়ার শিলাখণ্ডে বোসেলিখচি। খুব ঘন অরণ্যবৃক্ষেভরা সানুদেশ পিছনে—পাতায় বড় খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। আমার ভালুকের ভয় এখনও যাইনি। [যায়নি]। কেবলই চেয়ে দেখচি। এ জায়গাটার দৃশ্য আরও অদ্ভুত। আমার সামনে সুউচ্চ পাহাড়েব চূড়া ঘন বনে ভরা—বনস্পতি সমাকুল সানুদেশ অতি বৃহৎ। কালো লম্বা কেঁদগাছের গুড়ি সামনে দেখা যাচ্ছে। বড় জল তেষ্টা পেয়েচে অনেকক্ষণ থেকে। কোথায় জল পাবো, কাছেই একটা চারা গাছে আমলকী ফলেচে—গোটাকতক পেড়ে পকেটে নিলুম। দুটো খেলুম। এই জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন। বড় বেশি নির্জন। শুধু পাখির ডাক ছাড়া ও পত্র মর্মর ছাড়া এই বিজন আরণ্যভূমিতে ও বনস্পতি সমাকুল সানুদেশে অন্য কোনো শব্দ নেই। কেবল দূরের Stone Quarry-তে মাঝে মাঝে blasting operation-এর আওয়াজ পাচ্চি। কি গভীর শান্তি। কলকাতার স্কুলে এখন টিফিন চল্‌চে।

যেখানে সেখানে লক্ষ শিলাখণ্ড—বস্‌বার কি সুবিধে! বসে হেলান দেবারও সুবিধে আছে। অজস্র শিলা ছড়ানো সর্বত্র।

পাটকিটা গ্রামে কচড়া তেল বার করবার জন্যে দুখানা বড় কাঠের press বসানো। এরা মহুয়ার তেলেই রাঁধে। শুধু নুন লঙ্কা দিয়ে ভাত খায়। পাহাড়টা পার হয়ে একটা উপত্যকা। তারপর আবার একটা পাহাড়ের সানু। নির্জন জঙ্গলে ভরা। রোদ চড়েচে—শুকনো পাতায় অদ্ভুত খস্‌খস্ মর মর শব্দ হচ্চে। এই ভীষণ বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠে অনাবৃষ্টি হয়—সর্বত্র জল শুকিয়ে যায়, ঝরনা শুকিয়ে যায়—উত্তপ্ত পাথরের তাত—বৃক্ষ নিষ্পত্র—কালাঝোরের কাছে একটা পাহাড়ের খাদায় খানিকটা মাত্র জল থাকে— জ্যোৎস্নারাত্রে বাঘ, হাতি, বন-শূকর, নেকড়ে—সব জল খেতে নামে এমন কি একজন সাঁওতাল দেখেছিল বড় বড় পাইথন সাপ কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে আছে ঠাণ্ডা কাদায়। গভীর জঙ্গল থেকে জল খেতে এসেচে। কাঞ্চনফুলের পাতার মত ঐ গাছটা খুব বেশি পাহাড়ের সর্বত্র।

শুকনো পাতার গন্ধ বেরুচ্চে। বনের ওপারে চারিধারে সুউচ্চ পাহাড়—পাহাড়ের মাথার ওপরকার আকাশ কি অদ্ভুত ধরনেব নীল! বলিহারি নির্জনতা! মানুষের চিহ্ন কোনোদিকে নেই। গাছের তলা পরিষ্কার—শুকনো পাতা পড়ে রাশ হয়েচে—অথচ গাছ ঘন সন্নিবিষ্ট—বেশিদূর একসঙ্গে দেখা যায় না—ছোট বড় শিলাখণ্ডে ভর্তি সবদিক—যেটার ওপর ইচ্ছে বসা যায় আরাম করে।

এতক্ষণ পরে মানুষের শব্দ পেয়েচি। সামনের পাহাড়ের ঢালুর জঙ্গলে কে কাঠ কাট্‌চে—গাছের গায়ে কুড়ালের শব্দ হচ্চে।

আমরা বাংলাদেশের লোক। এ ধরনের পাহাড়, বন, শিলাময় ভূমি—এ ধরনের বনস্পতি কখনও দেখিনি।

এ ধরনের বন বাংলায় নেই। এখানে অত undergrowth নেই—temperate forest and open Forest এখানে। অথচ বেশিদূর দেখা যায় না ঠিক। পাহাড়ের বিশালতা ও বিরাটত্বে এই অরণ্যভূমিকে অন্যরূপ দিয়েচে। বাংলায় বন তেমন কোথায়? যা আছে সে ঘন tropical ধরনের বটে—কিন্তু এমন বড় মাপকাঠিতে নয়। বন্য গজ দ্বারা যে বন অধ্যুষিত নয়, বাঘ, ময়ূর, ভালুক নেই—সে অনেক ছোট scale-এ।

এ বনের অধিবাসীদের কী আসে যায় রাজ্য কখন কার হাতে গেল? যীশুকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হোল বা অশোক যেদিন রাজা হলেন, সেদিনও সামনের পাহাড়টা অমনি দাঁড়িয়েছিল—তখনকার লোকে অমনি জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তো, যেদিন আর্যরা ভারতে প্রথম প্রবেশ করলেন—সেদিনও এই সুদূর সিংভূমের জঙ্গলে, পাহাড়ের অধিত্যকায় অজ্ঞ জনসাধারণ এই ভাবেই জঙ্গলে ঘেরা শুকনো খটখটে গ্রামের মধ্যে এই ধরনের বিকেলে চ্যাটাই পেতে ধান রোদে দিত—কি শিকার করতো—কাঠ কাটতো—কুল শুকতো—জল আনতো—হাতি তাড়াতো—ভালুক মারতো—পাটকিটার যে বুড়িটার সঙ্গে আজ সকালে দেখা হোল—ওরই মত সরলপ্রাণ, মূর্খ জীবেরা এখানে সরলজীবন যাপন করতো। কে খবর রাখতো সুদূর খাইবার গিরিরর্ত্ম দিয়ে কোনো নতুন বিজেতার দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করল কি না? সুবর্ণরেখা তখনও এমনই নিঃসঙ্গ নির্বিকারভাবে বেয়ে [বয়ে] চল্‌ত—এইসব পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে—মাঝে মাঝে হয়তো পাহাড়ি রাজাদের গড় ছিল—এদলে ওদলে যুদ্ধ হোত। আর্যরা এলেই কি বা না এলেই কি? এরা তাদের গ্রাম বা পাহাড়টার ওপারের জগতের সংবাদই জান্‌তো না।

জীবন এখনও এদের ক্ষুদ্র—অনেকে এই পর্বত প্রাচীরবেষ্টিত উপত্যকাভূমির বাইরের বৃহত্তর জগতের খবর এখনও রাখে না—যেমন পাটকিটায় ওবেলায় সেই অশীতিপর বৃদ্ধাটি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। বেলা পৌনে তিনটে। আমি অনেকদুর এসে বসেচি [—] এ আবার আর একটা জায়গা। ও পাহাড়টা পার হয়ে এসেছি। এবার উঠে যাই। নইলে শীতের বেলা চলে যাবে। সুবর্ণরেখা পার হতে হবে সন্ধ্যার আগেই।

গাছের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েচে। আকাশের রং হয়েচে অদ্ভুত ধরনের নীল। পৃথিবীর সৌন্দর্য অসীম। এক কথায় কি বর্ণনা করা যাবে। প্রকৃতির রূপের তুলনা নেই।

একটা কাঠঠোকরা পাখি আমার পেছনের একটা গাছে বসে ঠক্ ঠক্ করে গাছ ঠোকরাচ্চে।

এই বৈকালে আমাদের গাঁয়ের ছায়াভরা বাঁশবন ও ভিটের কথা মনে পড়ল—সেখানটার বরোজপাতার ডোবার ওপারটা আমার কাছে পাহাড় ও অজানা বনে ভরা রহস্যময় দেশ বলে মনে হোত—এখনও কিন্তু সেই

রকমই আছে। বাল্যের সংস্কার হঠাৎ কি যায়?সেদিনই না বারাকপুরে গিয়ে সন্ধ্যায় বাঁশবাগান দেখে ভেবেছিলামবনভূমি আজও সেই স্বপ্নমাখা—সেই কথা আজ এই সুদূর সিংভূমের জঙ্গলে বসে মনে হোল।

বারাকপুরের প্রতি ধূলিকণা স্মৃতিমাখানো, করুণা, অশ্রু, স্নেহ মাধুর্যে ভরা—সেইজন্যে বারাকপুরের সব ভাল লাগে আমার কাছে।

আর এক জায়গায় এসে বসেচি পথে। চারিধার থেকেই অদ্ভুত দেখায়—যেখানে যাই মনে হয় এটাই ভাল—এখানে একটু বসি। সামনে ওই সিদ্ধেশ্বর পাহাড়—ডাইনে এটার নাম মহাদেব ডুংরি range, রোদ রাঙা হয়েচে।

যাই এবার উঠি, বেলা গিয়েচে।

রোদ রাঙা হয়ে এল।

এই নীলাকাশ অপূর্ব, এই বনভূমি অপূর্ব, এই অশোকের সময় থেকে কিংবা যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার দিনটি থেকে, বা বুদ্ধের গৃহত্যাগের দিনটির থেকেও বহু আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাহাড়শ্রেণী অপূর্ব।

গত চারহাজার বছরে এই বনভূমিতে কত মানুষের বংশ, বন্যহস্তীর বংশ, বাঘ ভালুকের বংশ, গাছপালার বংশ, গায়ক পাখির বংশ জন্ম নিয়েচে—তাদের কাজ করেচে—কোথায় মিশিয়ে গিয়েচে—কিন্তু এই পাহাড়—ওই নীলাকাশ ঠিক আছে।

ছায়াচ্ছন্ন বৈকাল। উঠতে ইচ্ছে করছে না—তাই আবার বসেচি। পথের ধারেই এক শিলাখণ্ডে ঠেস দিয়ে বসে পড়েচি—এখানে ধুলো নেই [—] বসবার জায়গা সর্বত্র।

রোদ রাঙা হয়ে এসেচে—এই সময়ে কালীপদদের বাড়ি কুঠির মাঠে যেত। আমিও অনেককাল আগে এমন একদিনে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন প্রথম দূরে অর্থাৎ কুঠির মাঠেই কুল খেতে গিয়েছিলুম।

এই বৈকালটিতে সেই সব পুরোনো কথা মনে পড়চে।

বেলা ৪৷৷০টা। রোদ রাঙা হয়ে পর্বতচূড়ায় গাছগুলোর মাথায় পড়েচে। পাহাড়ের ওপর খানিকটা উঠে একটা প্রশস্ত শিলাখণ্ডে বসেছি ঘন বৈকালের ছায়ায়।

অনেকদিনের সাধ মিট্‌ল—অনেককাল থেকে ইচ্ছে ছিল—ভাগলপুর থেকে কিউল হয়ে ফেরবার দিনগুলো থেকে শিমুলতলায় বন দেখে ভাবতুম এই সব নির্জন জঙ্গলে, রাঙা রোদ-ভরা বিকেলের ছায়ায় বসে থাকতে কেমন লাগে? আমি বৈকাল ভালবাসি বড়—আর ভালবাসি জ্যোৎস্না রাত। আজ এই পাহাড় জঙ্গলে বৈকাল দেখবো বলে বেলা দশটা থেকে সারাদিন কাটালুম এই বনে, জঙ্গলে, পাহাড়ের উপত্যকায়, অধিত্যকায়। সেই রাঙারোদমাখানো বিকেল নেমেচে এই পাহাড়ের বনে, উপত্যকায়, গিবিসানুর বনস্পতিশীর্ষে। কি সুগভীর ছায়া পাহাড়ের ঢালুতে—কি শান্তি চারিধারে।

তাই বল্‌চি অনেকদিনের সাধ মিট্‌ল। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে। বনের শান্তি ও নির্জনতা গভীরতর হোত যদি না এখনও দূরে B ও L Quarry-তে blasting-এরআওয়াজ না কানে আসতো।

এইখানে বসে যত চমৎকার জায়গা যেখানকার বিকেল আমি ভালবাসি মনে পড়চে—যেমন খয়রামারি মাঠ, আমাদের বাড়ির বাঁশতলা, দারিঘাটার পুল—রাজনগরের খড়ের মাঠের বটতলা, ইসমাইলপুরের মাঠ, আজমাবাদ ওই সব।

এইসব সন্ধ্যায় ইসমাইলপুরের দূরের রাঙারোদমাখানো কাশের বনের দিকে চোখ রেখে Wide World Magazine পড়তুম—সেও অপূর্ব।

বিশ্বরূপ অনন্ত—তারই একমূর্তি দেখেচি কুঠির মাঠে, ইছামতীর তীরে—একমূর্তি দেখ্‌চি সিংভূমের পাহাড় জঙ্গলে।

আর একটা পাহাড়ের ঢালুতে উঠেচি।

ফেরবার পথে প্রথমটা যে শিলাখণ্ডে ঠেস্ দিয়ে বসেছিলুম—সেখানে এসে বসলুম। চেয়ে দেখলাম ওপারে ছায়া পড়ে গেছে। কালাঝোর পাহাড়ের পেছনে আরও পাহাড় দেখলুম—মৌভাণ্ডার তামার কারখানা ও ঘাটশিলার সাদা সাদা বাংলোগুলো দেখলুম। তারপরে নীচে নামলুম। সন্ধ্যা একেবারে হয়ে গেছে। মাটির চমৎকার রোদপোড়া গন্ধ—সেই সেবার যেমন বেলপাহাড়ে বেরিয়েছিল তেম্নি বেরুচ্চে।

অফুরন্ত শালের বন ছায়াভরা—সন্ধ্যা হয়ে গেল—কুমিরমুড়ি গ্রামের কাছে এসে জিগ্যেস করলুম এটা কোন্ পথে যাব গালুডিতে। একজায়গায় এসে দেখি কোথায় পথ হারিয়ে ফেলেচি—সুবর্ণরেখার ধারে আর কিছুতেই পৌঁছুতে পারিনে। অন্ধকার হয়ে গেছে, কিছুই দেখতে পাইনে—দীঘ্ড়ি গ্রামটাই বা কোথায়? সুবর্ণরেখার ধারে একজায়গায় এসে দেখলুম খাড়া পাড়—জলে নামা যায় না—আবার ফিরে গেলুম। গাড়ির পথ ধরে সুবর্ণরেখায় নামি। যত যাই, ততই জল বেশি। খরস্রোতা নদী— অতিকষ্টে পথ ঠিক করে পার হলুম। এখন রাত আটটা। সন্ধ্যে ৭টায় বাংলোতে ফিরেচি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২৬শে মাঘ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ খোঁড়া পা একটু সেরেচে। স্টেশনের কাছে একটা পাথরের ওপর বসে ছিলুম। কর বাংলোর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি চাপ্ড়ি খনির foreman-in-charge. তিনি কাল মহাদেব ডুংরির ওপর উঠেছিলেন—সদ্য হাতির নাদ দেখতে পেয়েছেন বল্লেন। তাঁরই মুখে শুনলুম রাজখর্সাওন স্টেশান থেকে নোয়ামুণ্ডি লাইন বেরিয়ে গিয়েচে—ওটা ভয়ানক জঙ্গল আর পাহাড়। ওটা সারেণ্ডা ডিভিসনের অন্তর্গত [—] ওর জঙ্গল সিংভূমের বিখ্যাত জঙ্গল। নোয়ামুণ্ডি স্টেশান থেকে টাটা কোম্পানির ক্যাম্প কিছু দূরে। বিভূতি মিত্রের নাম করলে ট্রলি পাওয়া যায়। মহাদেবনাশা বলে শিব আছে একটা জলপ্রপাতের কাছে। ২॥০ মাইল দূরে। আর মনোহরপুর স্টেশান থেকে দুধিয়া মাইন ও চিড়িয়া মাইন আছে Bengal Iron Co.র, —সে ভয়ানক জঙ্গল। পাথরপাশা বলে স্টেশান আছে—সেখানে রাত্রে বন্যজন্তুর ভয়ে লোক থাকে না। ট্রলি লাইন আছে—মনোহরপুর থেকে পাওয়া যায়। Railway manager আছে Henry সাহেব—তাকে বল্লে পাঠিয়ে দেয়।

টাটানগর থেকে গুরুমৈশানি যে লাইন গেছে—তারই প্রথম স্টেশান হলুদপুকুর—তার কাছে বামুনহাট বলে গ্রাম আছে। খুব সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যে। সাঁওতাল ও কোলের বাস। জঙ্গল নেই, উষর [ঊষর] পাহাড়।

মহাদেবডুংরি পাহাড়ের ওপর শিবমন্দির আছে—গুহা দিয়ে সেখানে ঢুকতে হয়। দৃশ্য বাস্তবিক অপূর্ব। নিচেই রানিঝর্ণা ও ওঁরাওগড়।

বরাহভূমের জনকতক লোকের সঙ্গে আজ সকালে দেখা হোল—তারা বল্লে ওদিকে পাহাড় নেই। টাটানগরের পিছনে যে দলমা পাহাড়শ্রেণী তারই পূর্বপ্রান্ত এসে মিশেচে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীতে। যা জঙ্গল এখানেই। ওরা বলরামপুর স্টেশনে যায়। মহালিখারূপ স্টেশনে নেমেও যাওয়া যায়।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪।২৯শে মাঘ, ১৩৪০।সোমবার

নিস্তব্ধ দুপুর। শিবরাত্রির উপবাস করেচি বলে চুপচাপ শুয়েই আছি। কাল সন্ধ্যায় ডুংরি পাহাড়ের ওপারে একটা শিলাখণ্ডে চুপচাপ বসে ছিলুম। রবিবারে আমাদের দেশে হাট, তা ছাড়া এই প্রথম বসন্তে কত আমের মুকুল হয়েচে, ঈষত্তপ্ত দুপুরের বাতাস, বৈকালের ছায়া আমের বউলের গন্ধে মদির—সেইসব কথা ভাবছিলুম। বেলেডাঙার পথের বড় বড় অশথ বট গাছের তলা দিয়ে লোকেরা হাট করে ফিরচে। গঙ্গাচরণ দোকানে বসে তেলের বোতলে তেল ভর্তি করচে। সত্যি! এমন আনন্দ পাই এসব কথা ভাবতে।

সূর্য মহাদেবডুংরি পাহাড়ের নিচে ডুবে গেল। আকাশ ভরা অস্ত দিগন্তের আভায় আমার পাশের পাহাড়টার বিশাল ঢালুটা রাঙা হয়েচে—অথচ অন্ধকার হয়ে গিয়েচে বল্লেই হয়—বাংলাদেশে এতক্ষণ থাকে না অস্ত আভাটুকু। একটা নক্ষত্র উঠেচে, পাহাড়ের মাথায়—ওই দুটো। ওদের চারিপাশের জগতে না জানি কত অজানা রহস্য, কত জীব—যুগে যুগে যে জীবন আর তাদের ভয়ই বা কি?

আজ স্নানের সময় তেল মাখতে মাখতে গুনগুন করে গান করছিলুম "পুরা যত্র স্রোতঃ' পুলিনমধুনা" ওই সব শৈলশ্রেণী, শালবনের দিকে চাইলে কত পুরানো কথাই মনে পড়ে।

তবুও মনে হয় আমার গ্রাম শতমধুরকরুণ সুখদুঃখময় স্মৃতিতে ভরা আমার কাছে। সেই দিনের বাঁশবনে সেই যে মনে হয়েছিল 'বনভূমি আজও সেই স্বপ্নমাখানো'—সত্যিই তাই। সে স্বপ্ন কখনও পুরানো হোল না, হবেও না আমার কাছে।

অন্ধকার রাত এখানে অপূর্ব। কত জ্বলজ্বলে নক্ষত্র—কাল আমি ও ডাক্তারবাবু যখন পাথরের ওপরে বসে গল্প করচি—সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ে দাবানল জ্বলছিল—অনেকরাতে একবার উঠে দেখি তখনও জ্বলচে। ওদিকে পাহাড়ের পেছনে টাটানগরের blast furnace-এর glow বড় চমৎকার দেখায়।

দেশের জন্যে এখানে যে চমৎকার homesickness অনুভব করা যায়— কলকাতায় হয় না। অনেকদিন পরে এই homesickness অনুভব করলুম। ইসমাইলপুরের পরে আর এমন হয়নি। এবার শুধু বারাকপুরের জন্যে নয়—আমাদের দেশ—বনগাঁ, গোপালনগরের জন্যেও হয়। কলকাতার জন্যেও মন কেমন করে। কল্‌কাতার গলিঘুঁজি, স্কুল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, সভাসমিতি সবটার জন্যে।

বেলা ৫৷৷০ টা। হাট থেকে পাকা কুল, কেঁদ্ ও পেয়ারা কিনে এনে রেলের ওপাশে বিস্তৃত পুকুরটার পারে বসে খেলুম। পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্চে। রাঙারোদ—সাম্‌নে জলের ওপরে মেঘের ছায়া পড়েচে—পাহাড়ের কোলে সাদা বক উড়ে যাচ্চে। দিব্যি তৃণাবৃত ঢালু জমিতে বসে লিখচি। একদিকের উঁচু পাড় ভাগলপুরের? সেই বাঁধের কথা মনে করিয়ে দেয়। ওপারের পাহাড়শ্রেণীর উপর ছায়া পড়ে বড় চমৎকার দেখাচ্চে। এখানকার সব জায়গাই beauty spot [—] ভাগলপুরের মত সেই একটা রেলের ক্যালভার্টটি তার-ঘরের পাশে, আনাচে কানাচে যেমন শিলাবেদী ছড়ানো তেমনি beauty spot ছড়ানো। হাট থেকে এই সব সাঁওতাল মেয়েরা সুবর্ণরেখা পার হয়ে চিড়ি গ্রামের রাস্তা ধরেচে। এইমাত্র সূর্য অস্ত গেল। এখানে দিগন্তের আভা অনেকক্ষণ থাকে। বাঁধের ওপারে হাঁস ডাক্‌চে। এখানকার এই জায়গাটা বাংলাদেশের মত অনেকটা। শিবরাত্রির উপবাস করেছিলুম—বেজায় খিদে পেলে—বাধ্য হয়ে হাটে এসে ফল কিনে খেলুম। বনগাঁয়েরও হাট। গন্‌শা মুচি গাড়ি নিয়ে এসেছিল বোধহয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ২রা ফাল্গুন, ১৩৪০।বুধবার

আজ দেখি পাহাড়ের ধারে আসানবনীর সেই হলুদফুল ফুটেচে—কি চমৎকার দেখায়। পাহাড়টার এপাশে রাঙামাটি ও শালবনে বেড়ানোর সখটা অনেকদিন পরে প্রাণভরে মিটলো। একটি গাছ পাহাড়ের চূড়ায় পূর্বদিকের আকাশের পটভূমিতে পত্রহীন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—কি চমৎকার ছন্নছাড়া নৃত [নৃত্য] শীল নটরাজের মত উদাস, সৃষ্টিছাড়া গোছের দেখায়। আমি এই যেখানে বসে লিখ্‌চি এখান থেকেই পাহাড়ের সেই গাছটা দেখা যাচ্চে। সামনে রাখা মাইনের পাহাড়ে কোথায় মেঘের ছায়া কোথাও রৌদ্রের খেলা। অনেকদিন Geographical magazine পড়ে যে সখ ছিল ওইসব অনুর্বর মরুদেশের ওইসব গাছ দেখ্‌বার—tales of lonely trails বলে বইখানা পড়ে যে ভাবটা জেগেছিল—দেখ্‌লুম সে সব স্থান ভারতবর্ষে অভাব কি—কলকাতার এত কাছেই আছে। সমগদ্র ময়ূরভঞ্জ, কেউঞ্জর, সিমলাখালি পাহাড়, বাস্‌ড়া—ছোটনাগপুর ও C.P.র বনভূমি যদি বেড়ানো যায়—তবে তার অভাব কি?

কলকাতা থেকে week end ২৷৷ খরচ করলেই গালুডিতে এসে দুদিন থাকা যায় ও সহরের একঘেয়েমি কাটিয়ে যাওয়া যায়। রাজখর্সাওন থেকে [,] নোয়ামুণ্ডি বা মনোহরপুর থেকে দুধিয়া মাইন যাওয়া যায়। কুলামাড়ো [,]পাট্‌কিটা যাওয়া যায়। কত নিকট!

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

বেলা ৬টা রাখা মাইনস্ বৈকাল—রাখা মাইনে বসে লিখ্‌চি। কি অদ্ভুত দৃশ্য জীবনে কখনও ভুলবো না—এক সাধুর আশ্রমে বসে আছি। পাহাড়ের অধিত্যকায় শুষ্ক বনতুলসীর জঙ্গল। ধাতুপ ফুল ফুটেচে যেন ডাল ভরে

গিয়েচে—মধুতে ভরা। ঝাড়লে মধু পড়ে। বিরাট সমতলভূমি—কি উচ্চ পাহাড়, চারিধারে অভ্র, তামা পাথরের ছড়াছড়ি। বিরাট অধিত্যকায়—অপরাহ্ণের ছায়া নেমে এসেচে। পাহাড়ের অধিত্যকা বৃক্ষে ভরা—পাহাড়ের সুউচ্চ মাথায় রাঙা রোদ। দুটো পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকা। বড় পরিত্যক্ত চিম্‌নীর পাশে একটা পত্রহীন বৃক্ষে হলুদ ফুলে ভরা—আসানবনীর সেই ফুল। এ সৌন্দর্যের বর্ণনা করি এমন ক্ষমতা নেই। পাঞ্জাবী সাধুনী এখানে একা থাকেন পরিত্যক্ত magazine-এ। তাঁর কাছে এসে গল্প করচি, আমি, মাদ্রাজী কবিরাজ ও ডাক্তার। দূরে নীল পাহাড়শ্রেণী। এক জায়গায় তামা পাথর ধুয়ে নদী বয়ে আসচে হীরাকস্‌ রং-এর জল—কি অদ্ভুত স্থান।

ঘেঁটুফুল দেখলুম রাখা মাইনে—সেদিন পাহাড়ে যে রূপ দেখেছিলুম রাখা মাইনের সৌন্দর্য তার চেয়ে বেশি।

পোসোইতো। ১৭-২-৩৪।

আজ সকালে গালুডি থেকে এখানে এসেচি ও ঘন জঙ্গলে চাঁইবাসা রোডের ধারে বসে লিখ্‌চি। বড় ঘন বন, মন চোখ বসে। কত কি অপরিচিত পাখি ডাক্‌চে। একটি লোক নেই কোনো দিকে। বনস্পতি গাছ সব দিকেই। বাতাসে আদ্রর্তা কেমন একটা। এত বেলা হয়েছে—ন'টা বাজে—এখনও রোদ ওঠেনি ঘন অরণ্যের মধ্যে ভাল করে। একজন মুণ্ডা Forest Officer-এর সঙ্গে দেখা হোল। সে বল্লে এটা আর কি জঙ্গল?৮/১০ মাইল ভেতরে জঙ্গল আরও ঘন। এটা protected forest—সেটা Reserve Forest. গাছ কি কি আছে? বল্‌তে বল্লে কেঁদ, শাল, গামারা, আসান, পিয়াল ইত্যাদি। কেঁদই ওখানে বনস্পতি—সুদীর্ঘ, কালো গুঁড়ি। হরিণ আসে, হাতি আসে কেউঞ্জর স্টেটের অরণ্য থেকে।

এখানে গিরীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক থাকেন—বাড়ি ধর্মদহ, নদীয়া। তার এখানে বাড়ি আছে। যদি এখানে আসি, তিনি সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করলেন।

মাঝে মাঝে জঙ্গল খুব ঘন, মোটা মোটা কাষ্ঠময় লতা ও গড়ান্‌ গাছ [যার পাতা কাঞ্চন ফুলের মত] অত্যন্ত বেশি। অন্ধকার ও আর্দ্র—Undergrowthও আছে। চাঁইবাসার পথটি অত্যন্ত বাঁকা বাঁকা এবং রাঙা ধুলোয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

একটা ছোট পাহাড়ের ওপরে উঠেচি—চাঁইবাসা রোডের ধারে। সেটার উপর বসে লিখ্‌চি। আজ হাটে এতক্ষণে দারিঘাটা পুলের কাছ দিয়ে শ্যামাচরণ দাদা হাট করে যাচ্চে। সন্ধ্যা হয় হয়। The whole hill is alive with a sort of insects এবং বোধহয় একটা সাপ দেখেছিলাম।

ভয় হোল—পাহাড়টা wild, কাঁটাগাছ, পিয়াল ফুলের গাছ, পট্‌পটি ফলের মত ফল ধরেচে এম্‌নি একটা ঝোপ—এই সবে ভর্তি—বড় দুর্গম, বড় বড় শিলাখণ্ডে ভর্তি। চারিধারের দৃশ্য বড় অপূর্ব। দূরে মৌভাণ্ডার কারখানার চিম্‌নী—ঐ আমাদের বাংলার একটুখানি দেখা গিয়েচে। ভারি সুন্দর ছায়া। আজ আমাদের গোপালনগরের হাট—সেকথা মনে হোল। গৌরী যেন শিলাখণ্ডে পাশেই বসে আছে। নেমে এসে সুন্দর শালবনের পাশ দিয়ে রাস্তার ধারে—সেদিনকার সেই শিলাখণ্ডে বস্‌লুম। বড় ভাল লাগলো। একফালি চাঁদ উঠলো—জ্যোৎস্না উঠল। দুজন লোক আসচে শোলা নিয়ে, বাড়ি তাদের কুল্‌ডিহা—রাখা মাইন্‌স্‌ স্টেশনের সাম্‌নে। তারা হেঁটে আস্‌চে চাকুলিয়া থেকে, এখান হতে ১৭ ক্রোশ দূরে। বাসার বাইরে এসে চেয়ার পেতে বস্‌লুম্‌—ইসমাইলপুরের রাত্রিগুলোর কথা মনে হোল। এই চেয়ারখানা হয়ে পর্যন্তই ঘোরাচ্চে।

An adventure on a hill of singbhum, a plot for study. ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা পাহাড়টার কাছের রাস্তায়—তিনি আমায় খুঁজছেন কিন্তু আমি তা চাইনে। বেড়াবার সময় নির্জনতা পছন্দ করি।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৩৯৪। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে গরুর গাড়িতে দু'ক্রোশ দূরবর্তী দীঘাগড়ার পাথর খাদানে গিয়েছিলুম, এইমাত্র আসচি। পথে বুরুডি, ঝাঁপড়িশোল, ফুলপাল, রামচন্দ্রপুর, বাসাডেরা, মৃগীচামী প্রভৃতি অরণ্যপাহাড় বেষ্টিত সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম। এই পাহাড়শ্রেণীর নাম কোথাও বেল্‌ডাহি, কালাঝোর, শুক্‌না ইত্যাদি—ওদিকে পাহাড় অনেকদূরে

চলে গিয়েচে, বন যেমন ঘন, দৃশ্যও তেমনি অপরূপ। পথে কুল খেতে খেতে গেলুম। এক জায়গায় শুকনো পাতা জ্বালিয়ে বৈকালে জঙ্গলের মধ্যে চা খেলুম। একটা গাছের খুব বড় বড় কুল পেড়ে নিয়ে এলুম। আজকাল মহুয়া ফুল ও কুলের সময় সন্ধ্যার পরে বনের পথে ভালুকের সন্ধান মেলে। জ্যোৎস্নার আলোতে ফুলপাল গ্রামে সন্ধ্যার সময় আজ সাঁওতালেরা কি একটা বাজিয়ে আনন্দ করছিল। আমরা সকালে সেই যে একটা গাছে কুল খেয়েছিলুম, দেখে একটি সাঁওতালের মেয়ে হেসেছিল—সেখানে যখন এসেছি—তখন পাহাড়ে দাবানলের দৃশ্যটি কি অপূর্ব দেখাচ্ছিল। বৈকালে এক জায়গায় শালবনে কঠিন মরুম কাঁকরের ওপর পাটনার সতরঞ্চিটা পেতে খাবার খেলুম।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে এসেচি। মহাদেব ডুংরির মাথার ওপর বসে লিখচি। শিখর দেশ অত্যন্ত দুরারোহ। আর বড় জঙ্গল। মাথার ওপর ভালুকের নাদ দেখতে পেলাম। একটা কতকালের শিবমন্দির আছে। দুটো গুহা দুদিক দিয়ে তার মধ্যে গিয়েচে। দূরে সুবর্ণরেখা চলে গিয়েচে—মৌভাণ্ডার দিকে। চাঁইবাসার কালো রাস্তা পাথর খাদানের তলা দিয়ে চলে গিয়েচে। Tales of lonely trails যখন পড়তুম তখন এইসব বন জঙ্গলের কথা ভাবতুম—এতদিনে সার্থক হোল। এবার বনজঙ্গলের অভিজ্ঞতা হোল যথেষ্ট।

পাহাড়ের মাথায় খানিকটা সমতল ভূমি [—] তবে বড় বড় ঝামাপাথরে ভরা। জায়গায় জায়গায় ধ্বস নেমেচে। একটু জল নেই কোথাও। রৌদ্রদগ্ধ বৃক্ষপত্রে হাওয়া লেগে শন্ শন্ করে শব্দ হচ্চে—টুপটাপ খস্ খস্ করে ঝরা-পাতার শব্দ। এইমাত্র দুটো বন মোরগ দেখেচে আমার সঙ্গে সাঁওতাল ছোঁড়াটা [—] ওর নাম আনাৎ। সেদিন এই পাহাড়ের মাথাতেই তারাপদবাবুরা বুনো হাতির নাগ দেখেছিল। আমি অবিশ্যি কিছু দেখিনি। খেঁক্‌ড়া, আস্‌কাল বলে পাখি আছে—একটা পাঁই করে উড়ে গেল— বাজপাখির মত শিকারী। হরিণ আছে।

সিদ্ধেশ্বরডুংরি অর্ধেকটা উঠেচি। আর উঠবো না ভাবচি। ঘন কেঁদ, পড়াশী, পলাশ, শালের জঙ্গল। পথে একটা ভালুকঝোড় অর্থাৎ ভালুকের গর্ত দেখা গেল। মহাদেব ডুংরিতে এইমাত্র ছায়ায় বসে আছি—ওদিকে ভালুকের শব্দ হোল—খেঁড়লোকে ভালুক তাড়াচ্চে [—] আমার সঙ্গের লোকটা বল্লে। চারিধারের দৃশ্য অতি অদ্ভুত-তবে বড় বড় বনস্পতিতে দৃষ্টি আট্‌কেচে—দুপুরবেলায় বেশ ছায়া। সিদ্ধেশ্বর ডুংরি এখনও আর অনেকটা উঠতে হবে। আমরা যেন দেবতা—মর্ত্যলোকের কেউ নই এমন দেখাচ্চে। যখন মহাদেব ডুংরির ধার থেকে দূরে সুবর্ণরেখাকে রাঁচির দিকে বেঁকে যেতে দেখলাম ও বাঁয়ে রাখা মাইনসের চিমনী ও খাদ দেখলাম সে একটা experience of a life time!

অবশেষে সিদ্ধেশ্বর ডুংরিতে উঠলাম। যেমন দুরারোহ, তেমনি বনস্পতি সমাকুল, খাড়া steep grade—দুর্গম জঙ্গল। কাঁটাগাছ অনেক বেশি। ওঠা যে কি কষ্ট! তার ওপর বেলা ১২টা বেজেচে। তেমনি তেষ্টা পেয়েচে। কষ্ট শুধু তৃষ্ণায়। এসব পথে জল নিয়ে ওঠা দরকার। এতবড় পাহাড়ে কখনও জীবনে উঠিনি, এক এক জায়গায় শুধু অনাবৃত শিলাস্তর। জুতো নিয়ে ওঠা বড় বিপজ্জনক। গড়িয়ে পড়লে প্রাণ সংশয়। এক জায়গায়—পার্বত্য চীহড় বৃক্ষের ছায়ায় বসে লিখ্‌চি। সঙ্গের সাঁওতাল ছোঁড়াটা চীহড় গাছে ফল পাড়তে উঠ্‌ল। চট্‌কা ফলের মত অথবা খুব বড় মাখম সিমের মত ফলগুলো। মধ্যে টাকার মত চ্যাপটা বড় বড় বীজ থাকে। আনৎ বল্লে পুড়িয়ে খেতে হয়। আমি বল্লুম পোড়া। আগুন জ্বালিয়ে চীহড়ফল পোড়ানো হোল। এক জায়গায় হাতির নাদ দেখলাম। পকেটে করে নিলাম। চীহড় গাছ লতানে কাষ্ঠময় বৃক্ষ—বড় বড় পাতা। কি একরকম পাখি ডাকচে। মধ্যাহ্নে জঙ্গল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ—বাংলাদেশে এ বসন্তে ঘেঁটুফুল ফুটে [—] বড় নিরীহ, গ্রাম্য, শান্ত দেশ। কোনো বিপদ নেই—সুন্দর। বাংলাদেশের কথা গ্রামের কথা মনে হয়ে গেল [—] ওই যে ও এমন একটা দেশ যেখানে ঠাণ্ডা জল খেতে পাওয়া যায়—এত জল তেষ্টা পেয়েচে!

নামবার সময়ে একটা জায়গায় পাহাড়ের সানুদেশে প্রকাণ্ড কেঁদগাছ হাতিতে ভেঙে দিয়েচে। ভালুকের নাদে পা দিলাম আবার [—]পাতায় মুছে ফেলি। সঙ্গের সাঁওতালটি বল্লে—বড্ড ভারি গজাড় আছে বাবু। যেতে পারবি। গজার মানে বন।

তারপরে একটা পথে নেমে এলাম রানী ঝর্ণার জল খাবো ও নিয়ে নেবো বলে।কিছুদূরে একটা গোর। খেঁড় জাতির লোক মারা গিয়েচে শুনলুম। এগিয়ে এসে ওদের কুঁড়েঘর—চারিধারে পর্বত ও অরণ্যবেষ্টিত অতি সুন্দর স্থানে। জাম বাটিতে জল নিয়ে এল সেই জল খেলুম। এ জায়গাটা ঠিক যেখানে এসে চাঁইবাসা রাস্তার সঙ্গে গালুডির রাস্তা মিশেচে—তার সাম্‌নেই পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে পথ উঠেচে—ওই পথে। পাশেই রানিঝর্ণা। পাশে অনাবৃত স্তররাজি।

তারপর এসে একজায়গায় শিলাখণ্ডে ঠেস্ দিয়ে বসলুম। সামনে ওই দূরে আমাদের নেকড়াডুরি [—] পেছনে আমাদের বাংলাটা দেখা যাচ্চে। দূরে ডাইনে মৌভাণ্ডার কারখানা। সাম্‌নে এই কালাঝোর পাহাড়—কাল যে পথ দিয়ে দীঘাগড়া গিয়েছিলুম—সেই পথ ও যেখানে কাল জঙ্গলে আগুন দিয়েছিল—সেটা ওই দেখা যাচ্চে। এখানে সেই কালকার বন-কাটিগ্রাম এরই—সামনের পাহাড়ে কাল রাতে আগুন দিয়েছিল। ওর পেছনেও লম্বা পাহাড়শ্রেণী অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্চে—বোধহয় ধলভূমগড় পর্যন্ত। কালাঝোরের পেছনেও আর একটা range of hill দেখা যাচ্চে। এদিকেও অরণ্য খুব বেশি। বেলা পড়ে এসেচে। পেছনের পাহাড়ের সানুদেশে ছায়া পড়েচে। সিদ্ধেশ্বর ডুংরিতে আজ শেফালি বৃক্ষ দেখেচি। পলাশ নেই। পিয়ালফুল ফুটেচে চারিদিকে তার গন্ধ নেই। সেদিন পাটকিটার জঙ্গলে যে গিয়েছিলুম—সে এর তুলনায় অতি নিরীহ ব্যাপার।

বাবার সেই শ্লোক লেখা টুকরো কাগজখানা বার করে দেখ্‌চি। 'অস্মাকং সন্তু গব্যানি, গ্রাসা সন্তু ন শোষণং, অখ্যাতি রিতি গঅখ্যাতিরিতি তে কৃষ্ণ মগ্না নৌনাবিকে [নৌর্নাবিকে] ত্বয়ি।' পাশের শিলাখণ্ডে পাথর চাপা দিয়ে রেখেচি সেটা।

A plot on Thirst—'তৃষ্ণা'। জল পাওয়া যায় না। জিব আঠা চটচটে। গা যেন জ্বলচে। কাপড় গা থেকে খুলে দিতে ইচ্ছে করচে। গা দিয়ে আগুন বেরুচ্চে। Dreams of cold water...All thoughts in terms of cold water...বাংলাদেশের নদী—ঠাণ্ডা জল বকুলবনের ধার—ঠাণ্ডা কাদা। কলকাতায় বরফ সরবৎ।

ওই খোঁড়দের গাঁটাতে বল্লে যে পাটকিটাতে জলের ধারে আজ কদিন থেকে ৪টা হাতি এসে আছে।

A novel of forest।

ওতে নির্জনতার কথা থাক্‌বে। গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী—খাড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতু প্রস্তর। রঙিন ঝর্ণা যা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসচে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলি বন। চীহড় ফলের গাছ ও চীহড় ফল। কেঁদ। আমলকী। বিরাট দৃশ্য। বিরাট জাতি। টাঁড়বারো। ভালুক ঝোড়। ওরাম্‌গড় ও রানিঝর্ণা। পাহাড়ের দেবতা বনময়ূর ও বনমোরগ। দূরে সমতল ভূমির দৃশ্য। অভ্র, তামা ও লোহার পাথর। গুহা যা রহস্যময়, যার মধ্যে দিয়ে কোথায় যেন যাওয়া যায়—বোধহয় তা পাতালপুরীতে। বনকুকুর। পোসেইতার সেই ঘন বন। চিমনির মত কেঁদ গাছ। দীঘাগড়ায় নির্জন বনপথে মাঝে মাঝে forest guard-এর ঘর, পাহাড়ের মাথায় আগুন। বৈশাখজ্যৈষ্ঠ মাসে draught. কাট কাট্‌তে গিয়ে পালিয়ে আসে জলাভাবে। হরিণ ময়ূর তৃষ্ণায় [—] একটি মাত্র ছোট্ট ঝর্ণায় জল জমানো খাদ আছে, সেখানে জল খেতে নামে। বাঘ, ভালুক, হাতি সব। বড় শঙ্খচূড় বা অজগর সাপও রাত্রে জল খেতে আসে। বানা, টাঁড়বারো বা বনগড়ার দেবতা অনেকে দেখেছে—গভীর রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে সতর্ক করচে। লোকের গোর। খেঁড়জাত শুধু সিম চাষ করে। বাঘের ডাক রাত্রে। হাতিতে গাছ ভাঙচে মড় মড় করে। ভালুক চলেচে। ময়ূর ক্যাঁক্যাঁ করে ডাক্‌চে। অনেক রাত্রে একরকম সুস্বর পাখি ডাকে ঠিক যেন রূপোর ঘণ্টা। বন্য শেফালীর সুগন্ধ রূক্ষ্ম [রুক্ষ] কর্কশতা। পুতুপুতু ভাব নেই। কুসুম গাছের রাঙাপাতা।

দুজন সাঁওতাল মেয়ে কয়লা আনতে যাচ্চে [—] খেঁড়দের গ্রামের কাছে জঙ্গলে কাঠকয়লা পোড়ানো হচ্চে—সেখানে। বল্লে—বাবু ওই যে কুসুম গাছটার তলায় কামারের দোকান—ওখানে কয়লা নিয়ে যাচ্চে। কুসুম গাছের

রাঙা পাতা দেখা যাচ্চে। অড়র খাচ্চে দুজন ছোট ছেলে খেঁড়েদের ঘরে। সিদ্ধেশ্বর ডুংরির ওপারে অখিলকোচার ঘন জঙ্গলে রানিঝর্ণার উৎপত্তি স্থানে বন্যহস্তী সব সময়ই থাকে। একটা bill elephant বড় বদ্‌মাস, মানুষ দেখলেই তাড়া করে।

রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। পাহাড়ের মাথায় অরণ্যানীর রাঙা রোদ মাখানো শোভা অপূর্ব। ছায়া পড়ে আস্‌চে। আমার সাম্‌নে ডাইনে পাথর খাদানে কুলিরা কাজ করচে একজন বল্‌চে—জাম বাটিটা দে ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে আয়। ওখানে বৈদ্যনাথ মহন্তি, মহাদেব এরা সব কাজ করে।

প্রথম দিন এখানে এসে নন্দীর গোলার কাছে যে ছোট্ট পাহাড়টাতে উঠি—ওই সেটা দূরে নেক্‌ড়াডুংরির ওপাশে বল্মীকস্তূপের মত মনে হচ্চে। একটা পরিচিত জিনিস রয়েচে পাশের একটা গাছের গায়ে—আল্‌কুশি ফল। দেশলাই-এর বাক্সের মত মালগাড়িটা দেখা যাচ্চে দূরে।

ইসমাইলপুরের জঙ্গল এর চেয়ে অনেক নিরীহ—কিন্তু মনোরম। এ যেন বড় বেশি রুক্ষ। অনেক বিরাট। সে নরম মাটির দেশ আর এ শুধুই পাহাড় আর পাথর। এখানে নানা বিপদ। সেখানে বিপদ নেই। এ দেশে পথ চল্‌বার জো নেই [—] শুধু কাঁকর আর বালি।

ভেবে দেখ্‌লুম আমার কাছে আমাদের গ্রামের বাড়ির পেছনে বরোজপোতার ডোবার ওধারের বাঁশবনটা এখনও অনাবিষ্কৃত ও রহস্যময় দেশ রয়ে গেছে।

বেলা একেবারে পড়েচে। লতাপাতার কটুক্তি গন্ধ বেরুচ্চে। আমি পিছিয়ে গিয়ে রানিঝর্ণার ধারে দাঁড়িয়ে আছি।

সাঁওতাল কুলি যারা কয়লা বইছিল তারা আমার সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করলে। কলকাতায় দুতলা দালান আছে বাবু? কল্‌কাতায় গাছ নেই—সেখানে কি সব গাছ কেটে ফেলেচে। বলু আমাদের কল্‌কাতায় গিয়েছিল বাবু, সব দেখে এসেচে। ওই যে মৌভাণ্ডাতে কাজ করে।

গান করতে করতে যাচ্চে দুজনে গভীর বনের ওপারে। ওদের মুখের হাসি বড়মিষ্টি।

পাথর খাদানের অক্ষয় বলে একটা লোক বল্লে যখন নিচে নেমে এসেচি—বাবু আপনি একদিনে দুটো পাহাড়ে উঠ্‌লেন?

অবাক হয়ে গেল।

ধাতুপ্ ফুলের অপূর্ব রূপ—বনের সর্বত্র। ডালের গায়ে গুঁড়ির গায়ে পর্যন্ত বড় বড় লাল ফুল ধরেচে। কি সৌন্দর্য!

নেমে এসেচি। বেলা পড়ে গিয়েচে। সন্ধ্যা হয় হয়। কুমিরমুড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে সুবর্ণরেখার তীরের কাছাকাছি এসে একটা একটা শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের কথা মনে পড়লো। একদিনের কথা সেই যে বাকে সিং বলেছিল—হ্যাঁ ওই তো মালিক, কোথাকার খামার যেন দেখ্‌তে গিয়েছিলুম—সেখানকার সেই সোঁদা মাটির গন্ধ—রাঁচী বইহার, শূওরমারি—সেই সব মনে পড়ে [—]I am feeling homesick for them. আর একবার সেখানে যাব। সেখানকার চেয়েও ভীষণ আরণ্যজীবন এখানে যাপন করচি বটে—আরও অপরূপ। সে ছিল নন্দনবন, দূরে ছোট ছোট পাহাড়। এ আসল অরণ্য, বন্যগজ ব্যাঘ্র ভালুক অধ্যুষিত—এ পাহাড়ও নিতান্ত মন্দার পাহাড় নয়। তবুও ইসমাইলপুরের কথা মনে হয়। সেই জ্যোৎস্না রাত্রি।

অবিশ্যি এখানেও ভরপুর রোদপোড়া সোঁদা মাটির গন্ধ এখন বেরুচ্চে এবং এটাই মনে করে দিচ্চে ইসমাইলপুরের কথা।

একদিন রাজনগরে গিয়ে মাঠে ও বটতলা ভেবেছিলুম এই ইসমাইলপুর। হায় কি অনভিজ্ঞতা।

ফিরে এসে জ্যোৎস্না রাতে কতক্ষণ বাইরে বসে রইলাম। হাতের শুকনো পেঁপে ডালের মত ডালটাতে বাঁকা কঞ্চির কথা মনে হোল। সত্যি জীবনটা কি শোক, দুঃখ, সুখ, শান্তি, বিষাদপূর্ণ—কি অদ্ভুত ব্যাপার—আর যাঁকে ভগবান বলা হয় তিনি কি বিরাট। আমি এই ভগবানকেই জান্‌তে চাই। কালী, দুর্গা—গ্রাম্য দেবতা। এই মহান্ বিরাটতার সঙ্গে খুকুর কমনীয়তা, গ্রাম্য ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য সবই তিনি সৃষ্টি করেচেন— এমন কি spirit world-এর cosmic either-এর সমুদ্র পর্যন্ত। তিনি যদি আশীর্বাদ করেন আমি তাঁর সৃষ্টির বিরাটতা কিছু যেন ফোটাতে পারি—এক কণা হলেও তাও worth striving for.

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪। ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে নন্দীর গোলার মাঠে বেড়িয়ে এলুম। কাল ও পরশু অপরাহ্ণে নির্জনে পাহাড়ে পেছনে শালবনটাতে শিলাবেদীর ওপর বসে কি enjoy করেচি। জীবনে ওরকম আনন্দ বেশি পাইনি। কাল খুব যখন জ্যোৎস্না ফুটেচে তখনও শিলাখণ্ডে বসে আছি—পাশের কেঁদচারাগুলোর পাতা জ্যোৎস্নায় চিক্‌চিক্ করচে—দূরে পাহাড়েরবনে আগুন দিয়েচে—পেছনের পাহাড়ে গোলগোলি ফুল ফুটেচে—পাহাড়ের মাথায় নক্ষত্র উঠেচে—হাউই বাজির মত একটা trail blazer খসে পড়ল—খানিকটা যেন দেখালো ইসমাইলপুরের কাশ-ঝাউয়ের বনের মত—সে এক অপূর্ব আনন্দের ব্যাপার।

আজ বাংলোর পিছনে শিলাখণ্ডে বসে লিখ্‌চি। আজ এখান থেকে চলে যাবো, কে জানে আবার কবে আসবো বা আসবো কিনা?

গালুডিকে বড় ভাল লেগেচে। ঘাটশিলা এর তুলনায় অতি বাজে জায়গা।

১লা মার্চ, ১৯৩৪। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

মেসে রং খেলে সবাই। দুপুরের পর নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে দেখি তার শরীর খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে। কালাজ্বরে ভুগ্‌ছেন। কোথায় change-এ যাওয়া যায় তা নিয়ে পরামর্শ হোল। রাত এগারোটার সময়ে বাসায় গিয়ে দেখি তখনও রান্না হয়নি। আজ আবার মেসে feast হচ্চে। এদিকে রাত ১২টা বাজে। এত রাত্রে খেলে শরীর তো খারাপ হবে—ভারত বললে। পেছন থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠলো—ভাল দেখায় না মোটেই।

২রা মার্চ, ১৯৩৪। ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে স্নান সেরে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে পথে বেরিয়েচি—ফিয়ার লেনের সেই ভূতোর সঙ্গে দেখা। সে চা খাওয়ালে একটা দোকানে—তারপর সেখান থেকে স্কুল। স্কুলের সকলের সঙ্গে খুব আলাপ পরিচয় হোল। দোলা [?] দেখতে এসে জিগ্যেস্ করলে। বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হয়ে চৌরঙ্গি গিয়ে হেঁটে এসে ট্রাম ধরে এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। দিল্‌খাস্ কেবিনে চা খেলাম অনেককাল পরে। দোকানের থেকে বার হয়ে পি. সি. সরকারের ওখানে এলুম—হরিবোলার সঙ্গে দেখা। সে কোথায় এসেছিল এখানে। রাত্রে দুটো ছেলে অটোগ্রাফ নিতে এল—হোস্টেলের বিমলেন্দু?...অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব হোল।

৩রা মার্চ, ১৯৩৪। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে স্কুল—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে চা খেয়ে বই-এর দালালের গাড়িতে Imperial Library—ওখান থেকে সিংভূমের গেজেটিয়ার পড়ে সন্ধ্যার আগে কর্জন পার্কে বস্‌লুম। বেশ লাগ্‌লো। অনেক ছেলেমেয়ে। Well kept Garden—লোকজন, সুন্দর ফুল ফুটে আছে—সিংভূমের জঙ্গলের সঙ্গে অদ্ভুত contrast!

অথচ এর এত কাছে সেদিন সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে আমি চীহড় ফল কুড়িয়ে খেয়েছিলুম। সেখানে বুনো হাতিতে কেঁদ গাছ ভেঙেচে। ওখান থেকে ট্রামে রমেশবাবুর আড্ডায় এলুম বাড়ি ঠিক করবার জন্যে—সেখান থেকে বাসা।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৪। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে মণীন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখান থেকে দুজনে সুধীর চৌধুরীর বাড়ি যাচ্চি [—] পথে সীতা দেবীর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। সুধীর এল। গল্পগুজব হোল—একটু পরে শান্তা দেবী এলেন। ঘাটশিলার জমি কিন্‌বার বিরুদ্ধেআমি খুব বক্তৃতা দিলাম। তারপর মণীর বাড়িতে এসে খুব আড্ডা হোল—খেলুম সেখানে। বেলা ২টার পরে ট্রামে এলুম চৌরঙ্গি। ট্রাম [—] rest Lane এর পেছনে একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করে নীরদবাবুর flat-এ। রাত্রি দশটায় ফিরি। প্রমোদবাবু এল।

৫ই মার্চ, ১৯৩৪। ২১ ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে গেলুম মাণিকতলা। সেখানে অনেকক্ষণ বসে বসে তারপর এলুম মুক্তারামবাবুর স্ট্রীট। তারপর আমি আর কণিষ্কবাবুর ভাই দুজনে বেরিয়ে college square-এ এলুম। কিছু খেয়ে পুঁটিরামের দোকানে গোলদিঘিতে একটু বসেচি—আশুর সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে আবার গিয়ে গোলদিঘিতে খানিকক্ষণ কাটালুম। তারপর ফিরে আসি। সকালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অবিনাশবাবু প্রভৃতি এল।

৬রা মার্চ, ১৯৩৪। ২২শে ফাল্গুন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে টরু এল। তারপর স্কুলে গেলুম। পথে বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখা। তাকে দেবব্রতর কথা জিগ্যেস করি। স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সুকুমারবাবু বল্লেন, সুনীতিবাবু এবার বাংলার হেড্ এগ্‌জামিনার। ভালই হোল। নীরদবাবুরা flat-এ যাবার জন্য বেরিয়ে B.N.R. আপিসে গেলুম—[?] Water-এর বই পড়লুম। flat-এ গিয়ে দেখি জানু বসে আছে। সে একখানা লটারির টিকিট বিক্রি করলে। চা খেলুম। নীরদবাবু এলেন না—অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রাত ৯॥০ টায় ফিরি।

৭ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪০।বুধবার

সকালে স্নান সেরে নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। জানু ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল দোরে। এখান থেকে হাওড়া স্টেশন গেলুম। তারপর সেখান থেকে ওদের তুলে দিয়ে ট্রামে ফিরে এসে কিছু খাবার খেলুম ও নিউমার্কেট থেকে Wide World কিনলুম একখানা। তারপর স্কুলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি শ্রীরাম ও মৃত্যুঞ্জয় গোলদিঘিতে এলুম। পথে মোহিত সাইকেলে চেপে অনেকদূর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। গোলদিঘিতে কিছু খেয়ে আমি ফিরলুম বাসায়।

৮ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে গেলুম থ্যাকার Spink -এর দোকানে। লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর বইখানা পড়ে ও তার ফটোতে দেখ্‌লুম মহীশূরের খারাপুর [?] ফরেস্টে হাতি পাওয়া যায় ও অতি চমৎকার জঙ্গলের দৃশ্য। শালবন নয়, অন্য ধরনের বন এবং অনেক সুন্দর। ফিরে ভাবলুম সতীশের দোকানে একবার যাবো। বউবাজার দিয়ে হেঁটে প্রায় মোড় পর্যন্ত এলুম, ওর দোকানটা আর পাইনে—তারপর আবার অনেকটা গেলুম। দেখি দোকানটা যেন বন্ধ। পাশে একজন দোকানদারকে জিগ্যেস করলুম, সে বল্লে—সতীশ তো মারা গিয়েচে, জানেন না? গ্রহণের পরদিনের পরের দিন মারা গিয়েচে।

কতক্ষণ বসে রইলুম। কষ্ট হোল স্ত্রীর জন্যে। এই অল্পবয়সে বিধবা হোল।

৯ই মার্চ ১৯৩৪। ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪০। শুক্রবার

তারপর স্কুল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী, বিকেলে বৃষ্টি পড়তে লাগল। ধর্মতলার মোড়ে একটা রেস্টোরেন্টের কাছে মৃণালের সঙ্গে দেখা অনেককাল পরে। মৃণাল একদিন ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল, যেতে পারিনি সেজন্যে ত্রুটি স্বীকার করলুম।

মৃণাল স্কুলের চাকুরি নিয়ে রেঙ্গুন যাচ্ছে বল্লে।

১০ই মার্চ ১৯৩৪। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪০।শনিবার

স্কুল থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেবিতে গিয়ে ... bart-এর Chotonagpur, a forgotten province of the Empire বলে বইখানা পড়লুম। বেরিয়ে পশুপতি বাবুর হাসপাতালে গিয়ে দেখি বেরিয়ে গেছেন। আবার একটা দোকানের দোতলায় বেশ খাবার জায়গা করেচে—সেখানে খেয়ে মনোজ বসুর বাসায় গেলুম। মনোজ নেই। ওখান থেকে আবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এসে ৭টা পর্যন্ত পড়া গেল। সেখান থেকে বাগবাজারে পশুপতিবাবুর ডাক্তারখানা। চা খেয়ে ৯॥০ পর্যন্ত গল্পগুজব করি। তারপর ট্রামে চলে আসি।

১১ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪০। রবিবার

সকালে মণির ওখানে গেলুম। বৈকালে নানা জায়গায় বেড়াই। নীরদের কাছেও গেলাম। তাদের বাড়িতে কেউ নেই। বন্ধুর ওখানে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম ও চা খেলাম। পশুপতি বাবুর বাড়িতে ফটো তোলা হোল। রাত্রে সেখানে অনেক খেয়ে অনেক রাত্রে ফিরি।

১২ই মার্চ, ১৯৩৪। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে সবাই চাঁদা করে খেলে। পশুপতি বাবু Mr. Rishi-র সংবাদ আনবেন বলে ৫॥০ টা পর্যন্ত বসে রইলুম। তারপর তাঁর গাড়িতে প্রথমে মিহিরের বাড়ি এলুম। সেখান থেকে বাসা। জিগ্যেস্ করলুম কেমন এক্সামিন্ দিলে। সেই মিহির, আমি যখন প্রথম এ স্কুলে আসি, তখন এ 5th class-এ পড়তো।

আজ সকালে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাবার সময়। সে পা টিপে টিপে কেমন যাচ্ছে আমায় দেখে।

১৩ই মার্চ, ১৯৩৪।২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪০।মঙ্গলবার

আজ বারুণীর ছুটি। সারাদিন বসে বসে লিখলুম ও পড়লুম। বৈকালে রিশির ওখানে থাকে বলে বঙ্গশ্রীতে গেলুম ৬॥০টার সময়ে। আজকাল সব সময়ই ভাবি নীরদবাবুরা গালুডিতে গিয়ে এতক্ষণে কি করচেন। এ আমার একটা বাতিক হয়েচে—এ থেকে খুব আনন্দ পাই।

দুপুরে ঘুমুলাম। উঠে লিখলুম দৃষ্টিপ্রদীপের খাগড়াঘাটের অধ্যায়। তারপরে উঠে গোলদিঘিতে বেড়ালুম। গোপালনগরের হেড্মাস্টারের সঙ্গে দেখা সেখানে। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে দেখি প্রেমেন রয়েচে। ছাদে বসে গালুডির জমি সংক্রান্ত গল্প হোল।

তারপর পশুপতিবাবুর গাড়িতে Mr. Rishi-র কাছে গেলুম। ফল ভাল হোল না। তাঁরই গাড়িতে ফিরে এলুম।

১৪ই মার্চ, ১৯৩৪। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভা আঙুর ও সন্দেশ এবং এক গ্লাস জল নিয়ে এল। ওখান থেকে গেলুম সতুকাকার খেলাঘরে। কি অপরিষ্কার জায়গাতেই থাকেন সতুকাকা। কিন্তু গ্রামের লোক, বড় ভাল লাগলো। এবার জামা বদলে এসেচে। ইউনিভার্সিটিতে মিটিং ছিল—সেখানে জসীম, মনোজ, ধীরেন, প্রভাত এদের সঙ্গে দেখা। বার হয়ে আইসক্রীম খেয়ে ট্রামে উঠচি...? সঙ্গে দেখা। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে নেমে কিছু খেয়ে বন্ধুর বাসায়। চা খেয়ে বন্ধুর ডাক্তারখানায়। একটা ছেলের মাথা ফেটে গিয়েচে,তাই দেখে ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি। ঘণ্টু আছে—তারা কাগজখানা নিয়ে নম্বর দেখাদেখি করলে। তারপর মন্মথ মঙ্গলবারের নিমন্ত্রণ করলে। ধীরেন এবার পরীক্ষা দিচ্চে। ব্রজদুলাল স্ট্রীট্ দিয়ে এসে বাস ধরলুম—রিপন কলেজের সহপাঠী সেই ছেলেটা—যার পাশে বসতুম কলেজে—অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা। তার পাশে আবার বসলুম—১৯১৪ সালের পরে।

১৫ই মার্চ, ১৯৩৪। ১লা চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি এলুম Examiner's meeting-এ। শোভা সেন এবার examiner হয়েচে। স্কুলে একটি ছেলে দেবব্রতের কথা বলছিল—সে বলেচে আমার যেতে লজ্জা করে। ইউনিভার্সিটি থেকে বার হয়ে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ করে জসিমের সঙ্গে কথা। জসিম বল্লে, এসো বিড়ি খাওয়া যাক। তারপর আমি বার হয়ে কিছু খাবার খেয়ে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াচ্চি—আশুর সঙ্গে দেখা। আশু দেখা হলেই সিগারেট কিনে খাওয়ায়। কিছুক্ষণ কলেজ স্কোয়ারে দেবদারু গাছের তলায় আমাদের সেই বেঞ্চিখানায় বসে গল্প করলুম। আর একজন fellow examiner খড়্গপুর থেকে আস্‌চে। সে এসে গল্প করলে। তারপর মেসে ফিরলুম।

১৬ই মার্চ, ১৩৯৪। ২রা চৈত্র, ১৩৪০।শুক্রবার

স্কুলে রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছেলে দুটি এল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে যাই। ওদের টিকিটে চলে গেলুম একবার কার্জনপার্কে। Wide World কিনলুম পুরোনো। কার্জনপার্কের কাছে শোভা সেন উঠ্‌চে গাড়িতে। তারপর আর বঙ্গশ্রীতে এসে ওদের সঙ্গে? মহলে গেলুম—আমি শৈলজা,.. প্রেমেন, নৃপেন, সজনী। সেখানে সুধীর, চৌধুরীর সঙ্গে দেখা—সে বল্লে বেশ উপন্যাস হচ্চে—সবাই ভাল বলেচে নৃপেনও বল্লে। বসে বসে ভাবছিলুম দেখতে দেখতে এই আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসে বায়োস্কোপ দেখ্‌চি বন্ধুদের সঙ্গে—আমিই কিছুকাল আগে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় ঘন বনের মধ্যে বসে পাহাড়ি চীহড় ফল কুড়িয়ে খেয়েছিলুম। জীবনের এই প্রসারতা ও বিস্তৃতিই আমি চাই। সেদিন ইউনিভার্সিটিতে মিটিং-এর সময় আমার একজন fellow-examiner যে কথাটা বলেছেন—সে কথাটা মনে পড়ল। জীবনটা বেশ লাগ্‌চে। এই বসন্তে রামনবমীআস্‌বে—আবার সামনের সপ্তাহের পরের সপ্তাহে রাখা মাইনের পাহাড় দেখবো—তাও বেশ ভাব্‌তে হবে। ওখান থেকে বার হয়ে ট্রামে বাসায় এলুম। আজ বেশ শীত।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৪।৩রা চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার।

স্কুলের পরে ইউনিভার্সিটিতে কাগজ আন্‌তে গেলুম—পাওয়া গেল না। আবার একবার গেলাম ৬টার সময়—আমি আর প্রভাত সান্ন্যাল। ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর শোনা গেল আমার কাগজ আসেনি।

১৮ই মার্চ, ১৯৩৪। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৪০।রবিবার

কোথাও বেরুইনি। Louis Golding-এর magnolia street পড়ছিলুম। বিকেলে বেরিয়ে লালদিঘিতে হেঁটে গেলাম। ফিয়ার লেনের মধ্যে দিয়ে গেলুম। লালদিঘিতে খানিকটা বসে হেঁটেই ফিরে এলুম।

১৯শে মার্চ, ১৯৩৪। ৫ই চৈত্র, ১৩৪০। সোমবার

কয়দিন এখানে বেশ শীত। সকালে উঠে আজ গায়ে কাপড় দিয়ে বসতে হোল—এমন শীত। অর্থাৎ গায়ে কাপড় দিলে তবে আরাম হোল। দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হলো পথে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে। সেখানে চা খেয়ে ইউনিভার্সিটিতে। মুরলীর সঙ্গে দেখা হোল। ফিরে এসে আর কোথাও যাইনি।

২০শে মার্চ, ১৯৩৪। ৬ই চৈত্র, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে সিটি কলেজের ছেলেরা এল ওদের কলেজে সাহিত্য সভায় যাবার জন্যে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে কেউ নেই। তারপর এসে কাগজ দেখে বিভূতিদের বাড়িতে গেলুম। ক্ষেত্রবাবু ও আমি একসঙ্গে বসে অনেকদিন পরে নিমন্ত্রণ খেলুম মন্মথদের ছাদে বসে।

অনেক রাত্রে বাড়ি।

২১শে মার্চ, ১৯৩৪। ৭ই চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে যেতে কোলার সঙ্গে দেখা। সেও তার...? যাচ্ছে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে Frankenstein দেখতে গেলুম। এই এসে ২ খানা কাগজ দেখে পায়ে সেঁক দিয়ে বসে আছি।

মহুলিয়া থেকে নীরদবাবুর পত্র পেলাম এই মাত্র।

২২শে মার্চ, ১৯৩৪। ৮ই চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুলে আজ লোক এল। মুচকুন্দ ফুল একটা আজ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—কোলার মুখে লাগিয়ে দিতে সুড়সুড়ি লাগল—সে বেশ আনন্দের ব্যাপার। ছুটি হলেই বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ।

খয়রামারির মাঠে বিকেলে বাসা পৌঁছেই বেড়াতে গেলুম—সেই রাজনগরের বটতলায়। ওখান থেকে ফিরে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গেলুম।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৪। ৯ই চৈত্র, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে উঠে খাতা দেখ্লুম। তারপর বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গেলুম। দুপুরে খুবখাতা দেখবার পরে খয়রামারি থেকে বেড়িয়ে এসে দেবেনের ডাক্তারখানায় গেলুম। সেখান থেকে বীরেশ্বরবাবুর বাসায়।

২৪শে মার্চ, ১৩৯৪। ১০ই চৈত্র, ১৩৪০।শনিবার

সকালে খাতা দেখে বারাকপুর। আজ রামনবমী। অনেককাল পরে এলাম। খুকুকে ডাকলুম। সে এসে অনেক গল্প করলে। তারপর আমাদের বাড়ির দিকে গেলুম। কি কোকিলের ডাক সর্বত্র! ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শুকনো বাঁশ পাতার খস্ খস্ শব্দ—মিষ্টি রোদ। বৃন্দাবনদের বাড়ি গেলুম—পথে রাস্তা পার হবার সময় একবার দাঁড়ালুম—জ্যাঠামশায় রাখাল রায় কেউ নেই আজ। বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেলুম। রামপদ সেখানে কর্মকর্তা। সেই পাঁচড়া হয়েছিল যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তারপরে এই আজ ওদের বাড়ির মধ্যের দালানে খেতে গেলুম। বৃন্দাবনের ছেলে খুব তোয়াজ করলে। নাটমন্দির ভেঙে গিয়েছে। তারপরে ওখান থেকে আস্চি—পথে শুকনো বাঁশপাতা, ঘেঁটুফুল—হরিপদ দাদা দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খাওয়ালে। পরেশ খুড়ো বিকেলে বাড়ি এল। কালো এল। আমি খুড়িমা ও খুকুর সঙ্গে দেখা করেই আমাদের বাড়ির? দিয়ে কুলুঙ্গিটা দেখে শুকনো বাঁস পাতা মাড়িয়ে নৌকাতে এসে উঠলুম। নৌকো ছাড়ল। দুধারে অদ্ভুত জঙ্গল—ঘেঁটু বনের গন্ধ—বাংলোর বনশোভা সিংভূমের চেয়ে ভাল। ঘাটবাঁওড়ে নেমে হেঁটে বনগাঁ আস্চি মকবুল দারোগার সঙ্গে দেখা। বল্লে—আমার ঘোড়ায় গেলে না কেন?

২৫শে মার্চ, ১৯৩৪। ১১ই চৈত্র, ১৩৪০।রবিবার

কাগজ দেখলুম। তারপর বৈকালে রওনা। এখানে সুনীল, তার মা, হরি মোক্তারের ভাই—একসঙ্গে এলাম।

২৬শে মার্চ, ১৯৩৪। ১২ই চৈত্র, ১৩৪০।সোমবার

সকালে উঠে সুনীতিবাবুর বাড়ি এক কিস্তি কাগজ দিতে গেলুম। বেজায় কষ্ট। একটা বাসে বন্দেল নিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিলে। সেখান থেকে হেঁটে পৌঁছতে বড় দেরি হয়ে গেল। সুনীতিবাবু নতুন বাড়িতে পুরানো গ্রীক, পুরানো, ফিনিসীয়, ইউরিপিডিস্, খ্রিস্ট প্রভৃতি বড় লোকের উক্তি ইটালিয়ান্ মার্বেলে লিখিয়েছেন—পড়ে শোনালেন। হরিদাস চাটুজ্যেও সেখানে—তারপর মনোজ বসু এল। দুজনে বেরিয়ে এস্প্ল্যানেড—সেখানে থেকে আমি বলুর বাসায়। কিছু খেয়ে সেখান থেকে বিচিত্রা আপিসে উপেনবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে আড্ডা। ওখান থেকে বার হয়ে দ্বারিকের দোকানে কিছু খেয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমুনো গেল। তারপর উঠে কাগজ দেখে বৈকালে একটু বেড়িয়ে এলুম। আবার কাগজ।

২৭শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৩ই চৈত্র, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে উঠে কাগজ দেখে দুপুরে খানিকটা ঘুমুনো গেল। তার আগে প্রবাসী আপিস থেকে ঘুরে এলুম। ঘুমিয়ে কাগজ দেখে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে বটবৃক্ষ ঘোষ এল। তার সঙ্গে তার বাবা অরবিন্দবাবুর কাঁচড়াপাড়ার গল্প করলুম। সন্ধ্যায় মানিকবাবু এল লেখা নিতে।

২৮শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৪ই চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

রোজ ভাবি গালুডি যাবার দিন কবে আসবে। আজ ভোরে ঘুম ভেঙে ভাবলুম কাল গালুডি যাব।

তারপর স্নানাহার করে স্কুল।...? ওখান থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গিয়ে বই ফেরত দিয়ে মুসলমান ছেলেটির দোকানে গিয়ে দুখানা Wide World কিন্‌লুম। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে College Square-এ এলুম ট্রামে। বই নিয়ে আবার যাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখানে মাস্টার নিশিভূষণের ছেলের সঙ্গে দেখা। কিরণ মাসিমার ছেলে বিয়ে করে কি একটা বিপদে পড়েচে বল্লে। তারপরে হেঁটে বাড়ি এলুম। খুব জ্যোৎস্না। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্‌ল। মনে হোল রাত পোয়ালেই ভাব্‌বো আজ গালুডি যাব। খুব আনন্দ। শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় ক্ষুদ্র গ্রামসমূহে এরকম কত মানুষ মনে কত কি আনন্দ ও আশা পুষে আছে মনে হোল—ঘেঁটু ফুলের নির্জন ঝাড়ের কথা মনে হোল শেষ রাতের জ্যোৎস্নায়।

২৯শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৫ই চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ ভোর হোল আনন্দে। গালুডিতে আজই যাব। শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় নদীতীরের কত ঘেঁটুবনের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত কথা মনে হোল। তারপর উঠে খাতা দেখতে বসে গেলুম। স্কুলে? পড়া নিয়ে বেশ কাট্‌ল। মধ্যে সজনীর টিকিট নিয়ে নিজে এস্‌প্ল্যানেডে টিকিট কর্তে গেলুম। ফিরে আবার দুটো ক্লাস করলুম। স্কুলে ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী আপিসে টাকা আন্‌তে। সেখান থেকে বেরিয়ে মাণিকতলায় সেই দোকানটিতে কিছু খেয়ে বাসায় এসে আবার দুখানা কাগজ দেখে হাতমুখ ধুয়ে নিলুম। কিছু খেয়ে আটটার সময় বেরুনো গেল। স্টেশনে এসে প্রমোদবাবুনেই। ভোরে এসে গালুডি পৌঁছানো গেল।

৩০শে মার্চ, ১৩৯৪। ১৬ই চৈত্র, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে চা খেলুম। তারপর আমি ও বীরেশ্বরবাবু বলরাম সায়রে নেয়ে আসি। বেলা ৩॥০ টার গাড়িতে সবাই মিলে এলুম রাখা মাইন্‌স্। সাধু বাবাজী যেখানে থাকেন সেই valley-টাতে বেড়াতে গেলুম। জ্যোৎস্না রাতে সত্যই অপূর্ব দেখতে হয়েচে। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলুম জ্যোৎস্নায় বসে।

৩১শে মার্চ, ১৯৩৪। ১৭ই চৈত্র, ১৩৪০।শনিবার

সকালে উঠে সবাই মিলে গরুর গাড়িতে গেলুম নেত্‌ড়া, রানিঝর্ণা। খেড়জাতির বাড়িতে আবার গেলুম। রানি ঝর্ণার খাদানের নিচে শালবনে চা করে খাওয়া গেল। ক'দিন ঘুম হয়নি। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি রাখা মাইনের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে বসেই চা খেলুম। পট্টনায়েক ও কমপাউন্ডার এল।

১লা এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৮ই চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে কাপড়গাদি ঘাট বেড়াতে গেলুম। রাখা মাইন ছাড়িয়ে জঙ্গল বেশ ঘন দুধারে। কাপড়গাদির মাঠ দেখ্‌তে ভারি চমৎকার। দুধারে খুব উঁচু পাহাড়—ছোটএকটা ঝরনা একদিকে। বড় বড় পাথর ফেলা। এক ধরনের গাছ দেখতে ভারি লতানে। হেঁটে ফিরে এলুম। বৈকালে আমরা পড়লুম বেরিয়ে পায়ে হেঁটে। গালুডির পথের দুধারের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। ওপার থেকে অস্ত সূর্যের আভা মাখানো গালুডির শোভা কি অপূর্বই লাগ্‌লো! সুবর্ণরেখার জলে হাত মুখ ধুয়ে স্নিগ্ধ হওয়া গেল। মহাদেব ডুংরি ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আবার কাছাকাছি এসেচে। এবার এখানে কোকিলের ডাক শুন্‌লুম। রাত্রে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠল। আমি স্টেশনে আট্‌কে গেলুম—স্টেশন মাস্টারের জামাই এসেচে [—] সেখানে ওরা চা খাওয়ালে। ইউরিপিডিসের কবিতা মুখস্থ বল্‌তে হোল। রাত্রে একা অনেকক্ষণ বসে বাইরে।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৪।১৯শে চৈত্র, ১৩৪০।সোমবার

অনেকদিন পরে আবার সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডের ওপর বসে লিখ্‌চি। দূরে রাখা মাইনের চিম্‌নী দেখা যাচ্চে। দূরে কোকিলও ডাক্‌চে। সকালে উঠে নেক্‌ড়েডুংরি পাহাড়ের ওপারে বেড়াতে যাচ্চি—পাহাড়টা থেকে ডাক্তার নামলে—তার সঙ্গে কথাবার্তা হোল। বিষ্ণু প্রধান এল—তার সঙ্গে জমির কথা বললুম—তারপর চা খেয়ে এসে এখানে বসে লিখচি। একটু বেলা হোল [—] বলরাম সায়েরে কি আরামেরই স্নান করে এলুম। স্নান করে যখন ফিরচি—কলসী বাংলোর সামনের কচিপাতা ওঠা শালবন ও সাঁওতাল পাড়ার

বাঁশঝাড়—মাথার ওপর অপূর্ব রং-এর নীল আকাশ, দূরের পাহাড়গুলো অস্পষ্ট—ধূসর রেখা—সবসুদ্ধ মিলে বর্ণাঢ্য শ্রী [—] এরকম অতি সুন্দর দৃশ্য অনেকদিন দেখিনি। ট্রেনে খুব ভিড় ছিল না—খড়্গপুর থেকে ভিড় হোল। মেদিনীপুরের কাছে এসে খুব শ্যামল মাঠ গাছপালাতে চোখ জুড়িয়ে দিলে।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৪। ২০শে চৈত্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে খাতা দেখে স্কুলে গেলাম। কাগজে পড়লুম বিখ্যাত শিকারী K. N. চৌধুরী কালাহান্ডি forest-এ শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে মারা গিয়েচেন কাল। কোলা এল—ওখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে নীরদ বাবুর কাছে গিয়ে গল্প করা গেল। ট্রামে ফিরে এলুম।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৪। ২১শে চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

খাতা দেখে স্কুলে গেলাম। বঙ্গশ্রীতে খুব আড্ডা হোল—বেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটে দুখানা বই কিনে আস্‌চি—একটি ছোট গরিব মেয়েকে আর একটা ছেলে ঠ্যাঙাচ্চে—দেখে ভারি দুঃখ হোল। আড্ডি খোলা (?) আনন্দ দেয়, সত্যিকার আনন্দ। আজ কিন্তু ছোট্ট মেয়েটাকে ওরকম মারতে দেখে খুব দুঃখ পেলাম।

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২২শে চৈত্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে মৌলবী ও আমি সাঁকারিটোলা দিয়ে ফিরলুম। Kola আগে আগে যাচ্চিল [—] বাড়ি জিগ্যেস্ করি। ৫ খানা কাগজ দেখে ট্রামে চারু বিশ্বাসের বাড়ি গেলুম মিটিং-এ। সেখানে এল চাঁদি বাবু। ক'জনে চা সিগারেট খেয়ে গল্প করলুম।তারপর আমি বার হয়ে মনোজ বাবুর বাসায় গেলুম। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে রাত ৯॥০ টার পরে বাসায় ফিরি। ৭ই মে এবার কাগজ দেবার শেষ দিন পড়েচে।

কার্জন পার্কে একটু বেড়ালুম। একটা ছোট্ট সাহেবদের মেয়ে বেজায় দুষ্টুমি করচে তার আয়ার সঙ্গে। হাত দিয়ে রেলিং মুঠো করে ধরচে। শুয়ে পড়চে অথচ কাঁদচে না। ভারি সুন্দর দেখতে।

সাত ভাই চম্পার কথা...নাটকাকারে পেয়ে—plot-টা মনে এসেচে।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৩শে চৈত্র, ১৩৪০।শুক্রবার

কাগজ দেখে স্কুলে গেলুম।

সেখান থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে বাসায় ফিরি। আবার কাগজ দেখি। কলকাতায় ক'দিন ধরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। বৃষ্টির নামও নেই—তবে আকাশে কোনো কোনো দিন মেঘ দেখা যায়। এবার বৃষ্টি মোটেই হয়নি। বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের দিকে বৃষ্টি হবে।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪।২৪শে চৈত্র, ১৩৪০। শনিবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে পিয়নের কাছে গল্প করলুম। সুকুমারবাবু ও ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষও এলেন। আমি ট্রামে বর্ধমান রাজার বাড়ির কমপাউন্ডে মুচকুন্দ ফুলের গাছটা দেখতে গেলুম। তারপর গ্রে স্ট্রীটের ট্রামে শ্যামবাজারের বন্ধুর বাসায় গেলাম। ফিরলুম বঙ্গশ্রীতে। অনাথবাবু প্যারিসের গল্প করলে— [?] ইত্যাদির। সেখান থেকে হেঁটে গোলদিঘি হয়ে বাসায় কাগজ দেখ্‌তে বসলুম।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৫শে চৈত্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়িতে Garden & Gardening-এর অদ্ভুত ছবি দেখলুম। তারপরে দুপুরে S.O.S. Icesberg দেখতে গেলুম Empire-এ। বিরাট ছবি উত্তর মেরুর।

কার্জন পার্কে অনেকক্ষণ বসে পড়লুম Wide World, ফিরচি বৌবাজার হয়ে [—] পথে তিনটি নক্ষত্র উঠেচে—মনে হোল এর মধ্যে এমনি যেন উড়ে যাব—সকলকে ভালবাস্‌বার ইচ্ছে হোল। একটি ছোট খুকি আমার কাছে পয়সা চাইলে ধর্মতলা স্ট্রীটে—তাকে দিই নি বলে মনে কষ্ট হোল। মনে একটা অপূর্ব ভাব।

কোলা বলেচে তাকে মিউজিয়ামে নিয়ে যেতে। পথে অপূর্ব আর কে কে ফিরচে [—] ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে দেখা।

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৬শে চৈত্র, ১৩৪০।সোমবার

সকালে আলিপুর দিয়ে ট্রামে সুনীতিবাবুর বাড়ি কাগজ দিতে গেলুম। পথে পথে সুন্দর ছায়াতরু, নতুন পাতা গজিয়েচে, গড়ের মাঠের প্রাতঃকালীন শোভা মনকে স্পর্শ করে—আর আমার কেবলই কাকার বাগানের সৌন্দর্যের কথা মনে হচ্চে—capri islet এর কথা মনে হচ্ছে। খিদিরপুর হাউস্। বিজয় মঞ্জিলের মুচকুন্দ চাঁপার গাছটা দেখে আলিপুর হয়ে বালিগঞ্জে এলুম। সুনীতিবাবুর বাড়িতে প্রভাতবাবুর ও দক্ষিণাবাবুর ছেলেও এসেচে— বল্লে জ্যোৎস্নার খুব অসুখ। আমি ৮নং ট্রামে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মূর্খতাস্বরূপ—বাড়িটার সাম্নে দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে একটা হোটেলে ভাল খেলুম। Steward Island বলে একটা বই কিন্লুম। ছুটির পর বঙ্গশ্রী। College Sqr.-এ সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে P.C.Sircar-এর দোকানে নিয়ে গেলাম।

১০ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৭শে চৈত্র, ১৩৪০।মঙ্গলবার

স্কুলে কোলা ফাউন্টেন পেন নিয়ে বড় গোলমাল করতে লাগ্লে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে? কাছে। ট্রামে বাসায় এলাম [—] মহিমবাবু এল, গল্পগুজব করা হোল। খাতা দেখলুম। Story of San Michel পড়চি—অতি চমৎকার বই।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২৮শে চৈত্র, ১৩৪০। বুধবার

চুল ছেঁটে স্কুলে যেতে দেরি হোল। অশোক খুব মার খেলে ক্লাসে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে নিভার কাছে গেলুম। South Africa animal কিনে এনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অমিয় ও ঘিন্টুর সঙ্গে দেখা। পথে নগেনদার বাসায় গেলুম। সুসার কাকার সঙ্গে সেখানে দেখা। তার মুখে শুন্লুম কালো এবারও বি.এ. পরীক্ষা দেয়নি। বাসায় চলে এলুম। রাত্রে খুব ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হোল। বেশ ঠাণ্ডা পড়ল। এক একটা spark দিতে লাগল বিদ্যুতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড।

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৪।২৯শে চৈত্র, ১৩৪০।বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে অল্পক্ষণের জন্য গেলুম। নীলের জন্যে সকালে ছুটি হোল। সেই নীলের সন্ধ্যা—পিসিমা নৈবিদ্যি নিয়ে যাচ্ছেন—সেকথা মনে পড়ে। ইউনিভার্সিটিতে বি. এ. পরীক্ষা হচ্চে—সেখানে গিয়ে খানিকটা দাঁড়ালুম। আমি যেখানটাতে বসে খাবার খেতুম মাধববাবুর বাজার থেকে কিনে—সেখানটার কাছে। Sir P. C. Roy-র সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হোল। তাঁর সঙ্গে সায়েন্স কলেজে গেলুম তাঁর গাড়িতে। তারপর পুরোনো প্রবাসী আপিসের চায়ের দোকানে চা খেয়ে বাসায় ফিরি।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৩০শে চৈত্র, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে উঠে বনগ্রামে রওনা হলুম। মতিকাকার সঙ্গে দেখা স্টেশনে। তিনি যাবেন শ্যামনগরে তাঁর মেয়ের বাড়ি। বল্লুম নাগপুরে আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তিনি বল্লেন যে বন্ধুটি ঘটনাটা বলেছেন [—] তবে নামটা বল্তে পারেনি। এতদিন পরে সে কথাটা মতি কাকাকে বলা হোল। এবার অদ্ভুত লাগ্লো বাংলা!Bengal is superb. এই সকালে সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাতা গজিয়েচে—শিমুল, ছাতিমগাছের নৃত্যভঙ্গি কি অদ্ভুত—শাখা প্রশাখার কি বিস্তার—কোকিল ডাক্চে সর্বত্র—C'est Grande!বিশেষ করে এই চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই ঘাস, এই সবুজ চক্চকে পাতার রাশি, এই ঘন ছায়া, এই গায়ক পাখির ডাক, এই বেলফুলের গন্ধ—কোথাও নেই। যদি এর সঙ্গে জমি পাহাড়ে হোত—দিকচক্রবালে শৈলমালায় নীল দীর্ঘ রেখা থাকতো—মাঝে মাঝে পাথর থাক্তো—বাংলার তুলনা ছিল না—জমিটা যদি উচ্চাবচও হোত—তা হলেও ভাল লাগ্তো। একঘেয়ে সমতল ভূমি সর্বত্র—ঐ একটামস্ত defect বাংলার। দেখে তো এলুম গালুডি, সিংভূম—

গ্রীষ্মে সব মরুভূমি, ঘাসপোড়া, গাছে পাতা নেই, ছায়া নেই—খাঁ খাঁ করচে চারিদিকে, সবুজ নেই কোথাও। তুলনায় বাংলা এখন নন্দন কানন। নেই কেবল ফুল। Showy flower নেই।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪।১লা বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

এদিন রাত্রে খুব ঝড়-বৃষ্টি। শেষ রাতের দিকে খুব ঠাণ্ডা পড়ল। খয়রামারির মাঠে বৈকেলে বেড়াতে গেলুম—অদ্ভুত গাছের সমাবেশ—এমন গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও নেই—এর সঙ্গে যদি পাহাড় পর্বত থাক্‌তো। বীরেশ্বরবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যায় গল্প করছিলুম—তার পরে হালখাতা করতে বেরুনো হোল। মিতের আড়তে বসে তামাক খেতে খেতে অনেক গল্পগুজব করা হোল। বৈকেলে স্বদেশবাবু firm [farm]-এ বেড়াতে গিয়ে ওঁদের ষাঁড়াগাছের ঝাঁপের তলায় বস্‌লুম। দীর্ঘ বাঁশবনের ডগাগুলোর এক অপূর্ব শোভা!

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ২রা বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খুব ঠাণ্ডা। কাগজ দেখলুম। উঠে বিভূতির আড়তে বসে গল্প করলুম। তারপর বীরেশ্বর বাবুর বাসায় ও যতীন ডাক্তারের বাড়ি বসে গেলাম। সে খাবার খাওয়ালে। স্নান করে গিয়ে বড় আরাম হোল। ইছামতীর কালো জলে অবগাহন স্নান কর্তে কর্তে ভাবলুম ও সপ্তাহে এদিন বলরাম সায়েরে স্নান করেচি। খেয়ে উঠে গজেন এল—তারপর ভোলানাথ বাবু এলেন। বৈকালে বেরুলুম স্টেশনে—কল্‌কাতায় গেলুম। "The soul requires more space than the body"... স্টেশনে এলুম। আজ আর ট্রেনটাতে কষ্ট লাগ্‌ল না। 'Story of San Michele' পড়তে পড়তে এলুম। এসে কাগজ তৈরি করলুম। কাল সকালে সুনীতিবাবুর বাড়ি যাব।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৩রা বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে খাতা নিয়ে সুনীতি বাবুর ওখানে। সেখানে এলেন বারীনদা সস্ত্রীক। আমি দক্ষিণাবাবুর বাড়ি গিয়ে শুনলুম জ্যোৎস্না পাগল হয়ে গেছে।

পরেশদের দোকানে একটু খেয়ে স্কুলে এলুম। তারপর স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। হেঁটে গোলদিঘি দিয়ে বাসা।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে কাগজ দেখি। তারপর নীরদের বাসায় গেলাম। নীরদ নেই। নীরদের স্ত্রীর সঙ্গে খানিকটা গল্প করা গেল। চা খাওয়ালে—একটা গাছ দেখিয়ে বল্লে acacia। ওখান থেকে বন্ধুর বাসায় এলাম। বন্ধুর স্ত্রী আছে—আর কেউ নেই। তারপর ট্রামে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। তারপর পরিমলের সঙ্গে হেমন্তের বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে বাসায় ফিরি।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৪। ৫ই বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

কাগজ দেখে স্কুল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী নেই। ৫টার সময় চলে এলুম ও আবার ৫ খানা কাগজ দেখি। তারপর ফিরে এলুম বাসায়। একটু কলেজ স্কোয়ারে বেড়িয়ে। নীরদবাবুরা তখনও গালুডি থেকে ফেরে নি।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৬ই বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বাসায় এসে কাগজ দেখি ও প্রবাসীর জন্য 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র কপি তৈরি করি। আর কোথায় বেরুইনি।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৭ই বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

কাগজ দেখে স্কুলে গেলুম। সকালে ছুটি হোল। বঙ্গশ্রী আপিসে ছোটমামা এল। ডাঃ বাগচি এলেন। আঙ্কর ভাটের কথা জিগ্যেস করলুম। ছোটমামার সঙ্গে ওয়াছেল মোল্লার দোকান হয়ে বৃষ্টি মাথায় ট্রামে বাসা।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৮ই বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

আজ প্রথম সকালে স্কুল হোল। কোলাদের পরীক্ষা ও পরের ঘরে গিয়ে ডিবেটিং ক্লাবে গেলুম। বাসায় আসবার পথে সনৎ ও পঙ্কজ আমার সঙ্গে বাসা পর্যন্ত এল। আমি একটু ঘুমিয়ে উঠে খাতা দেখে প্রবাসীতে গেলুম। সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে? কাছে গিয়ে উঠে কার্জন পার্কে গিয়ে 'Story of San Michle'-এ blue eyed [?]-এর কথা ও Messina-র ভূমিকম্পের কথা পড়লুম। হেঁটে বাড়ি চলে এলুমতারপর।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ৯ই বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণিদের বাড়ি। সেখান থেকে বাসন্তী দেবীর বাড়ি ও কালিদাস নাগের ওখানেও গেলুম। কালিদাস নাগের অসুখ হয়েচে—দেখতে গেলুম। তারপরে বাসায় এসে দেখি—অমিয় বসে আছে। তার সঙ্গে উপেনবাবুর বিচিত্রা আপিসে। সেখানে ডাব সন্দেশ খেয়ে ট্রামে শ্রীরামপুরে। খুকি ও প্রতিমার সঙ্গে দেখা হোল। চা খাওয়ালে। সভায় বক্তৃতা করা গেল। রাত্রে লীলাদির বাড়িতে খাওয়া হোল। সাড়ে দশটার ট্রেনে চলে এলুম।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৪।১০ই বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুল। ওখানে থেকে এসে দুপুরে মহিমাবাবু এল। তারপর বিকেলে কাগজ দেখে রামরাজাতলায় ননীর বাড়ি গেলুম। বেশ ছায়া পড়েচে। অনেকদিন পরে গাছপালা বেশ লাগল। প্রথমে যখন গেলুম যতু ছিল, ননী আপিসে কাজ কর্তে গিয়েচে। যতু চা খাওয়ালে। গল্প করচি—এমন সময় ননী এল। গালুডির গল্প, হিমালয়ের গল্প, নানা গল্প হোল। বাসে ফিরলুম, গাছপালা, জ্যোৎস্না—বেশ লাগ্‌ছিল।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে এবারকার মত ইউনিভার্সিটির কাগজ দেখা শেষ হোল। বঙ্গশ্রীর লেখাও শেষ হোল। স্নান করে এসে More heroes of Adventure বইখানা পড়ছিলুম। দুপুরে খেয়ে শুয়ে রইলুম। কেবলই ভাব্‌চি হাতের কাজ শেষ হোল এতদিনে।

বৈকালে বিভূতিদের বাড়ি। বিভূতিকে ঘণ্টুর চেয়ে খারাপ বলতে রাগ হোল। তারপর ওর মুখে দার্জিলিং-এর গল্প শুনলুম। চা ও খাবার নিয়ে এল। তারপর নিমতলা ঘাটে গেলুম কতকাল পরে। বন্ধুর শ্বশুরকে দাহ করার পরে আর কখনও যাইনি। সেহোল ১৯১৬ সালের কথা। ১৮ বছর পরে গেলুম। গঙ্গার ধার দিয়ে হেঁটে ভগবতী প্রসন্ন সেন কবিরাজের বাড়ি গিয়ে গিরিজা বাবুর খোঁজ করি। গিরিজাবাবু নেই। বৃষ্টি এল। কুমোরদের দোকানে একটু বসে ট্রামে কলুটোলা এসে নামলুম। ফৌজদারি বালাপাতায় (?) তামাক কিনে বাড়ি এলাম।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১২ই বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে বসে পড়লুম Heroes of Adventure, দুপুরে ঘুম থেকে উঠে গড়িয়াহাটা রোড্ দিয়ে হেঁটে চলে গেলুম রাজপুরে। মৃত্যুঞ্জয়দের বাড়ি গিয়ে জল খেলাম। ভম্বলের সঙ্গে দেখা হোল। আশু চক্রবর্তীর বাড়ি বসে ডাব খেলুম। বোসপুকুরে গিয়ে বস্‌লুম। তারপর ভম্বলদের বাড়ি [—] সেখান থেকে নিয়ে গেল রিপন লাইব্রেরিতে। মোটরে স্টেশনে ফিরলুম। তারপর কলিকাতায়।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪১।বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুল। তারপর দুপুরে ঘুমিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে আসাদুল্লার কাছ থেকে private reading room নিলুম। অমূল্য বিদ্যাভূষণের সঙ্গে আলাপ হোল। তিনি encyclopedia করবেন বাংলায় বল্লেন। বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে আসতেই সজনী বল্লে পশুপতিবাবু ফোন্ করেছিলেন, তিনি Eskimo-র টিকিট কিনেচেন আমার জন্যে। বাসে গেলুম। Eskimo দেখ্‌লুম। পশুপতিবাবু, বৌঠাক্‌রুণ, দাদামশায়, খুকি। সবসুদ্ধ মোটরে ফিরলুম। আমি নাম্‌লুমCollege square-এ।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল থেকে এসেই খেয়ে দেয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। মতিলালের সঙ্গে গল্প হোল। Abyssinia সম্বন্ধে ও Mayer Civilization সম্বন্ধে বই পড়চি।

দেখ্লুম নীরদবাবুরা এসেচেন। আমি বঙ্গশ্রীতে গিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ফিরে আস্চি—কোলা ও অন্যান্য ছেলেরা আমায় ডাক্লে। অদুও ছিল। ফুটবল খেল্চে। আমি রেফারিগিরি করলুম। তারপর নীরদবাবুর বাসায় গিয়ে প্রমোদবাবু ও আমরা রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা ও গালুডির গল্প।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে গেলুম একটু ঘুরে। সেখান থেকে এসেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। ওখান থেকে বেরিয়ে চশমা সারিয়ে সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সুপ্রভা সরবৎ ও সন্দেশ খাওয়ালে। আরও ২/৩টি মেয়ে এল। ওখান থেকে বার হয়ে শ্যামবাজারে বন্ধুদের বাসায় গিয়ে পুরোনো গল্প করলুম। ট্রামে বাসায় আসবার পথে রমেশ সেনের আড্ডা দেখে এলাম। ১৭নং বেচু চাটুজ্যের স্ট্রীটে রেবতীকে দেখতে গেলুম—তিনি নেই।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৪। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ি। ধূর্জটি এল। সুধীর, শচন সেন এরাও ছিল। বাড়ি ফিরে শুনি নুটুর কাছে প্রমোদবাবু এসেছিলেন। খেয়ে Teacher's Conference-এ গেলুম বৌবাজার স্কুলে। সেখান থেকে নীরদবাবুর flat-এ [—] প্রমোদবাবু এলেন[—] অনেক গল্প করলুম। Conder (?) -এর ডিম জোগাড় করা ইত্যাদি। অনেকরাত্রে বাড়ি।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৪।১৭ই বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে ফিরবার পথে ভীমের দাদা ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। অনেকদিন পরে গেলুম। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে উঠেই লাইব্রেরি। মতিলালের সঙ্গে ইন্কামট্যাক্স কোর্টের কাছে গল্পগুজব করচি—সুধীন ও জ্ঞানবাবু এল। আমার সঙ্গে প্রাইভেট রিডিং রুমের সিট নিয়ে একজনের সঙ্গে গোলমাল হোল। তারপর আমি একটু পড়ে বঙ্গশ্রীতে এলাম। সেখান থেকে পরিমল, কৃষ্ণধন ও আমি বেরিয়ে বাসায় আস্চি, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অপুর সঙ্গে দেখা। একটা বেঞ্চিতে বসে আমরা পরিমলের গল্প শুন্চি। আলুকাবলি খেলুম। চলে এলুম তারপরে। পথে পরিমল অন্যদিকে গেল। আমি ও কৃষ্ণধন সরবত খেলুম মির্জাপুরের মোড়ে। খুব ঝড় উঠেচে। ধুলোয় অন্ধকার।

১লা মে, ১৯৩৪। ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

১লা মে। সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল। তারপর স্কুলে গেলুম। এসে খেয়েই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গেলাম। সুরেন কুমারের সঙ্গে একটু কথাবার্তা হোল। বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে এলাম। নিখিলবাবুর গাড়িতে বার হয়ে আস্চি—প্রশান্ত মহলানবিশ গাড়ি নিয়ে ঢুকলো। তার সঙ্গে আলাপ হোল। নিখিলের গাড়িতে বিচিত্রা আফিসে এসে দেখা পেলুম না কারুর। শরৎবাবু তামাক খাওয়ালে। বন্ধুর ডিস্পেন্সারিতে বসতেই ভয়ানক বৃষ্টি এল। হরিপদ সরকার সেখানে বসে। হেঁটে রমেশ সেনের দোকানে। সরোজ বসে, গোপেনবাবু বসে। ওদের সঙ্গে আস্চি—নরেনের সঙ্গে দেখা। নরেন বাসায় এল। অনেক পুরোনো কথা হোল। চারুবাবুর কথা হোল।

২রা মে, ১৯৩৪। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে স্কুল। দুপুরে একটার সময় ঘুমিয়ে উঠে আমহার্স্ট স্ট্রীটে পোস্টাফিসে গেলাম সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতার জন্য। তারপর College St. ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে বিচিত্রা। উপেনবাবুর কাছ থেকে বহুকাল পরে Geographical Magazine নিয়ে এলুম। আবার বঙ্গশ্রী ও তারপর ইউনিভার্সিটির কাগজ নিয়ে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে বাসে সুনীতিবাবুর বাড়ি। পথে সিদ্ধেশ্বরবাবু বালিগঞ্জের বাড়িটা দেখলুম। সুনীতিবাবুর ওপরের বারান্দাতে

গল্পগুজব হোল। একটা মেয়ের ফটো দেখালেন। ধীরেন এল। হুগলী কলেজের একটা প্রফেসার বল্লে আপনার বই সম্বন্ধে লিখেচে। তারপর বালিগঞ্জে ট্রেনে চড়ে মেসে এলুম। রাত দশটা।

৩রা মে, ১৯৩৪। ২০শে বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুল। বৈকালে প্রথমে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে উঠে নীরদবাবুদের flat-এ রাত দশটা পর্যন্ত আড্ডা হোল।

এদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হোল।

৪ঠা মে, ১৯৩৪।২১শে বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল। ফিরবার পথে ভাব্‌লুম দার্জিলিং-এর ভাড়া জেনে আসি। দার্জিলিং যাব না ঠিক করলুম। এদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গিয়ে পড়াশুনো করলুম। তারপর নীরদবাবুর flat-এ রাত দশটা পর্যন্ত গল্প। খুব ঝড়বৃষ্টি এল।

৫ই মে, ১৯৩৪। ২২শে বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুল থেকে এসে ঘুমুনো গেল। বৈকালে একটা ছেলে এল। তার সঙ্গে বঙ্গশ্রী আফিস। আমি আর পরিমল বেরিয়ে পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরে কলেজ স্কোয়ারে দুজনে বসে Book Company দোকানে গেলুম। তারপর বাসায় এসে গল্প লিখ্‌লুম 'বুলবুলে'র জন্যে।

৬ই মে, ১৯৩৪। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে প্রথমে ললিতের ওখান থেকে এসে মণি বোসের বাড়ি গেলুম। সেখান থেকে ফিরে লিখ্‌লুম। বৈকালে সাহিত্য পরিষদে গিরীন্দ্রশেখরবাবুর মহাভারতের তারিখ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে গেলুম। তারপর যাই নীরদের বাড়িতে। নীরদের স্ত্রী এসে বস্‌লো। অনেকরাত পর্যন্ত ছিলুম। রাত দশটার সময় বাসে ফিরি।

৭ই মে, ১৯৩৪। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুল থেকে আস্‌বার সময় দেবব্রতের বাড়ির দোরে দেবব্রত ছিল। দুপুরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গেলুম পোস্টাপিস্ হয়ে। তারপর কার্জন পার্কে বসে একটি সিগারেট খেয়ে বঙ্গশ্রীতে এসে ডাঃ সুশীল দের সঙ্গে গল্পগুজব করা গেল। ক্ষিতিমোহন সেনের বক্তৃতা শুন্‌লুম। রাত্রে ট্রামে ফিরে এসে আবার লিখ্‌লুম। আজ দুপুরে কলেজ স্ট্রীটে ট্রামে ওঠবার সময় মতি কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মতিকাকা retire করেছেন এবং শ্যামনগরে আছেন।

সেই মতিকাকা প্রথম খড়্গপুর চাকুরি নিয়ে বলেছিলেন মাছের দাগা খেতে দেয়। সেইদিন আর আজকার দিন। ১৯০৬ আর ১৯৩৪।

৮ই মে, ১৯৩৪। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ললিতের বাড়ি গিয়ে বাইরের রোয়াকে বসে রইলুম। মেয়েরা ছেলেরা স্কুলে যাচ্চে। তারপর গিয়ে ডাক্‌লুম, শুনলুম বেরিয়েচে। আমি একটা নাপিত ডেকে নখ কেটে স্কুলে গেলুম। দেবব্রত মোড় দিয়ে গেল। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে একটু ঘুমিয়ে বিচিত্র জগৎ, প্রবাসীর সমালোচনা লিখ্‌লুম। ৪টার সময় ট্রামে নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে চা খাই ও গল্প করি। সুশীল বাবু এলেন। ওখান থেকে নিউ সিনেমাতে প্রেমাঙ্কুরবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম বনগাঁয়ের থানার ছেলেটার জন্যে। ট্রামে ডাঃ সুশীল দের বাড়ি। ঢাকার কথাবার্তা হোল। তারপর নীরদ চৌধুরীর flat-এ। নীরদের স্ত্রী খাবার নিয়ে এল। রাত দশটা পর্যন্ত ম্যাপ সম্বন্ধে গল্প হোল। বাসে ফিরে লিখ্‌লুম।

৯ই মে, ১৯৩৪। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে ললিতের বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে স্কুলে। কোলা গল্প শুন্‌তেচাইলে। স্কুলে ম্যাজিক হোল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে Life of Jesus পড়লুম Midlton [middleton] Murry-র। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে স্যানউইচ ও কেক্ খাওয়া গেল। নিখিলদার গাড়িতে College Square-এ পি. সি. সরকারের দোকান। বারীন্দ্র ঘোষ ও বৌদি পথ দিয়ে গেল। সেখান থেকে বাসা।

১০ই মে, ১৯৩৪। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুল থেকে এসে একটু ঘুমিয়ে প্রথমে আমহার্স্ট স্ট্রীট্ পোস্টাপিসে—তারপর সেখান থেকে G.P.O. ও তার নানা ডিপার্টমেন্টে। ওখান থেকে বার হয়ে কিশোর কাকার আপিসে—২ টাকা আদায় করলুম বসে বসে। তারপর ওখান থেকে বার হয়ে হেস্টিংস স্ট্রীটে P.C.Sircar-এর দোকানে। দোকানে এলেন রমাপ্রসাদ মুখুজ্যে কি বই কিনতে। তারপর এলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে Life of Jesus পড়তে। সন্ধ্যায় সেখান থেকে উঠে কার্জন পার্কে গেলুম এবং ট্রামে উঠে মণীন্দ্রবাবু বাড়ি পার্ক সার্কাসে। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে গল্প করলুম। খেলুম, কত পুরোনো দিনের ঘটনা আলোচনা হোল।

১১ই মে, ১৯৩৪। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে ছেলেরা খাওয়ালে। কাল খুব মাংস খাওয়া গিয়েচে। ওখান থেকে বার হয়ে কোলা ও আমি একসঙ্গে চলে এলুম। এসে দেখি Nash's (?) Magazine ফেলে গিয়েচে। আমি তেল ও দাড়ি কামানোর সাবান নিয়ে ফিরলুম। দুপুরে ভয়ানক গরম। একটু ঘুমিয়ে প্রবাসীর কপি লিখলুম।

বৈকালে বঙ্গশ্রী। দোকান থেকে Square-এ গিয়ে বস্‌লুম—শশধরের সঙ্গে দেখা। সে পড়িয়ে এসে বসলো। বল্লেন থার্ডক্লাসের ছেলেরা খুব খাইয়েচে। কাল ছুটি হবে।

আমি পুরোনো দোকান দেখ্‌তে দেখতে? তামাক কিনে বাসায় এলাম। একটা অ্যাটাসি কেস্ কিনে আনলুম। রাত্রে এসে feast হোল।

খুব খাওয়ালে। আজ খুব গরম [—] পথে হাওয়া খুব। বৃষ্টি হয়নি কতকাল। দুপুরে ঘুমোনো যায় না খাটে।

১২ই মে, ১৯৩৪। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুলে গেলুম। আজকাল বেশ লাগে কোলাকে? ওরা সব খাওয়ালে। তারপর কোলাকেও খাওয়ালুম বিভিন্ন ক্লাসে। আমায় দেখে বিশ্বনাথ আবার পালিয়ে গেল। কোলা থামের আড়ালে লুকালো। দুপুরে চুল কেটে একটু শুয়েচি—পশুপতিবাবু এলেন। আমি বার হয়ে পোস্টাপিস্ [—] সেখান থেকে ছাতা সারিয়ে প্রবাসী। বাসায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে ওয়েলিংটন sqr.-এ? ট্রামে সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সুপ্রভা বল্লে আপনাকে খাওয়াতে ভাল লাগে। তারপর সাহিত্য সেবক সমিতিতে উপেনবাবু, জলধরদা, সত্যেন্দ্রবাবু, গোপেনবাবুর ছেলে—এদের সঙ্গে দেখা করে আস্‌চি[—] পথে মতিবাবু ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির আসাদুল্লা ও কুমারের সম্বন্ধেবল্লে। আমি আইস্‌ক্রীম খেয়ে বাসায় এলাম। রাত্রে কত গান গাই। 'বেণু হে চল? চল' ইত্যাদি।

১৩ই মে, ১৯৩৪। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪১। রবিবার

এবার কলকাতা এত ভাল লেগেছিল যে ছেড়ে যেতে কষ্ট হোল। affaire de' coeur এখানে বেশি। ভোরের ৫-৪০ গাড়িতে রওনা হলাম। বেশ ঠাণ্ডায় বনগাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম। বাজার কর্তে গিয়ে মিতের আড়তে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা হল। বন্ধু আবার মদ খেয়ে হল্লা করেচে নাকি কালরাত্রে। উঠে নদীতে স্নান করে এলাম। তারপর হেডমাস্টার ও হেডপণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে শ্মশানের কালীঠাকুর দেখে এলাম ও স্বদেশবাবুদের বাংলায় গেলাম। আমি ও হেমবাবু স্কুলের পৈঠায় বসে গল্প করলুম অনেকরাত্রে। তারপর এসে যতীশ ডাক্তারের ওখানে বসে গল্প করলুম। খাওয়া দাওয়ার পর চেয়ার নিয়ে চেয়ার নিয়ে ফুটবলের মাঠে। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে। মাস্টার সাহেব এল—তার সঙ্গে গল্প করলুম।

১৪ই মে, ১৯৩৪। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪১।সোমবার

কল্‌কাতাকে এখনও মনে হচ্চে—একটা বেশ স্মৃতির মত—বিশেষ করে এখন। আজ রাত্রে বেজায় গরম—যেন সেদ্ধ করল গরমে। তারপর বন্ধুর মোটরে বারাকপুর গেলুম। খুড়িমা আম খাওয়ালে। খুকু এল। রামপদ হালুয়া খাওয়ালে। ফিরে এসে মোটরে বনগ্রাম ও নদীতে স্নান করে এলুম তৃপ্তির সঙ্গে। ঘুম থেকে উঠে বন্ধুর ওখানে গেলুম। হাট করে ফিরচি—বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা। তারপর খয়রামারি বেড়িয়ে এসে অনেক রাত পর্যন্ত বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গল্প করি।

রাত্রে ফিরবার পথে যতীন ডাক্তার বসে বসে গল্প করলে কি করে বাড়ি করছিল—সেই সব সম্বন্ধে।

১৫ই মে, ১৯৩৪। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে খয়রামারিতে বেড়িয়ে এলুম। তারপর—বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গিয়ে গল্প করি। ফিরবার সময় স্কুলে আবৃত্তি হচ্ছে দেখ্‌তে গেলাম। পক্ষধর মিশ্র ও রঘুনন্দনের ভূমিকায় অভিনয় করচে সন্তু ও আর একটি ছেলে। বিকেলে নৌকায় বারাকপুর এলাম। দুধারের দৃশ্য অপূর্ব। গাছপালার এত প্রাচুর্য ও শ্যামলতা কোথাও নেই—থাকতে পারেও না—এ tropical প্রাচুর্য সত্যিই কোথায় পাওয়া যাবে।

ঘাটে জেলি, ন'দি যাচ্চিল—ওদের দিয়ে জিনিসপত্র আনালুম। সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাইরে চেয়ার পেতে বসে গালুডি ভ্রমণের গল্প করলুম। রাত্রে ছাদে তাস খেলা হোল ও বেশ হাওয়ায় ঘুমুনো গেল।

১৬ই মে, ১৯৩৪। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এবার আম পেকেছে খুব শিগ্‌গির। হাজরী জেলে পাগলা জেলে তলায় তলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সোঁদালি ফুলের রূপ— সর্বত্রই অপূর্ব। এত বৃক্ষলতার প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য, এত শ্যামলতা এই নিদারুণগ্রীষ্মকালেও। এত ছায়া—কোনো দেশেই নেই। বকুলতলায় পাটি পেতে বসে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখ্‌লাম। মনোরমা আম নিয়ে এল আমার জন্যে—বল্লে, জ্যাঠামশায় আমার খাতায় নাম লিখে দেবেন? খুকু এসে গল্প করলে। নগেন খুড়ো বাড়ি এল [—] ওর অক্ষয় তৃতীয়ার কলসী-উৎসর্গ আয়োজন করতে লাগ্‌লো। তারপর আমি স্নান করে এলাম আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে, বিকেলে উঠোনে চেয়ার পেতে বসে Wide World-এ? letters of algiers পড়ছিলাম। নদীর ধারে সোঁদালি বনের ছায়ায় দুর্বা [দূর্বা] ঘাসের ওপর গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম। রাত্রে এসে ছাদে শুয়ে পড়ি। রাত্রে অনেকরাত পর্যন্ত আমবাগানে আলো হোল [—] সল্‌তেখাগীতলায় আম কুড়ুচ্চে।

১৭ই মে, ১৯৩৪। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

ভোরে উঠে স্নিগ্ধ হাওয়ায় কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এত গাছপাল কোথায় আছে! এ বৈচিত্র্য, জাম, খেজুর, কাঁঠাল, নারকেল, বাঁশ, আম—এত ছায়া [—] ডালপালার ভঙ্গি—এসব সত্যিই অপূর্ব। ও পাড়ার ঘাটটি বেশ বালি। এখনও ফণিকাকাদের গাছে আম পাকেনি। ওপাড়ার ঘাট থেকে স্নান করে এলুম—ঘাটের ধারে ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটেছে। ঘাটে বাঁধন দিয়েচে, বেনে জেলের গাছটাতে খেজুর এখনও পাকেনি! কি space-এর আনন্দ। বকুলতলায় বসে Galsworthy-র সম্বন্ধে পড়লুম। Galsworthy যে মারা গিয়েচেন—এই প্রথম টের পেলাম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে হাটে গেলাম। কি বিরাট বনস্পতি পথের দুধারে। এসব দেখ্‌বার যেন নতুন চোখ খুলচে আমার। কি দেশেই বাস করতুম অথচ চিন্‌তুম না—৪০ বছর পরে আজ চিনলাম। সামনের দোকানে তামাক খাওয়ালে। হরিপদদা আজই শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরচে—আলাপ হোল। খগেন মামার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম নগেন খুড়োর জমির কেসের নালিশ সম্বন্ধে। রাত্রের ট্রেনে ন'দি ও নগেন রানাঘাটে গেল। আমি ও খুড়িমা সেকালের গল্প করি ছাদে শুয়ে।

১৮ই মে, ১৯৩৪। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে কুঠির মাঠে ঘুরে এলাম। তারপর ছাদের ওপর লিখ্‌তে বসি। অনেকক্ষণ লেখার পরে স্নান করে এসে বকুলতলায় বস্‌লুম। বারাকপুরের জীবনে মজে গিয়েচি—কলকাতা যেন ভুলেই গিয়েচি। পাঠশালা করলুম—অনেক ছেলেপিলে এল। মনোরমাদের পড়ালুম। তারপর নারানদার সঙ্গে গল্প করে এসে লেখা গেল

এক পাতা। কুঠির মাঠে গেলাম তারপরে। খুব মেঘ করেচে। ঝড় উঠেচে। কুঠির মাঠের নদীর ধারে অপূর্ব শোভা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় বাতাসে দুল্‌চে। নরম দূর্বা ঘাসের ওপর কতক্ষণ বস্‌লাম। নদীর জলে ঢেউ উঠেচে। রাত্রে খেয়ে আমি জেলি আম কুড়ুতে গেলাম— সল্‌তেখাগীতলায়[—] মধু দুলদুলে [?]তলায়, চারা বাগানে, মাঠের চারায় কাঁকুড়ে [?]—সব তলায় লণ্ঠন ধরে আম কুড়ুলাম। রাত্রে ছাদে শুই [—] বড় শীত করতে লাগলো।

১৯শে মে, ১৯৩৪। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে হরিপদদাদার মুখে একটা খবর শুন্‌লুম[—] টরু নাকি মারা গিয়েচে—কোথায় মারা গিয়েচে বা কি ভাবে মারা গিয়েচে শুনিনি। কথাটা আমার বিশ্বাস হোল না। এর পরে শুন্‌লাম কথাটা নাকি সত্যি। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে হরিপদদাদার ওখানে বেড়াতে গেলাম—তারপর কুঠির মাঠে গেলাম। একটা নতুন রাস্তা বেরিয়েচে—তার ধারে মাঠের মধ্যে একটা শিমুলগাছ। ঝোড়ো মেঘ হয়েচে—কি শোভা চারিধারের! পুলের ওপর দাঁড়ালুম, যুগল এসে বল্লে স্কুলের বড় দুর্দশা, মাইনে দেয় না। অশ্বিনী এল। বল্লে বীণাপাণি অপেরা পার্টিতে চাকরি পেয়েচে। গঙ্গাচরণের দোকানের সামনে বসলাম। কবিরাজ মশায়ও এল। তারপর আমি মাঠের পথ বেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঝোড়ো মেঘ ও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সোঁদালি ফুল দোলানো ঝোপের তলা দিয়ে চলে এলাম। রাত্রে যাত্রা শুন্‌তে গেলাম গোপালনগরে। জিতেনের বাড়িতে বসে দাসু, নায়েব আমি তাস খেল্লুম। যাত্রা আরম্ভ হোল—বৃষ্টি হোতে ভেঙে গেল। ফিরে চলে এলুম।

২০শে মে, ১৯৩৪।৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে হরিপদদাদার বাড়িতে পটল চা করলে। চা খেয়ে বাড়ি এসে লিখ্‌লাম। তারপর অনেক বেলায় স্নান করে এসে Bird Sanctuary of Capri সম্বন্ধে পড়া গেল। দুপুরে ঘুমিয়ে হাটে গেলাম। সেখানে বড় বৃষ্টি এল। সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে একা বসে ভাব্‌লুম ২০ বছর পরে [আগে] একদিন এই বারাকপুর থেকে বেরিয়েছিলুম—তখন বাইরের জগতের কিছুই জান্‌তাম না। এই ২০ বৎসরে কত ধরনের Drama of life দেখ্‌লুম। খুড়িমাদের বাড়ির পেছনে হরি রায়েরভিটের দিকে মুখ করে মুখ ধোয়ার সময়ে পথের খাব্‌রাকুচিগুলো দেখে ওই কথাই মনে হোল। রাত্রে ১৷৷০ টা পর্যন্ত তাস খেলা হোল ছাদে। তারপর আমি ও পরেশ খুড়ো বরোজপোতায়ও সলতেখাগীর তলায় আম কুড়তে গেলাম।

২১শে মে, ১৯৩৪।৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

ভোরে উঠে দারিঘাটা পুলে দু ঘণ্টা বসে রইলুম। মেঘ স্নিগ্ধ প্রভাত—সিরসিরে হাওয়া—গাছপালার শোভা অপূর্ব। হাজারীর মোটর এল—তাতে বনগাঁ গেলাম। বিভূতির আড়তে তামাক খেয়ে গল্প করি। তারপর মোটরে বারাকপুরে এসেই আমাদের বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে নাইতে গেলুম। খুকু খুড়িমা সবাই ঘাটে। দুপুরে লিখলুম-ঘুমোনোও গেল। বৈকালে খুব ঝড় ও বৃষ্টি। তারপর কি চমৎকার সিঁদুরে মেঘ উঠ্‌ল [—] আমি ছাদে গিয়ে বস্‌লুম। সোঁদালি ফুলগাছ, বাঁশগাছ, খাপরা ওঠা ভিটে, ফিঙে পাখি—সব যেন মায়াময়। আমার আর উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। রাত্রে হাজারির বাড়ি যাত্রা দেখতে গেলুম। অতি ill-written বাজে বই। ডেপুটি, সার্কেল অফিসার এরাও এল। রাত এগারোটাতে এসে ছাদে শোয়া গেল। অনেকরাত্রে খুড়িমার ওখানে খেতে গেলাম এসে। হরি রায়ের ভিটের দিকে মুখ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম।

২২শে মে, ১৯৩৪। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

পটল চা করলে—খেয়ে রামপদর পাঠশালা দেখ্‌তে গেলাম গোঁসাই বাড়ি।রঘুদাসীদের বাড়ি খালি পড়ে আছে। হরিপদ বল্‌চে—হায় হায়, রঘুদাসী উঠে গেল গাঁ থেকে? তবে আর গাঁয়ে রইল কে? দুপুরে রোদের তাতে ঘুম হয় না। বিকেলে আবার গোঁসাই বাড়ি গিয়ে হাতের লেখার পরীক্ষা নিলাম। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি এল—থামলে এসে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। কী নীলকৃষ্ণ মেঘ, কি বিদ্যুৎ, মাধবপুরের চরের শ্যামলতা—আমার উপাসনা ঐ ঝোড়ো মেঘে—দু হাত তুলে আনন্দে প্রায় নাচি আর কি। অমন কালবৈশাখীর রূপে মনের মধ্যে যে

ভাব জাগায় দেবতার আশীর্বাদের মত তা আসে। সাবান মেখে ঘাটে গিয়ে স্নান করে বড় আরাম হোল। ছাদে এলুম রাত্রে [—] অনেকরাত পর্যন্ত লিখলুম।

২৩শে মে, ১৯৩৪। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে হরিপদদাদের বাড়ি চা খেয়ে এসে লিখতে বস্‌লুম। আম কুড়ুতে গিয়েছিল বলে গোপালনগরের যতীনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল হাজরা ন্যাটার সম্বন্দি— বাগানে (?) পাড়ার। সেই লোকটা এসে হাজির। তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে। লিখে উঠে ও পাড়ার ঘাটে। অনেক বেলায় স্নান করে এসে বকুলতলায় বসে Living age-এ (?) Slavery in China পড়ছিলুম। বেলা একটার পরে খেয়ে একটু গড়ানো গেল বিছানায়। বিকট গুমট গরম—ঘুমোয় কার শক্তি? বিকেলের জগদের আমতলায় বসে কালো ও আমি গল্প করচি—একটা খুব ভাল ঘোড়া গেল। ও বল্লে মৎপুরের কালীপদ যাচ্চে। তারপর আমরা কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। পুরোনো কুঠির জ্বাল ঘরের পৈঠাতে বস্‌লুম। নোনা খেলুম গাছ থেকে পেড়ে। নোনার সন্ধানে ঝোপে ঝোপে ঘুরলাম। তারপর বেলেডাঙায় গিয়ে গঙ্গাচরণের দোকানে তামাক খেয়ে বৃদ্ধ কবিরাজটির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের দোতলা মাঠকোঠা ঘরের গল্প করছিলুম। সন্ধ্যার সময় মাঠের পথ দিয়ে এসে নদীতে স্নানের জন্যে যখন নামলুম তখন নদীজলে জ্যোৎস্না চিক্ চিক্ করচে।অপূর্ব দৃশ্য এই গাছপালা, নদী, বন মাঠের।

২৪শে মে, ১৯৩৪। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে হরিপদদাদের বাড়ি চা খেতে গিয়ে কাউকে পেলাম না। ছাদে এসে লিখতে বস্‌লুম। মাথার ওপরে কি পাখির ডাক। মেঘলা সকাল—খুব মেঘ নয়। বেশ ঠাণ্ডা। অনেক বেলা পর্যন্ত লিখে মাঠে বেড়িয়ে এসে স্নান করলুম আমাদের পাড়ার ঘাটে। এই ঘাটটি নির্জন [—] কেউ কোথায় নেই। গালুডি ও চক্রধরপুর অঞ্চলের মরুময় উষর [ঊষর] দেশের ও..? শালবনের পরে বাংলার এই উদ্ভিদ সংস্থান এমন সুন্দর লাগে। বৈকালে হাটে গিয়ে গৌর কলুর মুখে খিরকিচের ইতিহাস শুনলাম। বাড়ি কাল এসেচি, আজ সন্ধ্যা হয়েচে। জ্যোৎস্না উঠেচে। তখন মাঠে বেড়াতে গেলুম—বেড়িয়ে জ্যোৎস্নালোকিত ইছামতীর নির্জনঘাটে স্নান করতে নামলুম। আমাদের ঘাটেই। জোনাকি জ্বলচে ঝোপে ঝোপে—মাথার ওপর নক্ষত্রলোক। হু হু হাওয়া বইছে। স্নিগ্ধ নদীজল। ছাদে শুই।

২৫শে মে, ১৯৩৪। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

কাল রাতে আমি ও জেলি সিঁদুর কোটো ও সল্‌তেখাগীতলায় আম কুড়িয়ে এলাম। অনেকক্ষণ বসে লিখ্‌লুম। তারপর গেলাম কুঠির মাঠে [—] সেখান থেকে স্নানে আমাদের ঘাটে। নদীজল, তীরের tropical woods আমাকে যেন এবার নতুন চোখ দিয়েচে—যত বয়স হচ্চে, তত যেন চোখের আলো খুলে যাচ্চে। দুপুরে খুব ঘুম হোল, ঘুমিয়ে উঠে খুড়োদের উঠোনে ঘাসের ওপর বুড়ো আম গাছটার ছায়ায় বসে আছি—এমন সময় রানু এল। আমি ছাদের উপর গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত লিখলুম। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র মালতীর অধ্যায় লিখচি। তার পর ঘন ছায়ার দুধারের ঝোপ, বনের মধ্যে দিয়ে শান্ত সন্ধ্যায় কুঠির মাঠে হাওয়া খেতে গেলাম ও সেখান থেকে এসে আমাদের ঘাটে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীজলের ঢেউয়ের সঙ্গে সাঁতার দিয়ে নাইলাম। ছকু মাঝি ঘাটের পাশে ভাত রাঁধচে—তাকে বল্লাম তুমি কাল আমাকে নিয়ে যাবে সবাইপুরের ঘাটে। রাত্রে খুকু গান করলে। রানু, আমি খুকু ন'দি অনেকরাত পর্যন্ত তাস খেলা করলুম।

২৬শে মে, ১৯৩৪।১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে বসে লিখচি আর জীব গোস্বামীর গান গাইচি—এমন সময় করুণা এসে বল্লে আকাইপুরে চলুন। বিকেলে তার সঙ্গে আকাইপুরে রওনা হোলাম। পথে পোস্টাপিসে কাজ ছিল [—] মিটিয়ে দুজনে মাঠের মধ্যে দিয়ে চল্লুম। খুব মেঘ উঠল—খুব হাওয়া। রৌদ্রের উত্তাপ কমে গেল। নওদার বিলের ধারে আমরা বসে পদ্মফুল—পদ্মের চাকা তুললাম—জল খেলুম পদ্মপাতায়। তারপর কাল-বৈশাখীর মেঘ উঠল—কি অপূর্ব নীলকৃষ্ণ মেঘ উড়ে আসচে—শ্যামবট বাঁশ আম গাছের মাথা দিয়ে। আজ কুড়ুতে গেলুম একটা আমবাগানে। ওদের বাড়ি

পৌঁছে—আমি সন্দেশ ক্ষীর খেয়ে শান্তিময়ের গান শুনলাম। রাত্রে আমি ও করুণা চণ্ডীমণ্ডপে এলাম। ভোরে উঠে আবার আম খেয়ে বিলের ধার দিয়ে রওনা।

২৭শে মে, ১৯৩৪। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

এ দোকানে ও দোকানে বসতে বসতে এলাম—বাজারের সবাই ডাকে। প্রথমে নারান দাঁ, তারপর হাজারী সিং, তারপরে গজন, শেষে যুগল। বাড়ি এসে স্নানে গেলাম। বেলা ন'টার বেশি নয়। খুব মেঘ করেচে—ঠাণ্ডা দিনটা। দুপুরে লিখবার পরে খেয়ে খুব ঘুমুনো গেল। মোট ১২ দিন এসেছি বারাকপুরে [—] এরই মধ্যে কলকাতা মিলিয়ে মুছে গিয়েচে যেন। বারাকপুরেই চিরকাল আছি মনে হচ্চে। কি সুন্দর লাগে এখানে! boredom বলে পদার্থ নেই এখানে। বৈকালে একটু পুঁটিদিদিদের আমতলায় বস্‌বার পরে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম আমি আর [?]। মাঠের মধ্যে দৌড়ানো গেল। বেলেডাঙার গঙ্গাচরণের দোকানে বসে গল্প করলুম। তারপর খুব ছুটে দুজনে আমাদের ঘাটে এলাম কিন্তু নাইলাম না। আজ খুব ঠাণ্ডা। সন্ধ্যার সময় খুকু এল গল্প করলাম। মেঘে আকাশ ঢেকেছে চাঁদ দেখা যায় না।

২৮শে মে, ১৯৩৪। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে ও পাড়ার ঘাট থেকে মুখ ধুয়ে এলাম। নুটু এল সকালে। দুপুর বেলা তাস খেলা হোল। বৈকালে মাঠে গিয়ে বেড়িয়ে এলাম, তারপর খুকু এল—তার সঙ্গে নানা গানের সুর ভাঁজলাম। তারপর খেয়ে এসে জগদের বাড়ি সত্যনারায়ণ পুজোতে গেলুম। জেলে পাড়ার সেখানে কীর্তন করচে। বসন্ত এসেচে পাট্‌না থেকে—মতিকাকা বাড়ি এসেচেন, সেই সব গল্প হোল। ফিরে এসে দেখি শ্যামাচরণদার বৌ লণ্ঠন হাতে আম কুড়ুচ্চে—রাত এখন এগারোটা প্রায়। অনেকরাত পর্যন্ত তাস খেলা হোল। রানু, আমি খুকু, ন'দি খুড়িমা কালো। খুকু গান করলে। তারপর রাত ১২টার সময় শোয়া গেল খেলা বন্ধ করে।

২৯শে মে, ১৯৩৪। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

কি ভয়ানক গরম আজ! চারিদিকে কুয়াশা করেচে শীতকালের মত। দুপুরে স্নান করবার সময় মাঠের ধার দিয়ে যাবার সময়ে গরম দুপুরে প্রজাপতি উড়চে। আকন্দফুলের ঝোপে—সে এক আনন্দ। দুপুরে খুব ঘুমুলাম। উঠে দেখি পাঁচটা। খুব মেঘ করে এল। কালবৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ নীল মেঘ ঈশান-কোণে এল—বৃষ্টি পড়তে লাগল—আমি বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নদীজলে পড়লাম—ওপরে ওপরে সাঁতার দিতে লাগল্‌ম। কি আনন্দ! ওপারের নীল চরে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, অপূর্ব সবুজ শিমুলগাছে ওধারে, নদীজলের গন্ধ—জলের কালো ঢেউ...সে এক অপূর্ব ব্যাপার।

অনেকরাত পর্যন্ত লিখলাম। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা। 'দৃষ্টিপ্রদীপের' লোচনদাসের আখড়া অধ্যায় শেষ করলুম।

৩০শে মে, ১৯৩৪। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে মাঠে বেড়িয়ে এসে সুপ্রভাকে পত্র লিখ্‌তে বস্‌লাম। খুকুর কাল থেকে দেখাই নেই—আমস্বত্ত্ব [সত্ত্ব] নিয়ে ব্যস্ত আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র একটা অংশ কাল শেষ হয়ে গিয়েচে। আজ আমি ছুটি নেবো। পুকুরে নেয়ে এসে বকুলতলায় [—] বসে পড়লুম। খেতে অনেক বেলা হোল[—]২৷৷০টা। তারপর রানু, আমি, কালো তাস খেলা করি। খুকুকে কলার কাস্টার্ড করতে শেখালুম। খেলে উঠে বেলা ৫টা আন্দাজ সময়ে বনগাঁ রওনা হলুম। চাল্‌কীতে দিদিদের সঙ্গে গল্প করে আম খেয়ে উঠে বনগাঁয়ে গিয়ে দেখি—ক্লাবের মাঠে সাবরেজিস্ট্রার ডেক্-টেনিস খেল্‌চে—যতীন ডাক্তার বসে আছে। মেয়েদের ড্রিল দেখ্‌লাম। বাসা থেকে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি গেলাম। অনেকক্ষণ গল্প করার পরে ও ১৩০৪/৫ সালে রবীন্দ্রনাথের...? শুন্‌বার পরে বসে যতীন ডাক্তারের বাসার সামনে তামাক্ খেলাম। সাব্‌রেজিষ্ট্রার এসে বস্‌লে ও চেয়ার উল্‌টে পড়ে গেল। আমি সাইমন মুচির গল্প করলুম। রাত্রে পরোটা খেয়ে শুয়ে পড়লুম। বেজায় গরম।

৩১শে মে, ১৯৩৪।১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

রাত্রে গরমে ও মশায় ঘুম হয় নি। বারাকপুরে এবার এত ভয়ানক গুমট গরমেওএকদিনও ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি—ছাদে শুই বলে। গিরীনদাদার কাছে গিয়ে চা খেলাম ও বন্ধুর কীর্তি শুন্‌লাম। আমি আর শান্তি দুজনে বার হয়ে হেঁটে রাস্তা দিয়ে দিব্যি আস্‌চি। বারাকপুর পৌঁছে স্নানে গেলুম। ঘাটে খুকু আর পুঁটিদি। গল্পগুজব করে নাইতে দেরি হোল। এসে সুপ্রভাকে চিঠি লিখ্‌লাম। তারপর John Bull পড়লুম। খেয়ে এসে একটু তাস খেলা হোল—রানু, আমি, কালো, ন'দি। বিকেলে হাটে গেলাম। সেখান থেকে ফিরবার পথে অনেকেই জিগ্যেস করলে আমি কবে এলাম্? আমি তাদের অনেককে চিনি নে। মাঠে বেড়াতে গেলুম। পুঁটিদিদিদের বাড়ির পিছনে পথটিতে অপূর্ব ছায়া ঘনিয়েচে—গাছপালা, বাঁশবন শান্ত, বৈকালের ছায়ায় মায়াময়। এবার বৃষ্টি একেবারেই নেই—পথে ঘাটে কাদা নেই। কি ঘন সবুজ মাঠ! কি সোঁদালিফুল দোলানো বনঝোপ! মাঠে একটা জায়গায় গিয়ে এক্সারসাইজ করি ফাঁকা হাওয়ায়।?জায়গার বনঝোপ দূরের শিমুলগাছ, বাঁশবন দেখে মনে হচ্ছিল এর চেয়ে সুন্দরতর শান্তির দেশ আর কোথায়?

স্নান করতে গিয়ে আমি আর রানু সাঁতার দিলাম অনেকটা পর্যন্ত। অন্ধকার হোলে ফিরে এলাম। খুকু এল—মাছ মাংস (?) দুধারের গল্প হোল। দুপুরে খুকু অনেকক্ষণ ছিল।

১লা জুন, ১৯৩৪। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবারBrightest of Summer Vacation।

এবারকার মত চমৎকার ছুটির দিনগুলি আর কোনোবার বোধ হয় নি। বৃষ্টি নেই, জল কাদা নেই। রাস্তাঘাট শুক্‌নো খট্‌খট্ করচে। সর্বত্র অপূর্ব সৌন্দর্য। সকালে শিবু এসে বল্লে আম খাবেন? আমি বল্লাম ওবেলা। ছাদে বসে লিখ্‌লাম। তারপর ফণিকাকার বাড়িতে পেঁয়াজ আন্‌তে গিয়ে বন্ধুর সম্বন্ধে গল্প করলাম। ফিরে এসে লেখা গেল। স্নান করতে গিয়ে আমি ও কালো সাঁতার দিলাম। দুপুরে তাস খেলা হোল—আমরা দু'খানা ছক্কা ধরলাম—ন'দি ও রানুদের ওপরে। খুকু এল দুপুরে [—] অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বিকেলে কুঠির ওপাশে বেড়াতে গিয়ে একটা অতি সুন্দর স্থান আবিষ্কার করলুম। কি গাছপালা, কি উলুখড়ের ফুল—দুবার একটা সাপের হাতে পড়লুম। সন্ধ্যায় সাঁতার দেবার সময় মনে ভগবানের প্রতি অদ্ভুত ভাব হোল। রাত্রে খুকুকে কবিতা পড়তে দেখলাম। পুঁটিদিদি কথার মানে জিগ্যেস কর্ল্লে। বৃষ্টি।

২রা জুন, ১৯৩৪। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি আম আর চিঁড়ে খেয়ে এসে লিখতে বস্‌লুম। হরিপদ দাদা এল মাংসের পয়সা নিতে। তারপর সকালে সকালে স্নান সেরে এসে বকুলতলায় বসে Sigrid (?) Self-এর বইটা পড়তে শুরু করি। দুপুরে খেলাম না। খিদে ছিল না। খুব ঘুমুনো গেল। ৫টার সময় উঠে রামপদ দেখি এসেচে। দেউলে-সরাবপুর কোন্ শিষ্যবাড়ি গিয়েছিল বৃন্দাবনের সঙ্গে। সেখান থেকে আমি বেলেডাঙা বেড়াতে গেলুম। পথে মাঠের মধ্যে exercise করলুম। মাঠের শোভাঅপূর্ব—এবার বৃষ্টি নেই কোনো দিকে, উলুঘাসের ফুল ফুরফুরে হাওয়ায় দুল্‌চে—তবে এবার বেলফুলের গন্ধ নেই। স্নান করে এসে বস্‌লুম—খুকু এখনও আজ এল না— তারপর নলে নাপ্‌তের বাড়ি কলের গান শুনতে গেলাম। এসে লিখ্‌লাম—তারপর ছাদে অনেকরাত পর্যন্ত তাস খেলা হোল।

ছাদে খুব হাওয়া। কিন্তু আজ মন বড় খারাপ ছিল। একটা অদ্ভুত ধরনের emotional experience হোল—সেটা Painful হোলেও ভাল করে বিশ্লেষণ করে দেখলাম। মিতের ছেলে বেশ ভজন গায়..."ওগো [?] শিবনামে..."।

৩রা জুন, ১৯৩৪। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খুকু কাছে এসে বসে গল্প করলে। তারপর লিখ্‌লাম। সকালে সকালে স্নান করতে গেলাম। Sigrid (?) and Self পড়লুম। স্নান করে আসার সময় একটা মাঠে গাছের ধারে বস্‌লুম। সেটাও অপূর্ব স্থান। দুপুরে তাস খেলা হোল। বৈকালে কি কালবৈশাখীর মেঘই করে এল। নদীতে স্নান করে এলুম। অনেক রাত পর্যন্ত খুকুর সঙ্গে গল্প করলাম। রাত্রে তাস খেল্লাম। এই রাত্রে রামপদর ঘরে চুরি হয়ে আমার কিছু টাকা চুরি গেল।

৪ঠা জুন, ১৯৩৪। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে শুনলাম আমারও কিছু টাকা চুরি গিয়েচে—ওদের বাড়িতে সুট্‌কেস্ ছিল—তাই ভেঙে কে রাত্রে নিয়েচে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এদিন আর মাঠে বেড়াতে গেলাম না। এসে কিছু লিখ্‌লাম। তারপর খুকু ডাক্‌তে এল—বল্লে আমি ঘাটে নাইতে যাব কিনা। ওর সঙ্গে নাইতে গেলাম। সাঁতার দিলাম। তারপর সকালে সকালে নেমে এসে বসে sigrid (?) and self-এর বই পড়লুম। খেয়ে ঘুমুনো গেল। তারপর তাস খেলা। ৪টার গাড়ি যেতেই আমি, কালো, জেলি তিনজনে প্রথমে গেলুম বেলেডাঙা গঙ্গাচরণের দোকানে। সেখানে মুসলমান মাস্টারটি অতি সজ্জন। তার সঙ্গে গল্প করে ৪জনে খাণ্ডে ঘাটায় [?] গেলাম। খেয়া নৌকায় ওপারে গিয়ে একজন বুড়িকে পার করে দিলাম। তারপর একসঙ্গে নৌকাতে আমাদের ঘাটে এসে মাধবপুরের চরে নাম্‌লুম। বহুকাল পরে—ভরতের সঙ্গে বাল্যে একবার গিয়েচি। কি সুন্দর উলুবনের দৃশ্য ওপারে।! এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। সন্ধ্যায় খুকু এল—গল্প করে রাত্রে তাস খেলা ও 'খাই, খাই' গল্প।

৫ই জুন, ১৯৩৪। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে কুঠির মাঠে গিয়ে ওপাড়ার ঘাটে উঠ্‌লুম। ছাদে এসে দেখি খুকু তখনও ছাদে রয়েচে। তারপরে লিখে উঠে রামদাসের সঙ্গে গল্প করলাম। নাইতে গেলাম। তারপরে মাঠ থেকে নদীতে নেমে মনে অপূর্ব আনন্দ হোল—দুপুরে তাস খেলা হোল। খুকু খেল্লে। বিকেলে পাঁচীদের আমতলায় বসে পাঁচী খুকু রানুদের সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চা হোল। বিকেলে কুঠির মাঠে বেড়িয়ে ও এক্সারসাইজ করে এসে আমি খুকু রানু সাঁতার দিয়ে নাইলুম। পথে আমি উঠে আস্‌ছি—খুকু আমায় ডাকলে পথের মধ্যে।

রাত্রে তাস খেলা হোল। খুকু সন্ধ্যে বেলা এসে গল্প শুন্‌লে অনেকক্ষণ বসে। তাকে scorpio (n) চেনালুম।

৬ই জুন, ১৯৩৪। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে ছাদে লিখ্‌তে বস্‌লাম। অনেক বেলা পর্যন্ত লিখ্‌লুম—। এর মধ্যে বার দুই খুকু এল। তারপর খুব কড়া রোদে নাইতে গেলুম এ পাড়ার ঘাটে। কুঠির মাঠে রোজ নাইবার আগে খেজুর কুড়িয়ে আনতে যাই—একটা মাঠের ধারে সাদা ডানা প্রজাপতি ওড়ে, পাখিরা ডাকে, নীল আকাশ মাথার ওপর, কুঠির পাইন গাছটা দেশী গাছের মাথার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এমন দেখায়। আমি কেবলই ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবি। আমার সমস্ত চিন্তা এখন তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর কথাই ভাবায়। স্নান করে এসে তাস খেলা হোল। জাহ্নবী যে কাঁঠালটা পাঠিয়েছিল সেটা আজ পেকেচে। ন'দির কাছে একটা কাঁঠাল কাল দিয়েছিলুম। বিকেলে হরিপদদাদের বাড়ি থেকে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। ফিরে এসে দেখি ঘাটে রানু, পাঁচী খুড়িমা [—] সাঁতার দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত গেলুম। একটা অপূর্ব সিঁদুরে মেঘ হোল সন্ধ্যার আগে—ওপার থেকে জেলেরা বল্লে—এ যে জয়দ্রথ বধের মত হোল। সন্ধ্যায় ছাদে চেয়ার পেতে রানু, খুকু, আমি গল্প করি।

৭ই জুন, ১৯৩৪। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে কুঠির মাঠে গেলুম। কাল ছাদে শুয়েছিলুম অবিশ্যি। ছাদে বসে লিখ্‌বো ভেবেছিলাম কিন্তু কাঁঠালতলায় প্রকাণ্ড আড্ডা বস্‌লো।ফটিক, আমি, বসন্ত, ফণিকাকা ইত্যাদি। এসে লিখ্‌লুম। কালোরা এল। আচ্ছা হোল। কাল রাত্রে ছাদে খুকুকে scorpio শব্দটা উচ্চারণ করতে শেখাচ্ছিলুম—ফটিকেরা ছাদ থেকে শুনতে পেয়েচে। দুপুরে খুব বৃষ্টি—এ বৎসরের এই প্রথম বৃষ্টি। খানা ভোবা ভেসে গেল। তারপর হাটে। যাচ্চি—তাস খেলার পরে—পাঁচী বল্লে—এক গাল চাল ভাজা খাবেন?সে তার নিজের বাড়ি থেকে দিলে। হাট থেকে ফিরে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমাদের ঘাটে স্নান করে ফিরে এলুম। রাতে আজ সকালে সকালে শুয়েছিলুম।

৮ই জুন, ১৯৩৪। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ,.. ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে বেড়াতে গেলুম গাজিতলার মাঠে [—] কারণ কুঠির রাস্তায় খুব জল। মনে পড়ল এই কাঁঠাল বাগানের পথে আমি আর কালী ১৭ বৎসর আগে গাইতাম—'চলে তো যাবে মেরা নাইয়া কাহ্নাইয়া বেণু'—তখন তো মনেও ছিলাম বালক। এসে লিখ্লাম—একটু পরে খুকু এল—তাকে গল্প করলাম। তারপর নাইতে গিয়ে ও পাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে গেলাম। তার আগে কালীর স্বামী আমার এখানে এসে গল্প করলে। খেয়ে তাস খেলা হোল। দুপুরে নীল মেঘ করে খুব বৃষ্টি এল। খেতে গিয়ে ভিজে গেলুম খুড়িমার রান্নাঘরে। মেঘভরা শ্যাম বৈকালে আমি আর কালো মোল্লাহাটির পথে অনেকদূর বেড়াতে গেলুম। এ দৃশ্যের তুলনা নেই—কি শ্যামলতা, কি বাঁশগাছের দৃশ্য—কত ধরনের ঝোপগাছ—এক ধরনের গাছ দেখলুম—বড় বড় মখমলের মতপাতা—কেমন বাঁকা ডালপালায় ঝোপ সৃষ্টি করে—আমি ওর নাম জানিনে। সন্ধ্যায় খুকুকে Rip Van Winkle-এর গল্প বলি। রাত্রে একটু তাস খেলা গেল।

৯ই জুন, ১৯৩৪। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শনিবার

সকাল থেকেই আজকার দিনটা খুব ভাল যায় না। কারণ তিনটি। সকালে বিকেলে ও রাত্রে। এদিন বইখানা খুব পড়া গেল। Sigrid (?) and Self-এর বইখানা আজ শেষ হোল। দুপুরে প্রথমে কুঠির মাঠ ও শেষে সাঁতার দিয়ে ও পাড়ার ঘাটে। দুপুরে একটু তাস খেলা করলুম। বৈকালে আম কুড়ুতে কুড়ুতে ঝিনুকে, গুরোচনী এই সব আম পাড়তে লাগলুম। রাত্রে তাস খেলা গেল।

১০ই জুন, ১৯৩৪। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। রবিবার

এবার বারাকপুর খুব ভাল লেগেছে—এত যে এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই। সকালে সুসার কাকার মেয়ে এল—তাকে পড়া জিজ্ঞাসা করলুম। নেয়ে এসে বকুলতলায় বসেচি—খুকু অনেকক্ষণ গল্প করলে। দুপুরে বিমলা ও খুকু গান করছিল—পাঁচীদের জান্লায় দাঁড়িয়ে পাঁচী শুন্চে—আমায় বল্লে—আসুন বিভূতি মামা, এখানে দাঁড়ান। আমি লুকিয়ে খুকুদের রান্নাঘরের সিঁড়িতে বসেছিলুম। খুকু দোর খুলতেই আমায় টের পেয়েচে—আমি পালিয়ে গেলাম। তারপর হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে বেড়াতে যাচ্চি। খুকু কয়োতে জল তুলচে [—] আমি বল্লুম, একটু জল দে খুকু। খুকু জল দিলে—আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর চোখে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। পাঁচী বল্চে, চাল ভাজা খাবেন, ভাজ্বো। আমি বল্লুম—কাল খাবো। খুকু বল্লে—না না আজই খাবেন, ভাজুন, পাঁচী মাসি। সন্ধ্যায় পিঙ্গলবর্ণের মেঘ হয়েচে। মনে একটা strange bliss—এ ধরনের জীবনে খুব হয় না। মাথার ওপরে এটা নক্ষত্র উঠেচে। কোথায় দূরে কী একটা পাখি ডাক্চে—সমস্তটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত শান্তি। খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কত কথা হোল। আমি বল্লুম, তুই বাঁড়ুজ্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাস্লে—বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে। কত কথাই হোল। মেয়েরা না হোলে সৃষ্টি মিথ্যে হোত—কথাটা ঠিক। তেমনি পুরুষ না হোলেও তাই।

১১ই জুন, ১৯৩৪। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে কুঠির মাঠে বেড়িয়ে এসে লিখ্তে বসেচি রামমণি এসে বল্লে—কি করচেন? তারপর ওর 'কাকাবাবু' বই আনবার জন্যে গেলুম শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি। সকালে বসে লিখচি—কি শোভা হয়েচে জেলিদের বাড়ির দিকের বাঁশঝাড়ের ওপার ঘন কালো মেঘ হয়ে।

বিকেলে বেড়াতে গেলুম, মোল্লাহাটির পথে। বাস্তবিক বড় হয়ে চোখ ফুটে পর্যন্ত এ পথে বেড়াতে আসিনি। এ পথের সৌন্দর্য অতুলনীয়ই বটে। আজ আবার সকালেই একটা অস্বাভাবিক ধরনের নীল ও মেঘের রং, [—]সূর্যের আলো রাঙা। চারিধারের শ্যামলতার প্রাচুর্য—বটগাছের contour ও কেঁয়ো ঝাকা ও ষাঁড়া গাছের ঝোপ—সে যে কি রং হয়েছে। কি প্রসারতা, কি মুক্তি, কি আনন্দ! গঙ্গাচরণের দোকানে বসে তামাকখেলুম। সন্ধ্যায় স্নান করে এসে গিরীনদাদা ডাকলেন হরিপদদাদাদের বাড়িতে। ডাক্তার? এসেচে। রাত্রে তাস খেলা হোল। ন'দি আজ সকালে চলে গেল।

১২ই জুন, ১৯৩৪। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে আমরা উঠ্‌লাম—আমি, কালো, রানু। খুকু সব একসঙ্গে। তারপর একটু লিখে বৃষ্টি এল—প্রথমটা ছাদে বসেছিলুম। ছাদের শোভা অপূর্ব হয়েছিল—বর্ষায় ঘন মেঘে। আমরা স্নান করতে গেলুম—সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় এ পাড়ার ঘাট থেকে গেলুম ও পাড়ার ঘাটে—সে এক অপূর্ব আনন্দ। ও পাড়ার ঘাটে পাঁচী নাইচে। আমরা উঠে বাড়ি এলুম। খুব বৃষ্টি পড়তে লাগল। দুপুরে খুব ঘুম হোল। বৈকালে আমি একা গঙ্গাচরণের দোকানে গেলুম। সেখানে বসে অভিনয় সম্বন্ধে গল্প হোল। রামধনু উঠেচে—বসে থাক্‌তে থাক্‌তে একটু একটু বৃষ্টি এল। বেশ রৌদ্র ছিল এতক্ষণ—এইবার মেঘে ঢেকে গেল।

সন্ধ্যায় খুব অন্ধকার। আমি কালো বসে তাস খেললুম। রাণু ও খুকু একটা গান করলে।

১৩ই জুন, ১৯৩৪। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে খুব বর্ষা। তা সত্ত্বেও কুঠির মাঠে গেলুম। আমাদের ঘাটটাই ভাল—তাই স্নানের সময় আমি ও পাগলা জেলে সাঁতার দিয়ে ও পাড়ার ঘাটে গেলুম। সকালে খুকু এল—তাকে বই দিলাম। দুপুরে লিখে একটু ঘুমুনো গেল। সকাল সকাল বার হয়ে বেলেডাঙায় গঙ্গাচরণের দোকানে গল্প করলুম। সুন্দরপুরের পথে অনেকটা বেড়িয়ে এলাম। তারপর গঙ্গাচরণের দোকান থেকে তামাক কিনে আমাদের ঘাটে সাবান মেখে চান করলুম। তামাকটা ঘাটে ফেলে রেখেছিলুম। সন্ধ্যাতে খুকু চাল ভাজা নিয়ে এল। অনেকটা গল্পগুজব করি। তারপর আমরা তাস খেললুম। কালো আজ বনগাঁয়ে গেছে। ছাদে দিয়ে অনেকক্ষণ ভূতের গল্প হোল। খুকু বাজি ফেলে রোয়াকে গেল অন্ধকারের মধ্যে। অনেক রাত্রে আবার গল্প করলুম সবাই মিলে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি বৃষ্টি পড়চে। সবাই নিচে নেমে আসি।

খুব বর্ষা, বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। আজ অমল মুখুজ্যের বিবাহের পত্র পেলাম।

১৪ই জুন, ১৯৩৪। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে কুঠির মাঠে—তারপর এপাড়ার ঘাটে। একটু পরে লিখতে বস্‌লাম। খুকু এল—তাকে বসুমতীর ছবি দেখালুম। তারপর ও এসে ডাক্‌লে—ঘাটে যাবেন না? আমি নাইতে গেলুম। ও সাঁতার দিতে দিতে বেশি জলে যায় দেখে আমার ভয় হোল। তারপর আমি সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলাম। শ্যামাচরণদাদা ঘাটে নাম্‌ল।

আজ কাল প্রকৃতির শোভা আর তেমনি দেখিনে, মন সঙ্কুচিত হয়ে একটা সঙ্কীর্ণ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে। এ রকম মন নিয়ে চিন্তা বা কোনো বড় লেখা আসে না। সর্বদাই মন ব্যস্ত, উড়ু উড়ু ভাব। বারাকপুরের প্রকৃতির মধ্যেও আজ গত ৬/৭ দিন আমি সদাই অন্যমনস্ক। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার বটে।

বিকেলে হাটে গেলাম। মেঘাচ্ছন্ন দিন। হাট থেকে এসে ঘাটে স্নানে গেলাম। বৈকালে খুকু গা ধুতে যাচ্চে; কবিতা দেখে দাঁড়াল। তাকে পড়ে শোনাবো বল্লুম। সন্ধ্যায় এসে অনেকক্ষণ বস্‌ল। তাকে আজকাল ডাকি। ভূতের গল্পও বলি। রাত্রে তাস খেলা হোল—আমি আর খুকু [,] খুড়িমা আর রামু। কত রাত পর্যন্ত গল্প হোল।

১৫ই জুন, ১৯৩৪।৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে হরিপদদাদাদের বাড়ি গিয়ে চা খেয়ে এলুম। রামমণি অনেকক্ষণ আসেনি—মনটা উড়ু উড়ু করছিল। জেলি আগুন নিয়ে এল। আমি বল্লুম—কে রাঁধচে? রামমণি। খুড়িমা কোথায় রে? ঘাটে? রাণু কোথায়? ও-ও ঘাটে। একটু তামাক টেনে আমি ছুতো করে আগুন আনতে গেলুম। খুকু হাসি মুখে আগুন দিলে। বল্লে—ছোঁবেন না তাহলে মা আমার রান্না খাবেন না। আপনার এড়া কাপড় আলাদা। তারপর ও সমস্ত দিন এল না বলে আমার মনে ভারি রাগ হোল। একবার কুয়োর কাছ থেকে ফিরে গেল।

বিকেলে বিভূতি এল। বৃষ্টি মাথায় ভিজতে ভিজতে আমি আর কালো গঙ্গাচরণের দোকানে গেলাম। বৃষ্টিতে চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া—তারপর মাঠে এক্সারসাইজ করে নদীতে নাইতে নেমে সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে মাধবপুরের চর দেখলুম—কি শোভাই হয়েচে। রাত্রে খুব ঠাণ্ডা। সারারাতই বৃষ্টি।

১৬ই জুন, ১৯৩৪। ১লা আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালেই পাঁচীর অসুখ নিয়ে রামপদ ঝগড়া করচে পুঁটিদিদির সঙ্গে। বল্লে—তোমার একখানা চিঠি আছে। দেখি সুপ্রভার চিঠি। খুকুকে ডাকতেই সে এল—কারণ তার নামেও সুপ্রভাও লিখেচে। খুকুকে দিয়ে বসে পত্র লেখালুম। তারপর ও আবার এল রুমাল দিতে। বসে রইল খানিকক্ষণ। একবার বল্লে—আপনার তো এতদিন ছুটি আছে, এত সকালে যাবেন কেন? দুপুরে প্রায় আমি গেলুম গোপালনগরে। সুপ্রভার চিঠি দিতে। হাজারি সিং-এর দোকানে বসে প্রেততত্ত্বের আলোচনা করা গেল। তারপর রানা সেক্‌রার দোকানে বসে মহেন্দ্র ছুতোরের কথা শুনলাম। ডাব কিনে আনলাম খুকুর জন্যে। সন্ধ্যায় নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেলুম ওপারে। ওপারে এক জায়গায় নৌকো লাগিয়ে মাঠে বেড়িয়ে এলাম। বেশ সুন্দর সবুজ ঘাস। স্নান করে বাড়ি এলুম। একতারা নিয়ে গান করা হোল খানিকক্ষণ। রাত্রে খুকু এল—বল্লে ওপরে যাবেন না। আসুন তাস খেলি। অনেক রাত পর্যন্ত তাস খেলা গেল। 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' উচ্চারণ করলুম আজ কালিদাসকে স্মরণ করে।

১৭ই জুন, ১৯৩৪। ২রা আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে কুঠির মাঠে গেলুম। আমার মন সর্বদাই ব্যস্ত—কেন তা কি জানি? সম্প্রতি মনের এ ভাব হয়েচে। কোনো কাজ হয় না। একই বিষয়ের চিন্তা শুধু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ঘাটে যাবার সময় খুকু দেখি কাপড় কেচে মায়ের সঙ্গে আস্‌চে। দুপুরে একবার ছাদে কি কাজে এল। আমি কাছে ডাক্‌লুম। দুপুরে আমি ঘুমিয়েচি ওএল—চোখাচোখি হোলেই কেমন হাসে। আরও একবার অমনি হোল। ওকে বলেচি—তুই তিনবার আসবি, একা বসে থাকি! ও এলে তবুও আমার আগের বিষয়ের চিন্তাটা কমে। নয়তো সেটা বেড়ে যায়। দুপুরের পর কি ভয়ানক বর্ষা! ওই চিন্তায় আমার কাজ মাটি হবার উপক্রম হয়েচে। আমি যে এত highly impassioned তা এর আগে জানতাম না। এটা একটা উগ্রবেদনার মত বুকে এসে বিঁধেচে—দিন রাত কত কষ্ট দিচ্ছে আমায়। আমি একেবারে helpless, হাটের আগে ভয়ানক বৃষ্টি। হাট থেকে বৃষ্টি মাথায় এসে নির্জন বারান্দাতে বসে ভাব্‌লাম অনেকক্ষণ। পোকার উপদ্রবে রাত্রে খাওয়া হোল না। অত্যন্ত অন্ধকার। সন্ধ্যার পরই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু রাত ১১টায়? ঘুম এল না। শুধুই সেই উগ্র বেদনা বোধ ও ভাবনা। ঈশ্বরকে কেন সাকাররূপে উপাসনা করে সে সত্য কাল মনে অস্পষ্ট ভাবে উদয় হয়েচে। চিরসুন্দরকে লোকে আপনার ভেবে পেতে চায়, এর মধ্যে মানুষের হৃদয়ের দিক থেকে একটা need আছে। কত রাত পর্যন্ত ওই সব ভাবতে লাগলুম। পড়ে গিয়েচি ফেরে, উপায় কি? মানুষের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় কি?

১৮ই জুন, ১৯৩৪, ৩রা আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

আজ সকালে খুব মেঘ। বৃষ্টিও হোল খুব [—] বেলা ৭/৮টার সময়ে বৃষ্টি এল। খুকু জলখাবার দিয়ে এল তারপর। আজ যেন মেজাজ ভাল নয়। বাড়িতে কি হয়েচে। তারপর আবার জলখাবার দিয়ে গেল। বৈকালে আমি আর কালো গঙ্গাচরণের দোকানে গিয়ে যুগলের সঙ্গে নানা যাত্রাদলের গল্প করলুম। ফণী অধিকারী ইত্যাদি—নানা দলের কথা। ফিরবার পথে কুঠির মাঠে একটা লতা ঝোপ ঘেরা নিভৃত স্থানে এক্সারসাইজ করলুম। তারপর স্নান করতে নাম্‌লুম—জল খুব ঠাণ্ডা।

মনের অবস্থা আজ আরও খারাপ। রাত্রে তাস খেলা হোল না। আমি আর কালো গল্প করতে লাগ্‌লুম—ওরা যখন এল, আমি ইচ্ছে করেই বাজে গল্প করে কাটালুম।

ওই চিন্তাটার জন্যে এবার গ্রীষ্মের ছুটির শেষ দিকটা বড় নিরানন্দে এবং বেদনার মধ্য দিয়ে কাট্‌ল। কি জানি মনের এ ভাব কবে দূর হবে। এবার গাছপালা, নদী বন কিছুই দেখেও দেখিনে। মন থাকে কোথায়, চোখ থাকে কোথায়।

১৯শে জুন, ১৯৩৪। ৪ঠা আষাঢ়, ১৯৪১।মঙ্গলবার

সকালে উঠে কুঠির মাঠে গেলুম। এসে দেখি ওরা উঠে গিয়েচে। সকালে একটু পরে খুকু এসে বল্লে—কি কচ্ছেন? তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা গেল। নাচ শিখে এসেছে—বল্লুম, নাচ দেখাবি? সে বল্লে—না। তারপর

তাকে কাছে ডাকবার পরও এসে অনেকক্ষণ রইল। লক্ষ্মীডাক্তার এসে গল্প করলে। আমি কালো নাইতে গেলুম। বাঁধাল ধরে স্নান করতে লাগ্‌লাম। পাগ্‌লা জেলে সাঁতার দিয়ে বাঁধালের কাছে এল। আমি বাঁধালের ওপরের নীল আকাশ, এক ঝাড় বাঁশ, ঝোপের দিকে চেয়ে গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে লাগলুম—'বসিয়া বিজনে, কে [কেন] একা মনে পানিয়া ভরনে চললো গৌরী'। বল্‌তে বল্‌তে এমন আনন্দ পেলুম! চিরসুন্দরের সঙ্গে, নারীর সঙ্গে, প্রকৃতিরসঙ্গে ভুবনে ভুবনে কি আশ্চর্য আনন্দ সম্বন্ধ রয়েচে। ওদের মুখের হাসি—সে চিরসুন্দরের দান—বৃষ্টি—এই নীল আকাশ, এই সুন্দর জল, বাঁশবন, তার মধ্যে স্নেহ প্রেম সেবা দয়া—এরা আছে বলেই এ পৃথিবীই সুখ। আগুন আনতে গেলুম দুপুরে খুড়িমার কাছে। খুকু বকুলতলায় বই পড়চে—আমায় দেখে হেসে বল্লে—বই পড়চি। তারপর এসে আগুন দিয়ে গেল। সন্ধ্যায় কাঁচিকাটা থেকে এসে কাপড় ছাড়চি—ও আবার এল। পাঁচীর কাছে গিয়ে বসে তিনজনে গল্প করলুম। ঝিম্‌ ঝিম্‌ বৃষ্টি। রাত্রে আমি খুকু, কালো খুড়িমা তাস খেল্‌লুম।

২০শে জুন, ১৯৩৪। ৫ই আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

মনে পূর্বের মত দুশ্চিন্তা নেই। আমার একটা মীমাংসা হয়েচে। অনেক ভাববার পরে কাল বইখানার সম্বন্ধে একটা পথ বার করেচি।

সকালে আমরা নাইতে গেলুম। খুকু ঘাটে গিয়ে দেখি নাইচে। তাকে সাঁতার দিতে বল্লে—সে বেশি জলে যায়। তাকে গোটাকতক বার ডুব দেওয়ালে সে ভয় পেয়ে জল থেকে উঠতে রাজি হোল। একসঙ্গে আমরা ঘাট থেকে এলাম। বৈকালে খুব মেঘ। আমরা খাব্‌রাপোতা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। খুব বর্ষায় ঝোপঝাপ, তার তলা অন্ধকার, রাঙা ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে। বড় বড় বট গাছ—ছায়ানিবিড় ঘন কালো মেঘ আকাশে। খুব বেলা থাকতে বাড়ি ফিরে এলাম। বসে আছি, রাঙা রোদ উঠল বাঁশবনের মাথায়, নারিকেল গাছের মাথায়। খুকু আসে না আসে করে খুকু এল সন্ধ্যার সময়। খুড়োদের দাওয়ায় কতক্ষণ গল্প করলাম। পাকা আম খেলাম, খুকু নিয়ে এল। ভারি সুন্দর আম। রাত্রে গল্প হোল—ছাদে বসে তাস খেলা হোল—আমি আর খুকু, কালো আর খুড়িমা। রাত্রে কি বেজায় গুমট গরম।

২১শে জুন, ১৯৩৪। ৬ই আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে বৃন্দাবনের ছেলে এল—সে অনেক ছড়া বল্‌তে লাগল। খুকুকে ডাক্‌লুম। সে দুপুর বেলা গল্প শুন্‌লে পাঁচীর কাছ বসে। বিকেলে হাটে গেলাম [—] সেখানে খুব বৃষ্টি এল—সারাদিনটা মেঘলা। আমায় দেখলেই খুকু হাসে—হাট থেকে এসে খুব বৃষ্টি, একলা বসে আছি। এমন সময় ও চা নিয়ে এল—বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজচে—আমি বল্লুম—ভিতরে আয়। রাত্রে খেলা হোল।

তারপর আমি বই পড়তে লাগলুম। এ সময় আমার মনে অন্যরকম ভাব হয়। এই সব নির্জন অন্ধকার রাত্রে মন আমার বদলে যায়। আমার মধ্যে এই তীব্র আবেগ ও impassioned মনোভাব—এটা আমাদের জাতের লোকের স্বভাব।It is the oldfire, the sacred fire, that God Prometheus brought from heaven.

বুঝলাম that fire is not dead—it is the undying fire.

অন্ধকার রাত্রে বিশ্বদেবকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিলাম। তিনি এ fire দিয়েচেন।

২২শে জুন, ১৯৩৪। ৭ই আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে বৃষ্টি। খুকু এল বিছানা তুলতে ওদের ঘরে। তারপর হাঁ করেআমার জানলাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ওদের ঘাটে নাইতে গেলাম—খুক খুব সাঁতার দিলে। বৈকালে কালো মেঘ করে ঘন বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় আমি আর কালো বেলেডাঙায় গেলুম। কি সুন্দর আকাশের রং। একটা মাঠে দাঁড়িয়ে অপূর্ব বিদ্যুতের খেলা দেখ্‌লুম—নীল মেঘ উড়ে উড়ে যাচ্চে—অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়চে—গাছপালার রং সবুজ [—] তার ওপরে

নীলকালো মেঘ—বৃষ্টির কুয়াশা, মনে আজ কিছু আনন্দ—কিছু খারাপ। বেড়িয়ে এসে পাঁচীদের বাড়ি বসে গল্প বল্লুম। একবার ওর ওপর রেগে উঠলাম—দুবার রেগে উঠলাম। দুবারই ও ভয় খেলে। রাত্রে এসে তাস খেলা হোল।

আজ নদীতে সাঁতার দেবার সময় খুব আনন্দ। আমার মনের সেই তীব্র ভাবটা যেন আজ অনেকটা চলে গিয়েচে। সেই বেদনাটা আজ আর নেই। মন অনেকটা হাল্‌কা। মাঠে মেঘান্ধকার আকাশের তলে হাত জোড় করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বল্লুম বিশ্বদেব তোমার এই অনন্ত পথে—নিয়ে যাও—কত মধুর সঙ্গী—সামনে—পুণ্যে, তোমার পথই পথ।

২৩শে জুন, ১৯৩৪। ৮ই আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে খুব মেঘ আকাশে। খুকু একবার ডাকতেই এলো। তারপর আম খাওয়ালে। গল্প বল্‌বার জন্য ডাকাডাকি করতে পাঁচীদের বাড়ি গিয়ে গল্পটা শেষ করলুম। বিকেলে আমি আর কালো সুন্দরপুর পর্যন্ত বেড়াতে গেলাম। বৃষ্টিতে ভিজে গাছপাতার গুঁড়ি সব কালো হয়ে রয়েচে—তলায় তলায় ব্যাঙের ছাতা আর কি গাছপালার প্রাচুর্য! বেলেডাঙার ওপারটা [—] পুলের ওপারের মোড়টা একটা beauty spot. কি সুন্দর রাঙা রোদ উঠ্‌ল—আমরা যখন গঙ্গাচরণের দোকানে বসে গল্প করচি। মাঠে যখন এক্সারসাইজ করচি তখন গাছপালার রোদের কি সোনার রং। আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে বাঁধালের কাছ দিয়ে ওপারে দেখ্‌লাম একটা চারা সাঁইবাব্‌লা গাছে রোদ পড়ে কি রং হয়েচে!

সন্ধ্যাবেলায় খুকুকে ডাকলাম। সে আস্‌তে পারলে না। বল্লে—এখন যাবো না। সে এখন রাঁধচে। আজ রাত্রে আর তাস খেলা হোল না। মনটা আজ কলকাতার জন্যে চঞ্চল হয়েচে। ভারি খারাপ।

২৪শে জুন, ১৯৩৪। ৯ই আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে সুসার কাকা এলেন। আমি গিয়ে কালোদের বাড়িতে ছোট খুড়িমার সঙ্গে গল্প করলাম। কালকার মন খারাপ আজওআছে—অতি ভয়ানক মন খারাপ—কেমন একটা চাপা মনের ভাব—এই বর্ষার দরুনই। রোদ না উঠ্‌লে ভাল লাগে না আমার। সকালবেলাটা যেন মনে পাষাণের ভার চাপানো রয়েচে। দেখি আজ রোদ ওঠে কি না। সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। আমার পেছনে পেছনে কালো গেল। নদীর মাঝখানে দড়ি ধরে অনেকক্ষণ এপারে ওপারে নাইতে লাগলুম। দুপুরে চালকী গেলাম। ফিরে এসে সুসার কাকারসঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা হোল। সন্ধ্যায় রানু বল্লে—আজ যাবেন না দাদা, আপনি গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে। খুকুকে ডেকে দিল—কেবলেচে দাদার গা ঘিন্‌ঘিন্ করবে, গা ধুয়ে আসি। আবার রানু সন্ধ্যাবেলা বল্লে—যাবেনকাল দাদা। সন্ধ্যাবেলা খুকু আস্‌ছিল—আমি ওকে ধমক দিয়ে বল্লাম বিকেলে এলিনে কেন? আজ ওদের জামাই এসেচে। ছোট খুড়িমা আমি যখন যাচ্চি, গিয়ে বল্লেন—একটু মাংস দেবো, এখুনি খাওয়া হয়ে গেল? রামপদ বাড়ি এল সন্ধ্যার ট্রেনে।

২৫শে জুন, ১৯৩৪। ১০ই আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

ওদিন সকালে নাইতে গেলাম। বৃষ্টি নেই। খুকু নেমে আস্‌চে রানুও নেমে আস্‌চে। আমায় বল্লে—যেন ছোঁয়া না যায়। আমি ইচ্ছে করে ছুঁয়ে দিলাম। যদিও খুকু আবার শ্যামাচরণ দাদাদের আমগাছের দিকে পালালো। আমরা নিজেরা নাইতে গেলাম—আমি একা। সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। বিকেলে বাইরে বসে রইলুম। বকুলতলায় খুকুরা? খেল্‌তে লাগল। আমার কাছে বিমলাকে নিয়ে এল গল্পশুনতে। রাত্রে তাস খেলা হোল না। সবাই পরিশ্রান্ত ছিল।

২৬শে জুন, ১৯৩৪।১১ই আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। শম্ভুর গাড়িতে খুকু এসে প্রণাম করল। গাড়ি চালকীর কাছে এলে দেখি [—] জাহ্নবী ও খুকি দাঁড়িয়ে আছে লেবু ও কাঁঠাল নিয়ে। তারাপদবাবুদের বাসায় যাব, খেয়ে ট্রেন ধরলুম। ট্রেনে মন এত ভার যে সে রকম মন ভার বহুকাল হয়নি। ১৬ বছর বয়েসে এই ট্রেনে এই গরুর

গাড়িতে একবার বনগাঁয়ে এসেছিলুম—সেই কথা মনে হোল। কলকাতায় এসে বিকেলে নীরদবাবুদের flat-এ গেলাম। ফিরে গেলাম বন্ধুর বাসায়। অনেকক্ষণ গল্প করলুম।

২৭শে জুন, ১৯৩৪। ১২ই আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করে এলাম। হেঁটে দেখে এলাম স্কুল আজ খুলচে কিনা। হরিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। স্কুল খোলেনি। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে ট্রামে খেয়ে ঘুম দিলাম। ঘুম থেকে উঠে মন উদাসীন। বিকেলে বঙ্গশ্রীতে যাচ্চি—বিমলেন্দু ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিং থেকে ডাক্‌লে। চা খাবার খাওয়ালে। বঙ্গশ্রীতে গেলাম—সেখান থেকে মোটরে আমি সুনীতিবাবু, পরিমল, মনোজ সবাই গেলাম বাগবাজারে স্টুডিওতে। পশুপতিবাবুর বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে নীরদ চৌধুরীর বাড়ি গিয়ে ঘণ্টা টিপি—সাড়া নেই। বাড়ি ফিরে এলুম—সঙ্গে A Gentleman from San Francisco বলে একখানা Ivan Bunin-এর গল্পের বই।

২৮শে জুন, ১৯৩৪।১৩ই আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে গেলুম। কোলা যেন বদ্‌লে গিয়েচে—ওকে আর যেন চিনতে পারা যায় না।—ভালও লাগ্‌ল না। সকালে ছুটির পর বঙ্গশ্রীতে গেলাম। সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা। সেখান থেকে বার হয়ে Wide World কিন্‌তে গেলাম। ভাল লাগ্‌ল না। Wide World-এর taste আর নেই। কেন্দ্রবিন্দুতে মন এসেচে। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত energy-rejuvenation [—]আমি জীবনকে দেখেচি—এই দেড় মাসে।Nothing else matters।

২৯শে জুন, ১৯৩৪। ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে বঙ্গশ্রীর লেখা লিখলাম। তারপর স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বলাইবাবুর শালীদের দেখে সজনী ও কিরণ upset হয়ে গিয়েচে—সেই কথাই বল্‌চে। ওখানে অনেকক্ষণ থাকার পর আমি College Square দিয়ে হেঁটে P.C.Sircar-এর দোকানে গেলাম। অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা। কালিদাস রায়ের সঙ্গে দেখা হোল। কমলা বুক ডিপোর মালিক চা টোস্ট খাওয়ালে—খুব খাতির করলে।

৩০শে জুন, ১৯৩৪। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে গিরীন সোম এল। বই চাই—টাকা দিতেও রাজি। আর একজন প্রকাশক এল। আমি ছুটির পর বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে নীরদবাবুর flat-এ। অনেক রাত্রে আড্ডা দিয়ে ফিরি। নীরদবাবু উঠে চলে গেলেন কাজে। আমি আর তাঁর স্ত্রী অনেকরাত পর্যন্ত বসে আড্ডা দিলুম।

১লা জুলাই, ১৯৩৪। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়িতে হেঁটে যাবার সময় মনে একটা অপূর্ব আনন্দ। আমি সব যেন দিতে পারি ওর জন্যে। ওকে যখন পছন্দ করেচি—তখন সবই ত দিয়ে দিতেও পারি। ও বাস্তবিকই বড় বন্ধু।

৫০০০ হাজার টাকা যদি আমার থাক্‌তো [—] উইল করে তাও যেন ওকে দিয়ে দিতুম। এই রকম মনের ভাব। বাড়িতে এসে খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে নীরদবাবুর flat-এ। সেখানে প্রমোদ বাবুর সঙ্গে কত রাত পর্যন্ত আড্ডা।

২রা জুলাই, ১৯৩৪।১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

আজ ছুটি। সকালে নীরদের বাড়ি গেলাম। নীরদের স্ত্রী চা খাবার আন্‌লে। নীরদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। তারপর বাড়ি এসে Road Back পড়লুম। একটু ঘুমিয়ে উঠে বঙ্গশ্রীতে গেলাম।

মনে সব সময়ই সেই ভাবটা আছে। কেমন একটা অদ্ভুত ভাব—ঠিক বর্ণনা করা যায় না। যেন সেই কথাটাই ভাব্‌চি। এ একটা মুশকিলে পড়ে গিয়েছি এবার। এটাও সত্যি যে জীবনের সুখ আমি যা চাই তাতেই হয়তো নেই। কারণ সে তো ছেলেমানুষের জীবন।. সেদিকে সুখ নেই, জানি। তবু মনের চঞ্চলতা ও ভাব যায় না। জানি না কতদিনে যাবে। তবে আবার বলেছিল যে কিছুই চিরকাল থাকে না—খুব কড়া কথাই বলেছিল।

অনেকদিন পরে নরেনের সঙ্গে দেখা। মির্জাপুর পার্কে অনেককাল আগে তার সাথে কথা হয়েছিল—লেখা নিয়ে। এখন সেই [১৯৪০ সালে এই দিনটিতে কল্যাণীর সঙ্গে কত কথা হোল। কল্যাণী আসতে দিলে না বনগাঁ থেকে। ১৯৩৪ সাল এর অস্তিত্ব..? দিলই।]

৩রা জুলাই, ১৯৩৪। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে একটু Road Back পড়ে স্কুলে গেলুম। মন চঞ্চল—কোথাও বস্‌তে পারিনে—কোনো কাজে মন লাগে না। মনে হচ্ছে এসবে শান্তি নেই।

কলকাতায় বদ্ধ, নির্জন জীবন ভাল লাগে না। এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে জীবনের মূল্য অনেক। স্কুল থেকে একটু বঙ্গশ্রী গিয়ে আমি আর নীরদ চৌধুরী বার হয়ে গেলুম College Square পর্যন্ত। সেখান থেকে আমি ট্রেনে বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে ছাদে বসে টরু, আর বন্ধুর বৌ—সকলের সঙ্গে গল্প করলাম। ওদের রান্না ঘরটা তেতলার ছাদে—বেশ cosy...রান্নাঘরে বসে কথা বল্‌তে বেশ লাগে—যদি তার সঙ্গে হোতো। এর কথা মনে হয়। A little silence—হয়তো তামাক সাজ্‌বো আর বসে বসে গল্প করবো। loneliness বোধ করছি শুধু বারকপুর থেকে এসে।

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

এদিনও মন খুব ভাল নয়। স্কুলে গেলুম সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। হরেকৃষ্ণ ও সুকুমারবাবু এলেন। সজনী বল্লে—৫টার আগে এখানে আসার নিয়ম হয়েচে। খানিকটা পরে উঠে এলুম College Square দিয়ে। পথে সাতুকাকার সঙ্গে, পতিত ও হ্যাঁদার সঙ্গে দেখা। সাতুকাকা মাংস কিন্‌চে। পথে খুব বৃষ্টি। বাসায় এসে মন এত খারাপ লাগ্‌ল যে শুয়ে পড়লাম। অনেকরাত্রে উঠে আবার বইয়ের manuscript পড়া গেল।

৫ই জুলাই, ১৯৩৪। ২০শে আষাঢ়, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

এদিন সকালে আশু কবি এল প্রথমে। পরে কৃষ্ণধন, পি. সি. সরকার, তারপর এল কানাই। এই প্রথম আসা শুরু হোল যেন ওদের। সকালে পড়ে বইয়ের পাতা পড়লুম। মালতীর অধ্যায়টা আমার বেশ লাগছিল। স্কুল থেকে বেরুচ্চি, পথে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখা। দার্জিলিংয়ের গল্প হোল, ট্রামে প্রবাসী।

সেখান থেকে রমেশ সেনের দোকান। তারপর সন্ধ্যার পরে সোজা বাসা। এদিন আবার manuscript পড়লুম। রাত্রে বাইরে শুই—বড় গরম। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা।

৬ই জুলাই, ১৯৩৪। ২১শে আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে মনটা যন্ত্রণাই দিল। স্কুলের পরে আগে এল কৃষ্ণধন দে, তার সঙ্গে গল্প করতে করতে স্কুলে। স্কুল থেকে বৃষ্টি মাথায় গেলুম হরিবাবুর অষ্টাবজ্র সংহিতা কিনতে ডি.এম. লাইব্রেরিতে। স্কুলে এসে হরিবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি পরলোক সম্বন্ধে। সেখান থেকে হেঁটে বাসা ও তারপর ট্রামে টরুদের বাসা। পথে করুণার সঙ্গে দেখা। টরুদের বাসা যেতে রংমহলে এলুম পতিব্রতা দেখতে। বন্ধুদের ছাদে গিয়ে রাত্রে শোয়া হলো। একসঙ্গে আমি ঘণ্টু বার হলুম। টরুও ছিল। ভোরে চলে এলুম। বাসায় এসে কাল রাত্রের ঢাকা খেলুম। বন্ধুদের ছাদে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে মনের ভাব কমে গেল—নেই বল্লেই চলে।

৭ই জুলাই, ১৯৩৪। ১২শে আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

সকালে থিয়েটার থেকে বাড়ি এসে স্নান করে আগের রাতের খাবার খেলাম। নরেন এল। class friend সেই নরেন। তারপর আমি স্কুলে গেলাম। এসে ঘুমুলাম ৩॥০টা পর্যন্ত। তারপর ট্রামে নীরদবাবুর বাসায়। নীরদবাবু নেই। তার স্ত্রী চা করে খাওয়ালেন। শঙ্কর এল। আমি কাল রাত্রের থিয়েটারের গল্প করি। তারপর উঠে বাড়ি আসি। রাত ১০টার পরে পশুপতি বাবু এলেন। ১১॥০ টা পর্যন্ত গল্প হোল। মীরার বিয়ে হয়েচে—বরকনেকে তুলে দিয়ে এলেন ঢাকা মেলে।

ভাবনা এখনও যায় নি। রোজই ভাবি।

৮ই জুলাই, ১৯৩৪।২৩শে আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে মণির ওখানে গেলাম। সুধীর চৌধুরী, শচীন বাঙাল, সরোজ চৌধুরী প্রভৃতি এল। ১২টার পরে মেসে জল খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর উঠে স্কুলে প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির মিটিং। ব্রহ্মকিশোরবাবু ও সেক্রেটারি এলেন। বার হয়ে ৬টার সময়ে পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরে হেঁটে বৌবাজার দিয়ে মেসে এসে বর্ষণমুখর অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বারান্দায় বসে কত কি ভাবছিলাম। মনের স্বাদও অনেকটা ফিরে পেয়েচি। Time একটা প্রকাণ্ড element মানুষের ব্যাপারে এটা বুঝেচি—মহাকাল! কি না করে দিতে পারে মহাকাল! এর রসায়ন অদ্ভুত।

৯ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে কাকার বাসা। দেখা হোল না কারুর সঙ্গে। বঙ্গশ্রী আপিস। হেঁটে মেসে এসে ট্রামে গেলুম। সজনী বল্লে—খাওয়াবো। রাত্রি পর্যন্ত বসে রইলুম। হেঁটে চলে এলুম। বড় বর্ষা যাচ্ছে।

১০ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১। মঙ্গলবার

ছুটি। সমস্ত দিন বাসায় কাটিয়ে বিকেলে বঙ্গশ্রী, সন্ধ্যার পর সেখান থেকে হেঁটে চলে এলাম। Dull Day।

১১ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল। সেখান থেকে নিউ মার্কেটে Wide World, ফিরে বঙ্গশ্রী। বেজায় বৃষ্টি বিকেলে ও সন্ধ্যায়। অনেকদিন পরে আমি সজনী কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে সেই রেস্টোরেন্টে গেলুম।

১২ই জুলাই, ১৯৩৪।২৭শে আষাঢ় ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলের পরে বঙ্গশ্রী। সজনী নেই। প্রভাত নিয়োগীর সঙ্গে দেখা [—] মুসৌরি যেতে বল্লে পুজোর সময়ে। বেরিয়ে আসচি—anderson's fairy tales কিন্‌লাম। প্রজ্ঞাব্রতের সঙ্গে দেখা। বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত তার সঙ্গে এলাম।

১৩ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে কৃষ্ণধনের বাড়ি। দেখলুম অনেকদিন আগে এই দিনটিতে সকালে কৃষ্ণধনের বাড়িই গেছলুম। আজ মনের মধ্যে অদ্ভুত creative fervour অনুভবকরচি। আর Dull বোধ করিনে। ছোট খাতাখানা হারিয়ে গিয়েচে—আর খুঁজে পেলাম না। মনের সেই emotional sadness এখনও যায়নি—অনবরত সে কথা ভাবি। ও একটা অদ্ভুত ভাব। নতুন অভিজ্ঞতা হল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে রথের মেলা দেখে হেঁটে টরুদের বাসায় গিয়ে ছাদে বসে টরু, টুকু, টরুর মা, সকলের সঙ্গে ভূতের গল্প করলুম।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৪। ২৯শে আষাঢ়, ১৩৪১। শনিবার

স্কুল থেকে সকালে বেরিয়ে বাসায় এসে ঘুমুই। তারপর সেই Wellingtion Square-এ ছেলেদের ম্যাচে রেফারিগিরি কর্তে। ওখান থেকে নীহার রায় নিয়ে গেল চা খাওয়ালে। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে বাড়ি।

১৫ই জুলাই, ১৯৩৪। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ি [—] সেখান থেকে ফিরে ঘুমিয়ে বৈকালে নীরদবাবুদের flat-এ।

১৬ই জুলাই, ১৯৩৪। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪১।সোমবার

সকালে উঠে নীরদবাবুর flat-এ। সেখানেই খেলুম। সকাল সকাল স্কুল গেলুম কারণ Inspector আসবে আজ। ৫টা পর্যন্ত স্কুলে রইলুম। বিকেলে সুসার কাকার সঙ্গে পথে দেখা। তিনি বাসায় ফিরে গেলেন। খুকু এসেছে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী।

১৭ই জুলাই, ১৯৩৪। ১লা শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলে যাবার সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। তারপর ছাতা দিতে সুসার কাকার বাসায়। খুকুর জ্বর পূর্ববৎ। স্কুলে ইন্সপেক্টর এল। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। প্রভাত নিয়োগী আর্টিস্ট মুসৌরির ঠিকানা দিয়ে গেল। পশুপতিবাবুকে নিয়ে খুকুকে দেখিয়ে ওঁর গাড়িতে বাগবাজারে গেলুম। ছাদে বসে খাবার খেয়ে গল্প করি। বৌ-ঠাকরুনের সঙ্গে এক পালা ঝগড়া করা গেল। তারপর ফটো তোলানো হোল। নীরদের বাসায় এসে দেখি নীরদ ঘুমিয়েচে। নীরদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করি। বাসে বাড়ি এসে দেখি নুটুর জ্বর। শুয়ে আছে।

১৮ই জুলাই, ১৯৩৪। ২রা শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলের পরে খুকুকে দেখতে গেলাম। সে আজ ভাল আছে। তারপর ওদের দু-একটা গল্প শোনালুম। খুড়িমা রুটি খেতে বল্লে। খেয়ে এলুম।

১৯শে জুলাই, ১৯৩৪। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। বঙ্গশ্রী থেকে খুকুদের বাসায় এসে খুকু ও বিমলাকে নিয়ে মিউজিয়ামে গেলাম। ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি গেলাম নীরদ দাসগুপ্তের বাড়ি। সন্ধ্যার পরে চা খেয়ে চলে আসি।

২০শে জুলাই, ১৯৩৪। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে মহিমা, কানাই, করুণা এল। আমার ১॥০টায় স্কুল। খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে বন্ধুর বাসায় গেলুম। ওদের ছাদে বসে চা খেয়েগল্প করা গেল। সন্ধ্যার সময় মণি বোস এসে ওদের বাড়িতে রবিবার যেতে বল্লে।

২১শে জুলাই, ১৯৩৪। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

আজ ছুটি। প্রবাসীর লেখা লিখ্লুম। নারায়ণ লাইবেরির লেখা এবং কালীর মামাশ্বশুর এল অনেকদিন পরে। তারপর খেয়ে প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে আসবার পরে নীরদ এল। সে এসে নিমন্ত্রণ করে গেল। আমি ট্রামে বেরিয়ে খুকু ও বিমলাকে নিয়ে গেলুম নীরদবাবুর flat-এ। সেখান থেকে 'রূপলেখা' দেখ্তে ওদের মোটরে ভবানীপুরে। ফিরবার পথে সুশীলবাবুর বাড়িতে এলুম। খুকুদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এলাম মেসে। রাত্রে প্রবোধের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে শুয়েচি—শেষ রাত্রে খুব বৃষ্টি।

২২শে জুলাই, ১৯৩৪। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে বসে লিখ্লাম। দুপুরে নীরদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে বসে একটু আড্ডা দিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলুম—সেখান থেকে ট্রামেমণির বাড়িতে। বারান্দায় বসে আড্ডা দিলুম। সুধীর এল।

২৩শে জুলাই, ১৯৩৪। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্কুলে গেলুম। আজ সকালেই পরীক্ষা শেষ হোল। তারপর বঙ্গশ্রীতে বসে আড্ডা দিলুম। বিকেলে খুকুকে নিয়ে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলাম। তারপর ওকেপৌঁছে দিয়ে বাসায় এলাম।

২৪শে জুলাই, ১৯৩৪। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

আজ সকালেই স্কুলের কাজ হয়ে গেল। বিকেলে সাহিত্য পরিষদের মিটিং ছিল। সুনীতিবাবু এসেছিলেন বঙ্গশ্রীতে—পশুপতিবাবুর গাড়িতে গেলাম সাহিত্য পরিষদে। সেখান থেকে চলে এলাম সকালে।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৪। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলে গেলুম বেলা একটায়। কাজ ছিল না। বঙ্গশ্রী থেকে হেমন্তের চিঠি নিয়ে এলুম। তারপর গেলুম বন্ধুর বাসায়। সেখান থেকে নীরদের ওখানে [—] ওখান থেকে পশুপতিবাবুর বাড়িতে। ফটোও তোলা হোল। তিনখানা প্লেট নষ্ট হোল। রাত্রে ঘুম ভাল হোল না। একটু পেটের অসুখ মত করেচে।

২৬শে জুলাই, ১৯৩৪। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

এদিন শরীর খারাপ। ট্রামে স্কুলে গেলুম। কাজ ছিল না। বঙ্গশ্রী থেকে আবার স্কুলে এসে শুয়ে রইলুম তেতলায়। ক্ষেত্রবাবু ও হরিবাবু এখনও কথা কইচে।...?থেকে বায়োস্কোপ দেখে এসে রাত্রে শরীর বড় খারাপ হোল।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৪।১১ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

কোথাও যাইনি। জ্বর।

২৮শে জুলাই, ১৯৩৪। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

আজ বেরুইনি। শরীর ভাল নয়। কৃষ্ণধন এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

২৯শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

শরীর ভাল। পশুপতিবাবু এলেন। বৈকালে নীরদ দাসগুপ্তের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। পাঁচতলার ছাদে উঠ্‌লুম।

৩০শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

আজ সকালে শরীর ভাল, পথ্য পেলাম। দশটায় বেরিয়ে খুকুকে নিয়ে শেয়ালদ' স্টেশনে এলাম। তারপর ট্রেনে ও গাড়িতে আমাদের বাসা। নৌকোয় রওনা হলুম বারাকপুরের দিকে। কি সুন্দর নদীর দৃশ্য! চারিধারের শোভা কি অদ্ভুত! বেলা ছ'টার সময়ে বারাকপুরের ঘাটে এলাম। নির্জন বাঁশবনের পথ, দুধারে ঝোপজঙ্গল বেড়েছে বেজায়—কিন্তু নির্মল, নীল আকাশ, পট্‌পটি ফল, ঘেঁটুকোল ফুটেচে। অপূর্ব নির্মল বর্ষায় অপরূপ! খুকু আর আমি বাড়ি এসে পৌঁছলাম। হরিপদদার কাছ দেখা করতে গেলাম। রাত্রে এসে তাস খেলা হোল। রামপদ ভাঙা তান্‌পুরো বাজাতে লাগ্‌লো।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৪। ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

আজ কি সুন্দর শ্রাবণের সূর্যোকরোজ্জ্বল প্রভাত। গাছে গাছে অপূর্ব সবুজের সৌন্দর্য! সেই মাঠে বেড়াতে গেলুম। তারপর গেলুম ঘোলার গাঙে নাইতে। ঘোলার গাঙ্‌ অপূর্ব—কি কূলে কূলে ভরা নদীজল—এতটুকু কাদা নেই কোথাও! তাছাড়া আজ আকাশের রংটা কি অপূর্ব নীল—নীচে বড় বড় সবুজ উলুবন। সতেজ তাজা, মাটিতে কোথাও কাদা নেই, শুক্‌না খট্‌খট্‌ করচে।

একটু ঘুমুলাম। উঠে দেখি অপূর্ব শ্রাবণ—দুপুরের রোদ। কত কথা মনে করিয়ে দেওয়া। এই সময়টা আমি কখনও দেশে থাকিনি। ১৯১৮ সালের কিছুদিন ছাড়া। তারপর খুকু এল। আমি পাঁচীকে বই দিয়ে এলাম। তারপর বেরিয়ে পড়ি। অপূর্ব রৌদ্রালোকিত নদী। মাঝে মাঝে মেঘ, রামধনু, কি রংয়ের মেলা!

১লা আগস্ট, ১৯৩৪। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

কি নদীর ধারের গাছপালার প্রাচুর্য—কি শ্যামলতা!...অনেকদিন পরে কলিকাতার কৃত্রিম সমাজের চোখ নিয়ে এসে এদের দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। ওবেলা কি তৃপ্তিতেই স্নান করেছিলুম! তারপর বনগাঁয়ে এসে পৌঁছলাম। ৪॥০টাতে নৌকো ছাড়লুম—৬টায় এলাম বনগাঁয়ে। নদীর ধারে চট্‌কাতলার কাছে কদমগাছে কদমফুল ধরচে—এখনও ফোটেনি—সাঁইবাব্‌লা গাছের প্রাচুর্য চালতেপোতার বাঁকে—মাকাললতা ও ফল। সন্ধ্যায় বীরেশ্বর বাবুর বাসায় গল্প করা গেল। দেশেই ভাল লাগে। এমন শরতের মত সূর্যকরোজ্জ্বল দিন আর দেখিনি শ্রাবণ মাসে। পরদিন উঠে খোকাখুকিদের পড়া নিলাম। বিভূতির আড়তে বসে গল্প করি। কালোর সঙ্গে দেখা হোল। আজও কালকার চেয়েও রোদ। বিনয়দার কাছ থেকে World of Souls বইখানা আন্‌লাম। বিকেলে রওনা। সারাটা পথ বইখানা পড়তে পড়তে সবুজ গাছপালা, শ্রাবণের আকাশভরা রোদ, সোনালী রঙের অদ্ভুত রোদ উঠ্‌ল দত্তপুকুর স্টেশনে—আমি বসে বসে জন্মমৃত্যুর রহস্য পড়চি—যেন কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বড় আনন্দে কাট্‌ল অনেকদিন দুঃখের পর অর্থাৎ অসুখের পর।

২রা অগস্ট, ১৯৩৪। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃস্পতিবার

স্কুলে যাচ্চি যতীনবাবু বল্লে—যেতে হবে না [—] আপনার substitute এসেচে। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে নিউ মার্কেটে Wide World-এর জন্যে। বাড়ি এসে পড়াশুনো করি। বিকেলে একটু কলেজ স্কোয়ারে ঘুরে আসি।

সেদিন বাড়িতে যে অপূর্ব শরতের দুপুর দেখেছিলুম—তার কথা আজও মন থেকে মুছে যায়নি। এবার এই দুদিন বাড়ি গিয়ে কি enjoy—করেচি। ছকুর নৌকাতে কি চমৎকারই লাগ্‌লো আস্‌তে। ছকুদা কাটা তামাক সাজলে। রাজনগরের বাঁকে বসে হাতে কল্কে করে খেলাম।

৩রা আগস্ট, ১৯৩৪। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩১। শুক্রবার

স্কুলে join করলুম। কোলার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। তারপরে বঙ্গশ্রীতে। কিরণের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আসি। নীরদ এল। বেরিয়ে কাকার বাসায় গিয়ে খুকুর কথা বলে এলাম। হেঁটে বৌবাজার দিয়ে দেশপ্রিয় খাবারের দোকানে কিছু খেলাম। খাবার ভাল নয়। ঠক্‌লুম। আজকাল Survival of Soul পড়চি। আজ অমলাদের ওখানে বালিগঞ্জে নিমন্ত্রণ ছিল। গেলুম না। সুরেন ধর এল—সন্ধ্যায়। তার সঙ্গে বসে গল্প করলুম। রাত্রে বসে বসে পড়লুম।

আজ রাত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দেখ্‌লাম খুব। অনেকদিন পরে আজ একটু বর্ষা মত হোল। বাড়ির ওই শরৎ এখনও ভুলিনি—বিশেষ করে বারাকপুর থেকে বনগাঁ নৌকা করে আসা। ছকুর নৌকাতে।

৪ঠা আগস্ট, ১৯৩৪। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্কুলে ছুটির পরে বাসায় এসে বই পড়লুম। আজ কোথাও বেরুতে বা আড্ডা দিতে ইচ্ছে করে না। এবার বাড়ি থেকে ইছামতীর অপূর্ব দৃশ্য দেখে এসে পর্যন্ত এমন হয়েছে। ৪টার সময় নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। নীরদবাবু ঢাকায়। চা খেয়ে গল্পগুজব করা গেল। রাত্রে ট্রামে ফিরি।

৫ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়িতে। চারু রায়, সুধীর, শচীন—ওরা ছিল। চারু রায় লোকটা বেশ। এসে একটু শুয়ে উঠে বঙ্গশ্রী আপিস সেখান থেকে কিরণ রায়ের বাড়ি। আজ আবার সেজ মামা মারা গিয়েচেন খবর পেলাম। গত শনিবার মারা গিয়েচেন। কিরণের বাড়ি থেকে মোটরে গেলুম হাওড়া হয়ে সাঁত্‌রাগাছি। কিরণের বিয়ে সেখানে। ফিরবার পথে ভট্টাচার্যির মোটরে ফিরচি। হাওড়া পুল বন্ধ। বালি ব্রিজ দিয়ে এলাম। পথে কি অপূর্ব দৃশ্য দেখ্‌লাম দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে।

৬ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

ছুটি। এগারোটায় বেরিয়ে প্রথমে Thackers-এর বাড়ি। তারপর ইন্‌কাম্‌ট্যাক্স অফিসে। দেবী সেখানে উদ্ধার করে দিলে। তারপর Imperial Library—বেরিয়ে New York Soda Fountain-এ আইস্‌ক্রিম খেয়ে শেয়ালদ'। ট্রেনে বেল্‌ঘরে। মাসিমাদেরদেখাশুনো করে ফিরবার পথে ননীর সঙ্গে দেখা। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া হোল। সন্ধ্যাতে ফিরে কিছু খাবার খেয়ে পড়তে বসি। সুরেন ধর এল। রাত্রে feast হচ্চে। আমি আজ সারাদিন খাইনি এদিকে।

৭ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

ছুটি। দুপুরে Thackers-এর দোকানে ও পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। Gods সম্বন্ধে দু-একখানা বই পড়ে আজ আনন্দ পেলুম। ভয়ানক বৃষ্টি। ৬টার পরে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে। কেউ নেই। নিখিলদার গাড়িতে বৌবাজার পর্যন্ত এলুম হরিপদ ও আমি। তামাক কিনে বাসায় এলুম।

৮ই আগস্ট, ১৯৩৪।২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কাশী থেকে এক ছোক্‌রা এল দেখা করতে। তারপর এলো—চারু বনগাঁয়ের। রমাপ্রসন্ন এসে সৎসঙ্গের বই দিয়ে গেল। স্কুলে কোলাকে mermaid-এর গল্প করলুম। একটু ঘুমুলাম অবকাশের সময়ে। বঙ্গশ্রী থেকে টিকিট নিয়ে College Sqr.-এ বই দেখে এলুম। তারপর কিরণের বাড়ি। নীরদ সুরেশ একসঙ্গে। সেখানে প্রবোধ বাগচি, সুনীতিবাবু এক সঙ্গে খেতে বসি। সুনীতিবাবুর সঙ্গে জাপানী পাঞ্জাতে হারিয়ে দিলাম। যতীন বাগচি গল্পের জন্যে বল্লেন। আমি আর সুরেশ চলে এলুম ট্রামে। বৌ দেখতে গিয়ে সুধার সঙ্গে দেখা হোল। সে বল্লে আপনার বিয়ে কবে হচ্চে?

আমি বল্লুম রবীন্দ্রনাথের পরে।

রাত্রে অসম্ভব গরম।

৯ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

'God the beautiful'বইখানা স্কুলে নিয়ে গেলাম। আমার মন যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েচে বইখানা পড়ে। স্কুল থেকে ছাদে দুপুরে গিয়ে শরতের অপূর্ব নীল আকাশ দেখ্‌লাম। জগতের সর্বত্র যে beauty তা এবার দেখতে গেলুম। শরতের দুপুরে দূরে দেশের কথা ভাবতে ভাল লাগে। ঘন নীল দিগন্তে কোথায় আমার এই শৈশব জগৎটা। সে যেন স্বপ্নে ফিরে আসে এই সময়টায়। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে বসে থাকবার পরে পশুপতিবাবু গাড়ি পাঠিয়েছেন Y.M.C.A-তে তিমিরবরণের অভ্যর্থনায়। অমলা নন্দীর নৃত্য বেশ লাগল। খুকুর ফটো বেশ হয়েচে। ফিরে এসে অনেকরাত পর্যন্ত গরমে ঘুম হোল না। আকাশে সৌন্দর্য, তারায় তারায় ভগবানের সৌন্দর্য শিল্পের খবর যেন।

১০ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে সুরেন এল। স্কুলে কোলা আসে না। যাবার সময় দেবব্রত ওদের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল—আমায় দেখে ভিতরে গেল। স্কুল থেকে বার হয়ে নিখিলদের গাড়িতে আলিপুর। সেখান থেকে আবার ধর্মতলা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসচি। ভম্বলের সঙ্গে দেখা। পতিতের সঙ্গে দেখা। 'মধুচক্রে' চা টোস্ট খাওয়ালে সুধীরচন্দ্র। পুরোনো বই দেখে বাড়ি এলাম।

১১ই আগস্ট, ১৯৩৪।২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলের পরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণানের বই নিলাম। তারপর নীরদ দাসগুপ্তের flat-এ আসা।

১২ই আগস্ট, ১৯৩৪।২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১। রবিবার

কোথাও না গিয়ে সমস্তদিন পড়াশুনো করি। শরতের অদ্ভুত রৌদ্র উঠেচে। বিকেলে রমেশ সেনের ওখানে গেলাম।

১৩ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১। সোমবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে যাই। দিনটা ভাল। Spirit Unity পড়চি। পথে বিকেলে দেখা আশুর সঙ্গে। সে খাওয়ালে। টেনে নিয়ে গেল College square-এ। সেখানে বিমলেন্দু ধরের সঙ্গে দেখা। তাদের নিয়ে P.C.Sircar-এর দোকানে গেলুম। তারপর square-এ—সে নৌকাডুবি সম্বন্ধে আলোচনা হোল।

১৪ই আগস্ট, ১৯৩৪। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে চা খেয়ে মেসে এলাম। এসে একটু পড়ে গাড়িতে বেলঘরে। সেখানে ছোট মামার সঙ্গে দেখা। দুজন স্টেশনে এলুম। আমি রাত দশটার মধ্যে মেসে। আজ শুনলুম গত সোমবারের আগের সোমবারে বড়মামা [বাদার বাবা] মারা গেছেন।

১৫ই আগস্ট, ১৯৩৪।৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে চুল ছাটি [ছাঁটি]। অনেকে এসেছিল—রমাপ্রসন্নও। তারপর স্কুলে গেলাম। কোলাকে আমড়া খাওয়ালাম। সে কাছে দাঁড়িয়ে গল্প শুনলে। বঙ্গশ্রী হয়ে হেঁটে মেসে। সন্ধ্যায় সুরেন এল। গল্পগুজব হোল। আজ রাত্রে ভয়ানক গরম।

১৬ই আগস্ট, ১৯৩৪। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুলে কোলাকে খুব গল্প করা গেল চেয়ারের কাছে দাঁড় করিয়ে। বঙ্গশ্রী আপিস থেকে বেরিয়ে আলিপুরে ঘুরে এলুম ট্রামে। সজনী আমি ও কিরণবাবু সাঙ্গুভ্যালিতে চা খেয়ে এলুম। তারপর আর একবার বঙ্গশ্রীতে এলুম—সন্ধ্যার সময় হেঁটে বাসাতে। চারু দত্ত বনগাঁয়ে রাত্রে এল।

১৭ই আগস্ট, ১৯৩৪। ৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলাম পরেশ খুড়োর দোকানে। ওরা কাল বারাকপুরে গিয়েচে খোকা ও তার স্ত্রী। তারপর আশুর সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল—কিন্তু আশু সকালেই এসেছিল—তাকে বলেছিলাম আজ আর যাব না। নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে গল্প করলুম রাত আটটা পর্যন্ত। তারপর চলে আসি। বৃষ্টি হোল। রাত্রেও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। ঘরেই শোয়া গেল। রাধাকৃষ্ণানের বইখানা পড়চি Idealist of Life—বড় ভাল লাগ্‌চে। কাল বনগাঁয়ে নিয়ে যাব।

১৮ই আগস্ট, ১৯৩৪। ১লা ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে এল পি পি সরকার। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ২টোর গাড়িতে বনগাঁগেলাম। পথে রাধাকৃষ্ণানের বইখানা পড়তে পড়তে গিয়ে ভারি আনন্দ পেলাম সবুজ মাটির দিকে চেয়ে। বাসায় পৌঁছে—সতীশ মোক্তারের বাসায় ওপারে বেড়াতে গেলাম। তারপর টাউন হলের সামনে জ্যোৎস্না উঠেচে—সেখানে বসে সাবরেজিস্ট্রার, আমি, মন্মথ, হরিবাবু গল্প করা গেল।

১৯শে আগস্ট, ১৯৩৪। ২রা ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এক জায়গায় কেমন চমৎকার নিভৃত কুঞ্জবন যেন। পাখি ডাক্‌চে, সকালের রোদ উঠেচে—লতাপাতায় শেষ রাত্রের বৃষ্টির জল। একটু পরে খুব রোদ উঠ্‌ল—আমি বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গিয়ে more spirit teachings বইখানা নিয়ে আসি। বিভূতির দোকানে বসে একটু গল্প করে বইখানা পড়বার জন্যে বাসায় এলুম। স্নানের সময় মাঠের পথ দিয়ে গেলাম। চমৎকার শরতের রোদ। এক জায়গায় চুপ করে বসে নীল আকাশের দিকে চেয়ে কি আনন্দ যে পেলাম। নদীতে স্নান করলুম। বিকেলের ট্রেনে কল্‌কাতায় এলাম।

২০শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৩রা ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকাল থেকে ভয়ানক বৃষ্টি। এবছরে এরকম বাদ্‌লা হয়নি। স্কুলে সকালে ছুটি হয়ে গেল। এরা Jigsaw puzzzle খেল্‌লে। বঙ্গশ্রী হয়ে আমি প্রবাসীতে গেলুম। সেখান থেকে কৃষ্ণপ্রসন্ন মামাদের ওখানে। বিদ্যাসাগর বাণীভবন। লেডি সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে সব দেখালেন। চা ও নিম্‌কি এনে দিলে সুরবালা বলে একটি মেয়ে। তারপরে Sir P.C.Ray-এর কাছে এলাম College of Science-এ। তাঁর গাড়ি করে ময়দানে গেলুম অনেকদিন পরে ও পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করলুম। তার গাড়িতে ফিরে এলাম। এবেলা আকাশ পরিষ্কার।

২১শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলে কোলা গল্প শুনলে কাছে দাঁড়িয়ে। ছুটির পরে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে ট্রামে ইউনিভার্সিটি গিয়ে বিল দিয়ে চাক্‌তি নিয়ে এলুম। 'মধুচক্র'-এ এসে কিছু খেয়ে তারপরপরিমলের সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বাসাতে। কৃষ্ণধন এসে গল্প করলে রাত্রে।

২২শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৫ই ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

চমৎকার চাঁপাফুল বিক্রি হচ্ছিল—কিনে আনলুম। অনেকক্ষণ ললিতের বাড়ি গিয়ে বসে রইলুম। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী দুটি কোন্ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বার হয়ে গেল। আমি কিছু খেয়ে হেঁটে পুরোনো বইয়ের দোকান ঘুরলাম। তারপর মেছুয়া বাজার থেকে তামাক কিনে আনি। সুপ্রভাদের হোস্টেলে এখন আর কেউ নেই।

২৩শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৬ই ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল গেলাম, সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী। fern নিয়ে সেখানে ওরা খুব হই-চই বাধালে। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে আড্ডা। আমি আর নীরদ হেঁটে College Square-এ আসি।

২৪শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৭ই ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

পরদিন সকালে মাখনবাবু এল ও গিরীন এল কাত্যায়নী বুক স্টলের। স্কুলে সকালে ছুটি হোল। কোলা King Kong-এর গল্প করলে। আমি স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে কিরণের টিকিট নিয়ে এলুম মেসে—সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি বিল আন্‌তে গেলাম। তারা চেক্ দিলে—চেক নিয়ে ট্রমে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি গেলাম। সেখান থেকে P.C.Sircar-এর দোকানে—কারণ চেক্ ভাঙানো হোল না ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে M.C.Sircar-এর দোকানে টাকা ভাঙিয়ে চা খেয়ে?কিন্‌লুম। তারপর আবার বঙ্গশ্রীতে। একখানা বই কিনে মোড়ের দোকান থেকে অনেক রাত্রে বাড়ি।

২৫শে আগস্ট, ১৯৩৪।৮ই ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে ছুটি। ছুটির পরে ট্রামটাতে বঙ্গশ্রী। তারপর নীরদবাবুর ওখানে গিয়ে আড্ডা। পূজার সময় কোথায় যাওয়া হবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক। রাখা মাইন্‌স, জৌনপুট, দীঘা, বারিপদা—এইসব স্থান ঠিক হোল। রাত্রে খুব বৃষ্টি—কিন্তু বেশি রাত্রে চাঁদ উঠল। রাতে সাড়ে ন'টায় বাসায় এলাম ট্রামে। আজ ছোট মামা এসেছিল বিকেলে।

২৬শে আগস্ট, ১৯৩৪। ৯ই ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণির আড়া থেকে একবার গেলুম সীতাদেবীর কাছে। 'মাতৃঋণ' সম্বন্ধে দু একটা কথা জিগ্যেস্ করতে। তারপর ট্রামে বাসায়।

বিকেলে নানাস্থানে পায়ে হেঁটে বেড়াই। 'ছায়া' খুলেচে দেখে এলাম মাণিকতলায়। পথে বৃষ্টি এল—এক জায়গায় দাঁড়াই। রমেশ সেনের দোকানে গেলাম।

২৭শে আগস্ট, ১৯৩৪। ১০ই ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে করুণা এল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে Hans anderson-এর গল্প লিখবো বলে বেড়াতে বেড়াতে নানা দোকানে ঘুরে College Square-এ সরবৎ খেয়ে বাসা। রাত্রে আমি, সজনী, পরিমল S.O.S. Iceberg দেখি ছবিঘরে।

২৮শে আগস্ট, ১৯৩৪। ১১ইভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে গিরীন সোম প্রকাশক এল। স্কুলে কোলা রাগ করে বসে রইল। সকালে ছুটি হোল—বঙ্গশ্রীতে নীরদ এল—সুকুমারবাবু এলেন। ট্রামে প্রবাসী। ব্রজেনবাবু লুচি খাওয়ালেন। আমি কাত্যায়নী বুক স্টলে গিয়ে আরব্য উপন্যাস আনি। গিরীনবাবু চা কেক্ খাওয়ালে। তখন ভয়ানক বৃষ্টি এল। ওদের ঘরের মধ্যে বসে গল্প করি। বৃষ্টি থাম্‌লে বাড়ি। রাত্রে ভয়ানক গরম ও বৃষ্টি।

২৯শে আগস্ট, ১৯৩৪। ১২ই ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

সকালে বীরেশ্বরবাবুর পত্রে জানলাম তিনি আমার বই হারিয়ে ফেলেচেন। স্কুলে কোলার সঙ্গে মনান্তর হোল। Thackers-এর ওখানে গেলাম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে বসে রইলাম। সজনী এল না। হেঁটে বাসায় এলাম। Scottish-এর জন কতক ছাত্র স্কুলে গেল [।] কাল তাদের সেখানে যেতে হবে।

[অনেকদিন আগে এই দিনটিতে আমি কতক্ষণ সার্থক দাদাদের বাড়ি বসে।]

৩০শে আগস্ট, ১৯৩৪। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে আশু এল—তার কাব্য, 'প্রান্তরলক্ষ্মী' এবার বেরুচ্চে—প্রবাসীতে। স্কুলে কোলা ক্লাসের ছেলেদের কাছে বল্‌চে আমি তার সঙ্গে কথা বলব কিনা। ১॥টার পরে স্কুল থেকে বার হয়ে বৈঠকখানার বাজারে জিনিস কিনি। তখুনি স্কটিশ চার্চ কলেজের ছেলেরা এল। তাদের গাড়িতে কলেজে গেলুম। সেখানে বক্তৃতার পরে professor-দের সঙ্গে বসে চা ও জলযোগ করা গেল। তারপর তাদের গাড়িতে বাসা। ট্রেনে উঠে বেশ লাগ্‌ল। খুব বেলা পড়েচে। সবুজ গাছপালা চারিধারে—অনেকদূর পর্যন্ত মাঠ সবুজ। পথে গাড়ি খালি হয়ে গেল—একা অন্ধকার রাত্রে চেয়ে বসে থাকি। হেঁটে বাসায় এলাম। গাড়ি নেই স্টেশনে। ক্লাবে কে একজন গান করচে। শুনতে পেলাম।

৩১শে আগস্ট, ১৯৩৪। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে সুন্দর রোদ। বর্ষাকাল বলে মনেই হয় না। তারপরে খয়রামারি সকালে বেড়াতে গেলাম। গাছেপালায় রোদ—সেই ঝোপটায় ভায়োলেট্ রঙের বনকলমী ফুল ফুটেচে। রৌদ্রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম ঝোপটার কাছে। প্রজাপতি উড়চে—এখানে ওখানে কি সুন্দর দৃশ্য! তারপর নদীতে স্নান করেও খুব আনন্দ। বৈকালে মেলা দেখ্‌লাম আমি ও সাব্ রেজিস্ট্রার বাবু। সন্ধ্যায় বীরেশ্বরবাবু বিনয়বাবু ও আমিPlanchet করা গেল।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪।১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে বারাকপুর গেলাম। বেশ শরতের রোদ, ছাতি নিয়ে যাইনি। খুকুদের বাড়ি দুপুরে খেলাম। তাস খেলা করি আমি, খুড়িমা, ন'দি ও খুকু। কালো ওখানে নেই। তার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন কাকা। দুপুরে সামান্য একটু বৃষ্টি হোল। আমি বেলা পড়লে সুনীল আকাশের তলা দিয়ে চলে এলাম বনগাঁয়ে। সন্ধ্যা হবার আগেই এলাম। ক্লাবে বসে বিনয়বাবু, বিজনবাবু ও আমি গল্প করি।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে খয়রামারি বেড়িয়ে এলাম। তারপরে ছ'ঘরে বেড়াতে গেলাম—কালোর সঙ্গে দেখা হোল। তারপর...? বাবুর বাড়িতে গেলাম আমি ও সাব রেজিস্ট্রার। বিকেলে কালো ও আমি স্টেশনে এলাম। আজ শরতের আকাশ কি সুন্দর—সারা পথটা ভাল লাগ্‌ল।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে লিখি ও চুল ছাঁটি। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে নীরদের সঙ্গে College Sqr. [—]সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল সেখানে। চা খেয়ে বাসায় ফিরি।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলের পরে বঙ্গশ্রী আপিস হয়ে নীরদ দাশগুপ্তের flat-এ। পূজার প্রোগ্রাম ঠিক করা হোল সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। তারপর বার হয়ে হেঁটে এলাম College Square-এ। পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৯ই ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

সকালে 'পাঞ্চজন্য' এসে গল্প নিয়ে গেল। স্কুলে যাবার আগে ভীষণ মেঘ করলে—বৃষ্টি হোল না। দেবব্রতের সঙ্গে পথে দেখা হোল। স্কুল থেকে বার হয়ে প্রথমে কাকার বাসায় গিয়ে চা ও পাঁপরভাজা খেলাম—সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে P.C.Sircar [—]তারপর বাসা।

P.C.Sircar-এর সঙ্গে 'যাত্রাবদল' বইয়ের terms ঠিক হোল।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২০শে ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব ঘন মেঘ করে ঝড় উঠ্‌ল—বৃষ্টি হোল সামান্যই। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন—খুব interesting philological discussion হোল। শুক্ল যজুর শতপথ রুদ্রার স্তোত্র।

হেঁটে বাড়ি এলুম। কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা পথে। হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারের কৃষ্ণ।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪।২১শে ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে টিফিনের পরে বেরিয়ে উদয়ন আপিসে গিয়ে গল্প দিয়ে আসি। তারপরে উদয়ন আপিস যেতে যেতে ছোটখাটো গলিঘুঁজি খোলার বাড়ি দেখে মনে একটা মধুর ভাব হচ্চিল—যা অনেকদিন আগে ক্লাইভ্ স্ট্রীটে বেড়াতে বেড়াতে হয়েছিল বিনয়বাবুদের আপিসের সাম্‌নে দিয়ে যেতে। দুটোই এক ধরনের। আমারই মনের কল্পনা, বাইরের উপকরণ তার আয়োজন মাত্র। উদয়ন থেকে এসে আবার স্কুলে পড়ালুম। তারপর বঙ্গশ্রীতে আড্ডা। হেঁটে বাড়ি। আশু সান্যাল বাসায় এসে ধরে নিয়ে গেল মধুচক্রে। ফল, সরবৎ পুডিং খাওয়া গেল। ফিরে এসে লিখি। বনগাঁয়ের চারু দত্ত এল রাত্রে।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে কোলার সঙ্গে ঝগড়ার অবসান হোল। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিয়ে নীরদ বাবুর flat-এ গেলাম। তার আগে গেলাম Imperial Library-তে— রাধাকৃষ্ণানের বই দিয়ে এলাম।

গঙ্গানন্দপুর লাইব্রেরিতে সভাপতি হতে বলেচে এসে দেখি।

রাত্রে ভাল ঘুম হোল না গরমে।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণির বাড়ি।

দুপুরে অমিয় এল শ্রীরামপুরের। লিখ্‌লাম বসে। সন্ধ্যার সময় একটু বেড়াতে গেলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

স্কুলের আগে পি সি সরকারের ছেলে এল। আমি উদয়নে গেলুম—সেখান থেকে স্কুলের পরে কোলা ও আমি পোলোক স্ট্রীটে যাবো বলে বেরুই [—] ক্ষীরোদের বাড়িতে ডাক্‌লে—দুজনে চা খেলুম। বেরিয়ে বঙ্গশ্রী।

তারপরে সেখান থেকে হেঁটে বাসা। পথে মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা—বল্লে 'সোনার কাঠি' বইখানার রিভিউ করে দিতে। বাসায় এসে মৌচাকের গল্প লিখি। এখন বড় ব্যস্ত। পূজার মরশুম পড়েচে।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪।২৫শে ভাদ্র, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে স্কুলে ছুটি হয়ে গেল G.C.Ghosh-এর মৃত্যুর জন্যে। বঙ্গশ্রীতে এসে নিখিলদার গাড়িতে প্রবাসী আপিসে গেলুম। কেদারবাবুকে টাকার কথা বলে গাড়িতেই সুধীর সরকারের দোকানে এসে মৌচাকের গল্প দিলাম। তারপর কিছু খাবার খেয়ে ট্রামে midday fare-এ উদয়ন—সেখান থেকে হেঁটে বঙ্গশ্রীতে। আবার নিখিলের গাড়িতে প্রবাসী এবং ব্রজেনদাকে সঙ্গে নিয়ে পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দিরে। সেখান থেকে আমার বাসার সাম্‌নে দিয়ে মোটরে বিভূতিদের বাড়ি ও সেখান থেকে নন্দরাম সেনের গলি প্রসন্নদের বাড়ি। মোটরে নিখিলদা নামিয়ে দিলে College Square-এ. পি. সি. সরকারের দোকানে।

৩২ বছর পরে নন্দরাম সেনের গলির সেই ঘরটাতে বসে জল ও খাবার খেলুম। মাখন এল। প্রসন্ন তামাক সাজ্‌লে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলে কোলা আসেনি। ওখান থেকে বার হয়ে থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে বই পড়লুম। সেখান থেকে একবার কার্জন পার্কের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি অপূর্ব একটা শোভা দেখলাম। ফিরে আবার বঙ্গশ্রী আপিসে

আস্‌বার পথে গিরিজা স্যাঙ্গুভ্যালিতে চা খাওয়ালে। বঙ্গশ্রীতে এসে সজনী কবিতা শোনালে, খুব জোরে হেঁটে বাসা। আজ মনে একটা কেমন আনন্দ!

রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে বসে কত কথা ভাবি। God Consciousness-এর দিকটা জাগরিত হয়েচে দেখতে পাচ্চি।

'গৃহিণী প্রিয় শিষ্যা'শ্লোকটা অনেকদিন পরে মনে একটা অদ্ভুত ভাব জাগালে।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। রামবাবুর সঙ্গে এসে টিকিট নিই। তারপর উদয়ন।...? দেবীর গাড়িতে কলেজ স্কোয়ার। সেখান থেকে বাসা।

শরৎ [,] তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি। গানটার ভাব অনেকদিন পরে মনে এল।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে কেউ নেই—বার হয়ে আস্‌চি— মণীন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে E.I.R. Booking Office-এ গিয়ে বখ্‌তিয়ারপুরে যাবার দিন স্থির করলাম। তারপর হেঁটে বঙ্গশ্রী। দেবীর সঙ্গে দেখা। দেবী নিয়ে গেল নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে। সেখান থেকে থিয়েটারে গেলুম যোড়শী দেখতে। রাত ২॥০টাতে ফিরে ঘুমুই।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে লিখে স্নান করে খেয়ে তৈরি হয়ে বেরুলাম। ট্রামে স্কুলে এসে লেখা দিলাম হরিবাবুকে। সজনীকে লেখা দিলাম। নীরদবাবুর flat-এ এসে জানালাম দিল্লি যাচ্চি। টিকিট কিনে সোজা হাওড়ায় এসে গাড়ি চড়লাম। প্রথমে ছিল মেঘ। বর্ধমান ছাড়িয়ে ঘোর বৃষ্টি—সারাপথেই বৃষ্টি। মধ্যে মধুপুরের কাছে একটু রৌদ্র উঠল। অনেকদিন পরে ঝাঁঝাঁ দেখলাম—কিউলের ওদিকে জলে ভেসে গিয়েচে। বখ্‌তিয়ারপুরে নেমে পুঁটিদিদি নেই। কালী গিয়েচে পাটনায়। অনেকক্ষণ পরে এল—রাত ২টা পর্যন্ত ওদের বারান্দাতে শুয়ে গল্প করি। অনেককাল পরে এখানে এলাম। বাংলা থেকে বিহারে। বেশ লাগচে।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১। রবিবার

বখ্‌তিয়ারপুরে স্নান করে খেয়ে বিশ্রাম করি। বিকেলে বেড়াতে বার হয়েচি। কি অপূর্ব প্রখর চক্রবাল। তালবন দ্বারা সীমাবদ্ধ—কতদুর মন চলে যায়। বাংলায় এরকম নেই। ঠিক নীল আকাশের তলে সে কি অপূর্ব দৃশ্য। বিহারের পথে ধোয়া নদীর পুলের ওপর বসে লিখ্‌চি। সামনে ও পিছনে ধু ধু করচে উদার উন্মুক্ত প্রান্তর। যেদিকে চাও সোজা সোজা তালের সারি। বাংলাদেশে এ জিনিস নেই। মাথার উপর নীল আকাশ—পশ্চিমে পিঙ্গলবর্ণ মেঘ—বাংলাদেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি—তালের মাথাগুলো দেখা যাচ্চে—মন যেন ছড়ায়নি অনেকদিন। এই সন্ধ্যায় কত কথাই মনে পড়চে আজ।? কথা অশান্ত মনে হয়। সুপ্রভা ও খুকুর কথা মনে আস্‌চে। নিচে ধোয়া নদীর ঘোলা জলে কল কল শব্দ হচ্চে। অপূর্ব শান্ত সন্ধ্যা—দূরে বামে রাজগিরির নীল পাহাড়শ্রেণী—এই মগধ—এই রাজগৃহ, বুদ্ধের চরণরেণুমৃত [অমৃত] আশ্রিত রাজগৃহ।

কালী পিছিয়ে পড়েচে—জবা পিছিয়ে পড়েচে। আমি দোকড়ি পশু এসেচি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৪১। সোমবার

সকালে স্নান করে পশু চা ও খাবার এনে দিলে খেয়ে তৈরি হলাম দিল্লি এক্সপ্রেসে যাবার জন্যে। কালী আমার হাতের লেখা একখানা চিঠি দেখালে ১৯১৭ সালে College Hostel থেকে লেখা—তারিখ ২২-৯-১৭। লিখ্‌চি পুজোর সময় শ্বশুরবাড়ি যাবো। কচাকে নিয়ে যাবো। এরা সবাই এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সেকেন্ড ক্লাস হলেও গাড়িতে লোক অনেক। পথে খুব ঘনঘটা করে এল—ঘোর বৃষ্টি। শোন ও গঙ্গার জল বেড়ে মাঝে মাঝে গ্রামগুলো জেগে আছে—খোলার বাড়ি আর মাটির দেয়াল, জলে ভিজ্‌চে—গরু বাছুর

awful ব্যাপার। ঝাঁ ঝাঁ ও শিমুলতলার মধ্যে পাহাড় জঙ্গল জলে ভিজ্‌চে—ঝোপ দেখলাম দু-একটা, পাহাড়ি নদীগুলো সঙ্গেই ছুটে চলেচে —ঘাসের তীর যেন জল ছুঁয়ে রয়েচে। আসানসোলে কিছু খাওয়া গেল। সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছুই। ওদিকে অত বৃষ্টি—এদিকে তেমন বৃষ্টি হয় নি। সন্ধ্যাবেলা আশু সান্ন্যালের সঙ্গে মধুচক্রে গিয়ে সরবৎ খেয়ে এলাম। ঘুম পাচ্ছিল—সকালে সকালে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১লা আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ছুটি হোল—বঙ্গশ্রীতে বহুক্ষণ কাটানো হলো। মনোজ, মণীন্দ্রলাল [,] নীরদ সবাই এল। সুকুমার বাবুও। সন্ধ্যার সময় এলাম বাড়ি।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ২রা আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

স্কুলের যাবার আগে মহিমা ও গিরীন এল। স্কুলের পরে বঙ্গশ্রীতে আড্ডা। বেজায় বৃষ্টি আজ।

কোলার সঙ্গে ঝগড়া হোল। পথে আজ দেবব্রতের সঙ্গে গল্প হয়েছিল।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৩রা আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুলের আগে খুব বৃষ্টি এল। পথে একবার রোদ—আবার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই স্কুলে গেলাম। এবার বোধহয় পুজোর সময় বর্ষা হবে। কোলার সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেল। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে সজনীর সঙ্গে টাকার কথা বলে দিলাম। তারপর বার হয়ে ট্রামে স্ট্র্যান্ডে নেমে হাওড়াপুল পার হয়ে ট্রেনে শ্রীরামপুর। দিদিদের বাড়ি গিয়ে বাইরের ছাদে বসলাম। চাঁদ উঠেচে—নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ, মাধবীলতার গন্ধ আসচে। আর এক দিদির কথা মনে পড়ল এই শ্রীরামপুরেই। ১২/১৪ বছর আগে কত আনন্দেই সেখানে আস্‌তাম। খুকি আমার খোঁজ করেছিল মাসখানেক আগে নীলাদি বল্লেন। খেয়ে গাড়ি করে College-এ যাই। সেখানে রমণ সাহেবের সঙ্গে দেখা হোল। ত্রিগুণাবাবু আমার সঙ্গে স্টেশনে এসে তুলে দিয়ে গেলেন ট্রেনে। বাসে এলাম। বারান্দাতে খুব জ্যোৎস্না। বেশ খুব ঘুম হোল।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

আজ শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না—মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাব হোল। বাল্যের কথা মনে হোল। চাপড়া ষষ্ঠীর কথা মনে এল কি জানি কেন—এরা চাপড়া ষষ্ঠী করতেন নদীর ঘাটের পথে খেজুরতলাটাতে—সেই দিনের কথা মনে এল।

কোলার সঙ্গে কথা হোল। সে এল ওপরের ঘরে। স্কুল থেকে নীরদবাবুদের flat-এ। সুশীলবাবুও এলেন। সেখান থেকে হেঁটে বাসা।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণিদের বাড়ি। মোটরে চৌরঙ্গি পৌঁছে দিলে। সেখান থেকে বাসা। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দৃষ্টিপ্রদীপের মালতীর অধ্যায় Revise করি। বিকেলে হেঁটে শ্যামবাজার যাবার পথে Duff Church-এ প্রার্থনা শুন্‌লাম। হেদোতে গিয়ে দেখি পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে। মনে কেমন অপূর্ব ভাব হোল। তারপর নীরদের বাড়ি গেলাম। নীরদের স্ত্রী ওদের নবজাত শিশুকে দেখালে। ট্রামে নীরদের সঙ্গে পঞ্চানন বাবুর বাড়ি এলাম মুক্তারাম বাবু স্ট্রীটে। সেখান থেকে ইনস্টিউটে [ইনস্টিটিউটে] কি একটা নাচ হচ্চে দেখেসরবৎ খেয়ে বাসা। খুব বারান্দা ভরা জ্যোৎস্না। আকাশ নির্মল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে নিখিলদার গাড়িতে উদয়ন আপিসে—সেখান থেকে স্টুয়ার্ট কোম্পানির দোকানে বড় দেরি হোল। আবার উদয়নে। সেখানে টাকা নিয়ে হেঁটে বৌবাজারে কাপড় কিনে বাসা।

তারপর বিমল এল কলেজে বক্তৃতার জন্যে বল্‌তে। বুলবুলের সম্পাদক এল লেখা নিতে। ওবেলা কলেজের ছেলেরা এসে শ্রীহর্ষের জন্যে লেখা নিয়ে গিয়েচে।

আজ হাওয়া কম। গরম।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে সুকুমারবাবু ও সজনীর সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত নিয়ে কথা হোল। ট্রামে পার্ক সার্কাস [—] মণীন্দ্রলালের ওখান চায়ের নিমন্ত্রণে। একজন বিলেত থেকে এসেছে সে? রাতে থাক্‌বার জায়গা পায়নি তাই বলছিল। ওখান থেকে ট্রামে কাত্যায়নী বুক স্টলে। চা খাওয়ালে সেখানেও। ঘোর বৃষ্টি মাথায় হেঁটে বাসা। এসে দেখি শ্রীহর্ষের proof দিয়ে গেছে। বাড়ি এসে Thomas Mann-এর Mario and the Magician পড়লুম।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—কোলাকে গল্প—যেন নতুন চোখে দেখ্‌লাম।...?

বঙ্গশ্রী থেকে নীরদের সঙ্গে চারুবাবুর বাড়িতে গিয়ে চা ও খাবার খেয়ে গালুডি সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। তারপর ট্রামে বাসায় আসি। রাত ভাল, তবে বড় গরম।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

কোলার সঙ্গে খুব ভাব আজকাল। স্কুলে একজন হঠযোগী এসে কাঁচের গ্লাস খেলেন। স্কুল আজকাল বেশ লাগে। ক্লাসে পড়ালেই যায় ভাল। প্রসাদ আছে। কোলা আছে—স্কুলের মধ্যে এই দুটো ছাত্রই ভাল। ওদিকে সতীন ও শচীন মুস্তাফী কবিতা খুব ভাল বোঝে।

বঙ্গশ্রী থেকে আমি আর নীরদ M. c. Sircar-এর দোকানে এসে বই নিয়ে তারপর বাসায় এসে...? পড়লুম।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১১ই আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার।

সকালে সুরেন, শৈলেন আর কাত্যায়নী বুক স্টলের লোক এল। সুধীর চৌধুরী আর মণীন্দ্রলাল এসে নিমন্ত্রণ করে গেল ওবেলা। স্কুলে ছেলে দুটোকে হেডমাস্টার নাকখত দেওয়ালে [ভবেন আর প্রভাস]। স্কুল থেকে বার হয়ে বঙ্গবাসী কলেজে গেলাম। কলেজে বক্তৃতা হোল। তারপর প্রিন্সিপ্যাল প্রশান্তবাবু ও শ্যামাপদ, কৃষ্ণধন একসঙ্গে বসে চা সিঙ্গাড়া খাওয়া গেল। আমি আর কৃষ্ণধন ফিরে আস্‌চি পথে আর একদলের সঙ্গে দেখা। বাড়ি এসে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম করেই স্টার থিয়েটারে গেলুম বিভূতিদের থিয়েটার দেখতে। মন্টু কি একটা সাজ্‌চে। ট্রামে চলে এসেই পার্কসার্কাস। সব সময়ই কোলার কথা মনে হয়। তারপর—গেলুম কালীদাস [কালিদাস] নাগের বাড়ি সীতা দেবীর বিবাহস্মৃতিবাসর। খুব ফুলে ভরা। অশোক ও কেদারবাবু এলেন সম্পাদক। ওঁদের সঙ্গে আলাপ হোল। গান হোল। খাওয়া দাওয়া হোল। কেদারবাবু ও কালিদাসবাবুতে মিলে আমায় খাওয়ালে। একটু বেশি। অশোক সিগারেট খাওয়ালে। আমার ভিটের কথা মনে পড়েচিল আজ কেবলই। এই শরতে...?

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

সকালে মহিমা ও মন্মথ এল।

দুপুরে একটুখানির জন্যে স্কুল। কোলা কেমন ঘাড় কাত করতেই তাকালে। তারপর বঙ্গশ্রীতে গিয়ে সজনীর কাছ থেকে National Geographical নিয়ে এলুম। বাড়িতে একটু ঘুমিয়ে উঠে লিখলুম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সুরেন এল—ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম P.C.Sircar-এর দোকান—সেখান থেকে রমেশ সেন—সেখান থেকে ফিরবার

পথে College Square-এ সরবৎ খেয়ে দুজনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে কত পুরোনো কথা আবৃত্তি করলুম রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর বাড়ি। একটু sadness ছিল—সবাই বয়সে বেড়ে যাচ্চে দেখে—ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেল—আমার সেই লেখা যেন আবার ফিরে এল।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণীন্দ্রলালের বাড়ি। মোটরে বউবাজার—সেখান থেকে হেঁটে বাসা। খেয়ে ঘুমুতে যাব—পশুপতিবাবু এলেন—তিনি রইলেন দুটো পর্যন্ত। তারপর আমি ঘুমিয়ে উঠে যাই নীরদবাবুর বাড়ি। রাখা মাইন থেকে পত্র আসেনি [।] সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে মুর্গা কিনে চলে গেলুম।

Death in Venice পড়লুম রাত্রে।

১লা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

সকালে কেউ আসেনি। স্কুলে বেশ কাটল [—] কোলা আজকাল বড় আনন্দ দিচ্চে—এখানেও। স্কুল থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে প্রেমেন, নৃপেন, পরিমল। আমি বেরিয়ে ধর্মতলার মোড়ে মুড়ি কিনে পরিমলকে দিলুম। তারপর ভাবলুম বেড়াবো। হাঁটতে হাঁটতে কর্জন পার্কে এসে টরুর সঙ্গে দেখা হোল। অনেকক্ষণ গল্প করি। একটা ঝোপের কাছে ঘাসের ওপর বসে। তারপর হেঁটে College Square-এ। P.C.Sircar-এর দোকানে proof দিতে এলুম। বাড়ি এসে ঈশ্বরের নামে এখন একটা...? বোধ করলুম—যা অনেকদিন করিনি। পৃথিবীতে কতবার আসবো—কতবার Childhood পাব ওই থেকেই ওর উৎপত্তি। কোলার কথা কতবার মনে হয়েছে, আজ কেবলই। রাত্রে কৃষ্ণধন এল—গল্পগুজব হোল।

২রা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে গিরীনবাবু এল কাত্যায়নী বুক স্টলের [—] ওর সঙ্গে বই সম্বন্ধে কথা হোল। আজ সুধীর চৌধুরী ও মণীন্দ্রলাল ওর ওখানে খাবে ওবেলা বলেচে। স্কুল থেকেবঙ্গশ্রী অল্পকাল গেলুম। সেখানে এলেন সুনীতিবাবু। কোলা বড় আনন্দ দিচ্চে আজকাল—তার কথা ভাবি প্রায়ই। কি অপূর্ব আনন্দই দিচ্চে সে। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়—সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যায়। কি মুশকিল! বঙ্গশ্রীতে বসে আছি—খুব মেঘ ও ঝড় উঠল। আমি বেরিয়ে কিছু খেয়ে ফিরচি [—] রাধারমণের সঙ্গে দেখা। চা ও চপ খাওয়ালে। তারপর বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে সুধীর সরকারের দোকানে। চারু রায় ও গিরিজাবাবু এল পুরী ও বৃন্দাবনের adventure-সব গল্প করলে। পি সি সরকারের দোকান হয়ে বাসা। রাত্রে শুয়েচি বীরেন অরুণ ও প্রসাদ এল। অনেক রাত পর্যন্ত রইল।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

সকালে মেঘান্ধকার। স্কুল। ব্রহ্মানন্দের হঠযোগ প্রদর্শিত হোল। কোলা বসে অনেকক্ষণ—ও বল্লে আপনি যাতে নিয়ে যাবেন, যা করাবেন, আমার করতে আপত্তি নেই। হঠযোগের ক্ষমতা অসাধারণ বটে। প্রবাসীতে গেলুম—সেখান থেকে জগত্তরণ দাসের বাড়ি। College Sqr.-এ এসে বহুকাল পরে চপলাদেবীর ভাই ফণি চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হোল। Stendhal কি বলেচেন, ইটালীর হৃদ সম্বন্ধে সেটাও দেখলুম।"Stendhal"—the great writer and lover of beauty"[।]পি সি সরকারেরদোকান থেকে বাসা। একবার আট-আনা বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম পূজার সময় সেকথা মনে পড়ল। এবার আর সেদিন নেই।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১।বৃহস্পতিবার

দেবব্রতের সঙ্গে দেখা। স্কুল। সেখান থেকে নীরদবাবুর বাসা। রাখামাইন যাওয়া ঠিক হোল। Sauzer সাহেবের পত্র এসেচে। কাল আবার গিয়ে সব কথা ঠিক হবে।আজ জগৎ বাবু Ivanhoe সংক্রান্ত বই পাঠিয়ে দিয়েচে অনুবাদের জন্যে।

৫ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪১।শুক্রবার

সকালে এল পি সি সরকারের সেজভাই ও গিরিনবাবু। স্কুল থেকে নীরদবাবুর বাড়ি। ট্রামে College Square [—]কাপড় কিনি ইস্টবেঙ্গল সোসাইটিতে। সেখান থেকে বাড়ি।

৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

স্কুলে গেলাম সকালেই—পি সি সরকারের ছেলে এল। সকালে স্কুল থেকে বার হয়ে—কাপড় বদলে নিয়ে ২টার গাড়িতে বনগাঁয়ে এলুম। আজ মহালয়ার ছুটি হবে। সুসার কাকার বাসায় গিয়ে কাপড় দিলে। বনগাঁয়ে রামদাসের সঙ্গে দেখা হোল। আমি গোপালনগরে—বাড়িতে গোপালনগরে নামি। বাজারে বসে জল খেয়ে কাছারিতে শ্যামাচরণদাদাকে বলতে গেলুম বক্তিয়ারপুরে যাবার কথা। সেখান থেকে বাড়ি। খুকু দাঁড়িয়েছিল দাওয়ায়। মাদুর পেতে গল্প করা হোল খুড়িমাদের সঙ্গে। গল্প শুন্‌তে এল জগো ইত্যাদি।?গল্প করি। খুকু ডাক্‌তে গেল—যখন আমি পাঁচীদের বাড়ি বসে আছি। খেয়ে তাসখেলা হোল ও বাড়িতে।

৭ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৬ শে আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে কচার বাড়িতে গল্প করি। তাকে বল্লুম—Ivanhoe-এর বাংলা লিখে দেব। স্নান করতে গিয়ে আমি ও পাগ্‌লা ও পাড়ার ঘাটে নাইতে গেলুম। খরস্রোতা নদী, অত্যন্ত জল বেড়েচে—জলের ধারে ধারে কুঁচ গাছ—গাছের ডালপালা ঝুঁকে আছে। সাঁতার দিয়ে এমন আনন্দ কখনও পাইনি। এ যেন ইছামতীই নয়। ও পাড়ার ঘাটে ননী মাস্টার বসে আছে। খেয়ে শুয়েচি—ওরা গল্প শুন্‌তে এল। তারপর উঠে বসে খুড়িমার সঙ্গে গল্প করি। তারপর রামের নৌকাতে ইছামতী দিয়ে বনগাঁয়ে এলুম। পরিপূর্ণ ইছামতীর শোভা দেখে মুগ্ধ হোলাম। আকাশের কি রং। কি গাছপালা ঝোপঝোপ—জলের ধারে নত হয়ে আছে! কি আকাশের সুনীল শরতের রং, কি অস্তগামী সূর্যের কিরণমালা! ফিতের আড়তে...ও বীরেশ্বরবাবুর বাড়ির মধ্যে বসে গল্প করি, আমি ও বিনয়বাবু।

৮ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২১শে আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

বনগাঁয়ে প্রথমে বীরেশ্বরবাবুর বইখানা পড়ি। তারপরে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি গেলুম আড্ডা দিতে। বারাকপুরের হাজারী ঘোষ সেখানে। বিকেলে জগদীশবাবুর বাড়ির নিমন্ত্রণ। নদীর জলে স্নান করে ভারি আরাম হোল। বৈকালে আমি আর ধীরেন একসঙ্গে কলকাতা এলুম।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২২শে আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

Busy day, যতকাজ সব আজ। স্কুলে যাবার পথে বঙ্গশ্রী—সেখানে চা ও ডিম খেয়ে সজনীর কবিতা শুনে স্কুল। কালোকে অনেক কথা বলি। সকালে বার হয়ে আবার বঙ্গশ্রী—সেখান থেকে প্রবাসী—তারপর বরেন্দ্র লাইব্রেরি, শ্রীগুরু লাইব্রেরি—তারপর ট্রামে নীরদবাবুর Flat-এ চা খেয়ে গল্প করে ট্রামে আবার M.C ও P.C.Sircar [—]আজ সারাদিন খাইনি। রাত্রে সরবৎ খেয়ে ও বই নিয়ে বাসায়।

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪১। বুধবার

সকালে প্রবাসীতে গিয়ে টেবিলের ওপর স্লিপ রেখে এলুম। স্কুলে যাই ট্রামে। কোলা খুব কাছে এসে দাঁড়ায়—কাল বলেচে আমাদের বাসায় যাবে। ছেলেরা খাওয়াবে। স্কুল থেকে ট্রামে প্রবাসী। চেক্ নিয়ে রমেশ সেন। হীরু চা খাওয়ালে। বৈকালে ফুটপাতের লোকের ভিড়, দোকানে দোকানে কাপড় কিন্‌চে। আমার মনে পড়ল এইসব পুজোর দিনে বারাকপুরের ভিটাতে শৈশবে বাবার অসুখ করতো, কি উদ্বেগ ও নিরানন্দই [নিরানন্দেই] কাটতো। আজ টাকা তো আস্‌চে। M. C. Sircar। P. C. Sircar-এর ওখানে মনোজ বসে। নরেনের সঙ্গে দেখা, গল্প করতে করতে বাসা।

১১ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

কাল রাত্রে খুব গরম। রাত্রে শুয়ে Hansa League-এর স্বপ্ন দেখেচি কেবলই। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙল। Orion জ্বল জ্বল করচে ঠিক মাথার ওপরে। তখনও বেশ রাত আছে। মনে পড়ল শৈশবদিনের কথা। কি

শান্তভাবে সবকথা মনে আসে। ভগবানেরআসন ঐ নক্ষত্রবীথিতে—আজ স্কুল বন্ধ হবে—কি যে আনন্দ—মনে যেন রাখতে পারিনে। ছুটি হয়ে গেল কালো এল আমার সঙ্গে পেন্সিল কিন্‌তে। ওরই সঙ্গে ট্রামে বেরিয়ে আমি গেলুম নীরদবাবুর flat-এ [—] যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক কর্তে। সেখান থেকে ট্রামে M. C.-তে গিয়ে বই ও P.C.তে গিয়ে প্রবাসীর চেকের দরুন টাকা নিলুম। জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা—সে ট্রামে তুলে দিয়ে গেল—আমি গেলুম গিরীনবাবুর ওখানে। সেখান থেকে চা খেয়ে জগৎদাসের বাড়ি। সেখানে খাবার খাওয়া। হেঁটে বাসা। সারারাত ঘুম হোল না—কি ভয়ানক unearthly heat! দুজনে স্বামী-স্ত্রী পাশের ছাদে সারারাত গল্প করে আরও ঘুম হতে দিলে না।

১২ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে Ivanhoe পড়ে কাটল—তারপর Imperial Library-তে গেলুম বই আন্‌তে—বই পেলাম না। Wide World খুঁজে না পেয়ে ট্রামে P.C. —সেখান থেকে বাসায় এসে কালকার দ্রব্যাদি গুছিয়ে রাখি। প্রবাসীর টাকাটা নিয়ে আসি P.C.-র কাছ থেকে।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪১। শনিবার

সকালে স্নান সেরে খেয়ে নীরদবাবুর flat-এ ও দ্রব্যাদি নিয়ে ট্যাক্সিতে রওনা হাওড়া স্টেশন। মাঝে মাঝে সেকেন্ড ক্লাসে। মাঝে মাঝে ইন্টার ক্লাসে...? এলুম। প্রমোদবাবু উঠলেন খড়্গপুরে। রাখামাইনে নেমেই নীলঝর্ণায় বেড়াতে গেলুম। হেমন্তের অপূর্ব বৈকাল। এত ভাল লাগ্‌ছিল—কেমন অপূর্ব রোদ চারিদিকে। বেড়িয়ে ফিরে এসে অনেকরাত পর্যন্ত আড্ডা দিলুম।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে ৪নং Shift-এ বেড়াতে গেলুম। বনতুলসী জঙ্গলের অপূর্ব সুঘ্রাণের মধ্যে দিয়ে খররৌদ্রে নীল আকাশের তলে পাহাড়ের সানুতে পিয়ালী গাছের ছায়ায় কতক্ষণ বসে রইলুম। ফিরে আসার পরে দুপুরে মেঘ করে বিকেলের দিকে খুব বৃষ্টি শুরু হোল—সারারাত—ঝমঝম বৃষ্টি—একসময় ভাবলুম—দূরে কালাঝোড় পাহাড়ের দিকে চেয়ে আজ সেই...? সন্ধ্যা বেলা—একটা ছোট্ট গ্রাম্য নদীর কথা মনে হোল—কতকাল আগের কথা সে সব। সব মুছে গিয়েচে। একদিন সেই সন্ধ্যা পরম সত্য ছিল জীবনে। তার জীবন দিয়ে সেই সন্ধ্যাটি সে আমার মনে অক্ষয় করে রেখে দিয়েচে।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪১। সোমবার

সকালে খুব বৃষ্টি। শুয়ে শুয়ে শুন্‌চি প্রমোদবাবু বলচেন—ওই দেখুন রৌদ্র উঠেচে। তারপর সত্যিই বৃষ্টি একটু থামল। আমি উঠে বাংলোর পিছনের পাহাড়ের পিয়ালতলার ছায়ায় শিলাখণ্ডে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসেছিলুম। সিঁড়ি দিয়ে একটা hedge-এর ওপর রৌদ্রে—মেঘভাঙা রোদে কতক্ষণ বসে রইলুম। বার হয়ে পাট্‌কিটার জঙ্গলের পথে ঘুরে এলুম। এক জায়গায় একটা ঘন বন, একটা ছোট পাহাড়িনদী—সেখানে বাঘ থাক্‌তে পারে ভয় হোল। পাহাড়ের saddle দিয়ে যখন যাচ্চি ঝমঝম করে বৃষ্টি এল—হাজার বনস্পতির পাতায় পাতায় বৃষ্টির শব্দ...তারপরই দূরে কালাঝোর দেখা গেল—নীল কালো মেঘমালার শৈলশ্রেণী নীল...এবেলা মেঘ থম্‌কানো কালো মেঘময় বিকেল। সন্ধ্যার সময় বাসায় এসে চা খেলুম।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ২৯শে আশ্বিন, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে চারুবাবু সুরেনবাবু, সস্ত্রীক এলেন—ওঁদের নিয়ে নীল ঝরনায় বেড়াতে গেলুম। কথা হোল পিক্‌নিক্ হবে একদিন। সুরেনবাবুর স্ত্রী এক জায়গায় পড়ে যাচ্ছিলেন—অতি কষ্টে লাঠি দিয়ে রক্ষা করলুম। নীলঝর্ণায় এসে নাইতে গেলুম। আমরা যখন জলে নেমেচি পট্টনায়ক ও সাহেব যাচ্চে। ডাক্তারের সঙ্গে নীলঝর্ণার কাছে দেখা গেল—বল্লেন বেরুবো। আতা কিন্‌তে গেলুম। সন্ধ্যার সময় নীরদবাবু ও আমি মহুয়াতলার ঘাটে বেড়াতে গেলাম। পাণ্ডুর চাঁদের জ্যোৎস্না—তারপর সারারাত ধরে জ্যোৎস্নার কি ইন্দ্রজাল! পাহাড়ের মাথার চাঁদ কিরণ

দিচ্চে—মনে হোল এ ভগবানের conception সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভগবান কেবলমাত্র সব পরিবর্তন করে দিয়েচেন। কেবলই ইছামতী তীরের সেই দোতলা ঘরে ক্ষুদ্র কক্ষটির কথা মনে হয়—আমাদের ভিটায় ভাঙা বাড়ির কথা মনে হয়—মনে হয় বুদ্ধদেব গৃহত্যাগের দিনটিতেও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ওইরকম দেখা যেত। অনেকরাত্রে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

সকালে উঠে নীলঝর্ণায় হাতমুখ ধুয়ে এলুম। বেশ রোদ ছিল সকালে। বৈকালে কিছু মেঘ হোল। ওরা সুবর্ণরেখায় স্নান করতে গেল—আমি বসে আইনভ্যানহো লিখি। রামধনকে বিড়ি আন্‌তে দিলুম। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সে আনেনি। ওরা সাহেবের বাংলোতে চা খেতে গেল—আমি বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের hedge-এ বসে লিখচি, মাথায় মাথায় রাঙা রোদ, কালাঝোরের মাথায় মেঘের সাদা বাষ্প আবার রোদ—সেই চেরা পথটা দেখা যাচ্চে। আমি ভাবচি—দূরে আজ বিজয়া দশমীতে বাঁওড়ের ধারে এতক্ষণ দোকান বসেচে। খুকু-টুকু কাপড় পরে সেজেচে—ওখানে আসবার জন্যে। কত জায়গায় আজ বিজয়ার উৎসব। এখানে ওসব কিছু নেই—সাঁওতালরা নাচ্‌তে এসেচে। কিন্তু পাহাড়ের ও শৈলমালার কি অপূর্ব panorama এইখানটা থেকে [—] যেখানে বসে আছি। তারপরেই আমি আর একটু গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বনতুলসীর সেই জঙ্গলে বসে আছি—ওপারে রাঙা রোদ আবার উঠেচে মহুলিয়া ও নেকড়ে ডুংরি আলো করেচে। আমি যেন roof of the world-এ বসে আছি—এত উঁচু। রোদ এবার সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাতেও পড়ল। এরকম দিন বেশি হবে না। বাঁওড়ের ধারের জন্য মন কেমন করচে। আরও একটা উঁচু জায়গায় উঠেচি—কি vast majesty! রাঙারোদ সিদ্ধেশ্বর ডুংরির টেকো মাথায়—কি অপূর্ব অপরূপ শৈলশ্রেণীর দৃশ্য চারিধারে। ঘন ছায়াভরা বিকেলটা।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৪। ১লা কার্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকলে নীলঝর্ণাতে হাত মুখ ধুয়ে—দুপুরের পরে গালুডি। চারুবাবু, সুরেনবাবুনেকড়ে ডুংরিতে উঠি। সেখানে চা খাই, গান শুনি। তারপর সুধীরের বাড়িতে এসে চা মিষ্টি খাই। স্টেশন মাস্টার বল্লে আমার মেয়ের বিয়ের কি করলেন? তারপর সকলের সঙ্গে নদী পর্যন্ত এসে ডোঙা পেলাম না—জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে—সুবর্ণরেখার পুল বেরিয়ে বাসা।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৪।২রা কার্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে Governor's pool বলে একটা সুন্দর স্থানে নাইতে গেলুম। কত Spider Lily ফুটে আছে জায়গাটাতে। ফিরে এসে circular tour-এর পথে বেড়াতে গেলুম। রোদ ছিল, একটু মেঘলাও ছিল। পাটকিটা যেতে পথের দুধারের বনের দৃশ্য অপূর্ব। গাড়ি পাহাড়ের পথে উঠ্‌তে চাইল না। একটা ছোট নদীতে বেশ সুন্দর জল। জ্যোৎস্না রাত্রে পায়ে হেঁটে বাসায় ফিরি। তারপর গল্প। বাড়ির পেছনের পাহাড়শ্রেণীর ধারে গিয়ে বসি। কত কথাই মনে হয়। এবার পুজোতে বাড়ি গেলুম না—ওরা কত কি ভাবচে।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৩রা কার্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে পিক্‌নিকে গেলুম। প্রথম তো চারু বাবুদের খুঁজে পাইনে। তারপর বীরেনবাবু এল—আমি তখন রানিঝর্ণা [য়] বসে আছি। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখি ওরা জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে। ঝুনু মালা পাহাড়ের ওপরে উঠে গিয়েচে। উঠ্‌লুম আমিও। বাদল বাবুর স্ত্রী ভিক্টোরিয়া, টুনু, চারুবাবু, আশা ও সুরেনবাবু এই কজনে উঠি। দুর্ভেদ্য জঙ্গল—সেবারে যেখানে চীহড় ফল খেয়েছিলুম—সে শিলাখণ্ড খুঁজে পেলুম—তাতে বসলুম। একেবারে ওপরে উঠে গেলুম। বেজায় তৃষ্ণা—একরকম ছোট ছোট গাছের ফল খেতে অম্লমধুর—তাই খেতে খেতে ওঠা গেল। কত কি বনের ফুল। নেমে খিচুড়ি খেলুম। একটা ঝরণাতে হাত মুখ ধুয়ে দেখি হেমন্ত সন্ধ্যায় জঙ্গলের গন্ধ বেরুচ্চে। নীরদবাবুদের গাড়িবিভ্রাট হোল। আমরা হেঁটে এলুম।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৪ঠা কার্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে নীলঝর্ণায় হাতমুখ ধুতে গেলুম। ফিরে এসে চা খেয়ে পট্টনায়েককে গাড়ির কথা বলে দেওয়া হোল—আমি ও প্রমোদবাবু পাহাড়ের ওপরে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে অনেকক্ষণ বসলুম—বড় রোদ।

সেখান থেকে নেমে পিয়ালতলার ছায়ায় বড় শিলাখণ্ডে বসে বটগাছের দিকে চেয়ে পাখির ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে সব যেন ভুলে গেলুম। এই পাখির ডাক, এই প্রভাতের রৌদ্র; এই পাহাড়ের সানু, বট পিয়ালের ছায়া—অপূর্ব। স্নানাহার করে রামধন দ্রব্যাদি নিয়ে রওনা। স্টেশনে একটা গাছের ছায়ায় কতক্ষণ বসি। পথে কেবলই ভাবছিলুম এই সময়ের কথা—পুরোনো বঙ্গবাসী আমলের কথা, একটা ছোটঘরে প্রদীপদানরতা মেয়ের কথা ইত্যাদি। কলকাতায় এসে মেসে জিনিসপত্র রেখে নীরদদের বাড়ি, সেখান থেকে জগত্তারণ দাসের ওখানে। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—হেঁটে বাসায় এলুম। ভাবছিলুম কাল কোজাগরী পূর্ণিমা—আর আমি এখনও কল্‌কাতায়।

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৫ই কার্তিক, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে জিনিসপত্র বেঁধে রওনা [—] ট্রেনে পিয়ারগাদা ঘাট। বনগাঁয়ের এদিকে জীবনে মোটে এইবার নিয়ে চারবার। ঘাটে নেমে নৌকা করে গঙ্গানন্দপুর যেতে ৫টা বেজে গেল। কার্তিকমাসের সেই কটুতিক্ত গন্ধটা—ট্রেনে নামতেই পেয়েচি—মনমাতানো বনের গন্ধ—ওই সময়েই পাওয়া যায়—অন্য সময়ে নয়। দত্তবাড়ি পৌঁছে চা খেলুম, তারপর মণীন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা করে এলুম। সে সাধু হয়েচে। ২৫ বছর পরে তার সঙ্গে দেখা হোল। দেশে তার নাম "ভক্ত দাদা"। বাংলার শোভা বড় কোমল— শ্যামল অনেক বেশি। ছায়াঘনও বটে। সুন্দর, লাবণ্যময় তবে majestic নয়! একথা মনে হোল। গাছপালার শোভা এখানেই বেশি। এত graceful গাছপালা কোথাও নেই। বনঝোপ ফুল এখানেই বেশি। এখানকার জঙ্গলের প্রকৃতি আরও নিবিড়, সবুজ এত গাঢ় যে প্রায় কালো। পূর্ণিমার চাঁদ উঠ্‌ল—আকাশ খুব পরিষ্কার। সভা শেষ হবার পরে দত্তবাড়ি আহারাদি সেরে সেখানে ঘুমুলাম। আমি ও তিনজন physical culturist... রাত্রে আমি একা শুয়ে আছি—একটা মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকে আলমারিতে কি করচে বোধ হয় আমায় দেখেনি। হঠাৎ দেখেই পালিয়ে গেল।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৬ই কার্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে খুব ভোরে যাদের বাড়ি সেই ভদ্রলোক জাগিয়ে দিলেন। বাড়ির ছেলেটা নদী পর্যন্ত এল। নৌকাতে যেতে যেতেই সুর্য উঠল। স্টেশনে এসে চা ও কেক্ খেলাম। ট্রেনে গুরুদেব হরিপদ ভারতীর সঙ্গে দেখা হোল। নেমে বাসায় এসে বাজার করি। বিভূতির সঙ্গে ও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করি। সন্ধ্যায় যতীনবাবুর দোকানে বাজারে একজন গাছপালাবিদ্ লোকের সঙ্গে গল্প সেরে হরি মোক্তারের বাড়িতে কলের গান শুনতে যাই। রাত্রে জাহ্নবী পাটিসাপটা করেছিল—খেয়ে শুই।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৭ই কার্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে হাটবাজার করে আস্‌চি। বীরেশ্বরবাবুর পত্র পেলুম। নৌকা করে বারাকপুরে। গাছপালা এ অঞ্চলে যে রকম—সিংভূম অঞ্চলে সেরকম নেই। এত বৈচিত্র্য ও গাছের সীমারেখা নেই। সন্ধ্যাবেলা খুকু এল। সে কনকীর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল, কনকী কল্‌কাতার থেকে ফিরে এসেচে—তাই। রাত্রে ওকে ঝুনুর গল্প করি ও পাহাড়ে ওঠার গল্প। ও রাত্রে আর কিছু খেলুম না।

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৮ই কার্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে লিখি আইভ্যান্-হো। কবে শেষ হবে কে জানে। দুপুরে স্নান করতে যাই খুকু ও পাঁচীর সঙ্গে। আমি সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে চলে গেলুম। এসে বকুলতলায় বসে আছি। খেয়ে একটু পরে শুয়ে উঠে হাটে গেলাম আমি, জেলি, রামপদ। সেখানে জিতেন, হাজারী, লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে দেখা। পুজোর কথা শুন্‌লুম। বিজয়ার দিন এবার কি হয়েছিল, কার বাড়ি কি খাইয়েছিল জেলিকে জিগ্যেস্ করলুম। জেলি বলে তেলেভাজা মিহিদানা ও জিলাপি প্রায় সকলেই [—] কেবল ধীরেন।কামারের বাড়ি লুচি। রাত্রে চড়কতলায় বালককীর্তন হোল। খুকুরা অঙ্ক কসে ও গল্প শুনে যাত্রা দেখতে গেল। আমিও কতকাল পরে চড়কতলার যাত্রা দেখ্‌লুম। কেসা চৌকীদার যাত্রা হোলে হাঁকে—কতকাল পরে দেখলুম, বাল্যে দেখেচি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না [—] মাঝ রাত, কি আনন্দে পায়চারী করলুম। কত কথা ভাবলুম—কি সুন্দর রহস্যভরা হেমন্তের জ্যেৎস্নাশুভ্র রাত!

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ৯ই কার্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখি, তারপর বেড়াতে গেলাম ফণিকাকার বাড়িতে। এসে বকুলতলায় গেলাম। তারপর নাইতে। ওপাড়ার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার দিলুম। বৈকালে প্রথমে ওপাড়ার ঘাটে বেড়াতে গেলাম, তারপর কুঠির মাঠে। লতা-সুগন্ধে এবার ভোর করেচে—কত কি ফুলের গন্ধ, কি শ্যামল ছায়া! কতকাল এসময়টা দেশে কাটাই নি তাই বসে বসে ভাবছিলুম। সেই একবার পোতার বিয়ের সময় ছিলুম দিন পনেরো—তাও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল অতিবৃষ্টির দরুন। এভাবে কতকাল কাটাইনি। নদীর ধারে বসে vast spirit world-এর কথা মনে হোল—অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্তের রং-এর কথা মনে হলো। সন্ধ্যায় খুকুকে অঙ্ক কষাই। তারপর নিজে বেড়াতে গেলাম। রাত্রে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'লিখ্লুম।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১০ই কার্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে লিখ্লুম। তারপর চড়কতলায় গিয়ে বসি। যেতে আজ বড় বেলা হোল। শীতের দিন দেখ্তে দেখতে ফুরিয়ে যায়। কুঠির মাঠ বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে নেয়ে এসে খেলুম—খুকুকে ভূগোল পড়ালুম। তারপর একটু শুয়ে উঠে আবার খুকু এল—ওদের ধাঁধা বলে দিলাম। বৈকালে কুঠির মাঠে exercise করি। মেঘস্তূপের পাহাড়ের চূড়ায় পাটলবর্ণের ছোঁয়া লেগেচে—কি শোভা! সন্ধ্যায় নারানদার পাড়ায় গিয়ে চা খাই ও বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তর্ক। খুকুকে এসে পড়ালুম ও Ivanhoe-র গল্প করি। রাত্রে কি অগণিত নক্ষত্র আকাশে!

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১১ই কার্তিক, ১৩৪১। রবিবার।

এদিন সকালে খুব লিখে দুপুরে হেঁটে আকাইপুরের ভিতর দিয়ে গরিবপুর রওনা হলাম। পথে মণি বোসের, ছোট মামার, সুপ্রভার বিজয়ার পত্র পেলাম। তখন আর পড়লাম না। নওদার বিল ছাড়িয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা খুলে পড়লাম। তারপর আকাইপুরের হাটতলা ছাড়িয়ে রেললাইন ধরে গেলুম গরিবপুরে। বীরেশ্বরবাবুর বাড়িতে যখন চা খাচ্চি তখন ট্রেনখানা গেল। বীরেশ্বর বাবুদের পুকুরে বেড়িয়ে এলাম। রাত্রে অনেক গল্প হোল—বীরেশ্বরবাবু চিত্রকূট ভ্রমণের গল্প করলেন। রাত্রে আহারাদির পরে অনুকূল মুখুজ্যের মেয়ের কথা হোল—সাহেবগঞ্জে থাকেন। একভদ্রলোকের সঙ্গে।

রাত্রিটা বেশ কাট্ল। এই চমৎকার সূর্যাস্ত দেখা গেল বীরেশ্বরবাবুদের পুকুর থেকে ফিরবার পথে!

২৯শে অক্টোবর,১৯৩৪। ১২ই কার্তিক, ১৩৪১। সোমবার

সকালে উঠে নীরদের পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে স্টেশনে এসে গোপালনগরের টিকিট কিনলুম। স্টেশনে নেমে বাজারে নারায়ণদার কাছে পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা কর্তে হলো। তারপর কিছু খেয়ে বাড়ি এলুম। খুকু এল—তার ওপর ভারি রাগ হোল একটা বিষয় নিয়ে। স্নান করে এসে লিখতে বসলুম। দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বেলেডাঙাতে গেলুম। কি অপূর্ব রাস্তার শোভা। সোঁদালীফুল ফুটেচে দেখে এই কার্তিক মাসে অবাক্ হয়ে গেলুম। এক্সারসাইজ করে চলে এলাম। সন্ধ্যায় খুকু পড়তে এসে অঙ্ক কষলে—আমি বল্লুম না। পুঁটিদিদিদের বাড়ি গেলুম রাত্রে। তারপর গল্প বলবার সময় ও সেধে কথা বলালে। রাত্রে তাস খেলা হোল—তারপরে লিখলাম। আমি ও খুকু, ন'দি ও খুড়িমা। তারপর এসে লিখলুম। যখন শুই রামপদদের বাইরে, তখন চাঁদ উঠেচে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৩ই কার্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে লিখলাম। তারপর স্নান করতে পোড়ার ঘাটে গেলুম—সাঁতার দিলাম ও পাড়ার ঘাট পর্যন্ত। দুপুরে খুকুকে পড়াব। তারপর বৃন্দাবনদের বাড়ি গেলাম। পরীক্ষা নিতে। ওখান থেকে বেরুবার—বাঁশবনের আমবনের পথ দিয়ে যাবার সময় মনে কেমন একটা চমৎকার আনন্দ হোল। লণ্ঠন হাতে তেল পুরে আনতে যাচ্চি। রাখা মাইন্সের সেই বিরাট জঙ্গলের কথা মনে হোল। পাঁচু রায়ের দোকান থেকে তেল কিনে—কুমোর পথ দিয়ে এসে হরিপদদাদাদের বাড়িতে বসলুম অনেকক্ষণ। সন্ধ্যার সময় আবার ওদের পড়াই। অনেকরাত পর্যন্ত Ivanhoe-র গল্প হোল।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৪। ১৪ই কার্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে লিখে একটু কাঁটালতলায় বেড়াতে গেলুম। বলা বোষ্টম এসে গল্প করলে আর সন্তোষ। তারপর স্নান সেরে এসে একটু লিখ্‌লুম। তারপর খেয়ে এসে ঘুমুলাম কারণ কাল রাত্রে আইনভ্যান্‌হোর গল্প করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

উঠে দেখি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়চে। মন খারাপ হয়ে গেল। কোথাও বেরুনো হোল না—চেয়ার পেতে বসে পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে লাগলুম। সন্ধ্যাবেলা খুকু এল পড়তে—তাকে পড়িয়ে রাত্রে সে আবার হেঁয়ালী জিগ্যেস্‌ করতে লাগ্‌ল। রাত্রে নাপিত বৌয়ের সঙ্গে পুঁটিদিদিদের সঙ্গে ঝগড়া হোল বিচালী নিয়ে। অনেকরাত পর্যন্ত লিখ্‌লুম।

১লা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই কার্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

মেঘান্ধকার দিন। মণীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখি—সকালে বসে বসে লিখলুম। তারপর খুকু এসে প্রবাসীর বিজ্ঞাপনের শাড়ি অনেকক্ষণ ধরে দেখলে। আমি নদীতে নাইতে গেলুম না। খেয়ে একটু শুয়েচি, খুকু আবার এল। অনেকক্ষণ রইল। এ গল্প ও গল্প করতে লাগ্‌ল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। বৈকালে হাটে গেলুম। হাট সেরে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। সকালে ঘি কিনেছিলুম, রাত্রে ভাত না খেয়ে রুটিই খেলাম। সন্ধ্যার পরে খুকু পড়তে এসে অনেকক্ষণ রইল। বাইরে আমি লিখতেবসলেও খুড়িমা খাবার জন্যে ডাকতে এলেও অনেকক্ষণ রইল। রামপদ আমার কাছে বসে ৭০০ টাকার ও কি করেছিল সেই গল্প করলে। রাত্রে বাইরে শুয়ে খুব আনন্দ—বেশ ঠাণ্ডা, নির্মল বাতাস বাইরে।

২রা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই কার্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

ঘোর বর্ষা নেমেচে। সকালে লেখা সেরে চা খাচ্চি। খুকু এসে গল্প করলে। তারপর আমি নাইতে গেলুম—এপাড়ার ঘাট থেকে সাঁতার দিয়ে গেলাম তেঁতুলতলার ঘাটে। রোজ থাকে বুধো গোয়ালার মা এ সময়। তারপর এসে খেয়ে বসেচি, আবার খুকু এল এবং অনেকক্ষণ রইল। ওর সঙ্গে গল্প করলুম Normanদের কথা—Saxonদের ইতিহাস। ওকে আর পাঁচীকে বুঝিয়ে দিলাম। এবেলা খুব বৃষ্টি। পাঁচু রায়ের বাড়ি নিমন্ত্রণ হবার কথা ছিল, হোল কই। শম্ভু ও রামপদ ছাগল আনতে গেল বেলেডাঙায়। আমি কোথাও বেরুলাম না। সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামল বেশি। রাত্রে খুকুদের সঙ্গে বাইরে বসে ভূতের গল্প করি। কারণ আমার আলোতে তেল নেই। আলো জ্বালাতে পারচি না। দুধ দিয়ে যায়নি হাজ্‌রী জেলে। রাত্রে খাওয়ার কষ্ট হোল।

৩রা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই কার্তিক, ১৩৪১। শনিবার

মেঘান্ধকার আকাশ। সকালে নদীর ঘাটে মুখ ধুতে গিয়ে আকাশের ও গাছপালার সুন্দর রূপ দেখলাম। লিখে উঠে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে দেখি একজায়গায় সেঁয়াকুল হয়ে আছে অজস্র। সাঁতার দিতে গিয়ে একটা নীলকচুরির ফুল তুলে নিয়ে বাঁশতলার ঘাট দিয়ে উঠে এলুম। মাংস ছিল রাত্রের, খেয়ে দুপুরে খুব ঘুমুলাম। ন'দি তাস খেলার জন্যে ডাকতে এসেছিল, শুনিনি। বৈকালে গোপালনগরে গেলুম, লক্ষ্মীডাক্তার ও মন্মথর ওখানে বসি। তামাক খাই। সন্ধ্যায় খুকু একা বাইরে বসে অঙ্ক কষলে ও গল্প শুনলে। ওর খোঁপায় কচুরির ফুলটা গুঁজে দিলুম। রাত্রে লিখি। এ বেলা বৃষ্টি হয়নি। রাত্রে ঠাণ্ডাও কম। এখানকার আর সব ভাল [—] বাদলা হলে বড় খারাপ লাগে—আর?—

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই কার্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মেঘান্ধকার আকাশ—নদীর ঘাটে গিয়ে দেখলাম। মনে হোল মেঘ চলে যাবে [—] কিন্তু আরও বেশি করে জমল, তবে বৃষ্টি হলো না। আমি লেখা সেরে কুঠির মাঠে আটিতে [?] গিয়ে বেড়াই। ব্যায়াম করি, নতুন ছাতিম গাছ একটা আবিষ্কার করি। কি সুন্দর ঘন বনের দৃশ্য ও বৈচিত্র্য! এত বৈচিত্র্য ও শোভা, গাছের এমন ভঙ্গি ও সীমারেখা কোথাও নেই। আনন্দে মন কেমন আপ্লুত হয়ে উঠল। এই সময় মরচের ফুল ফোটে—এবং এই সময়ের গন্ধটা মরচে ফুলের সম্প্রতি আবিষ্কার করেচি। মাখন সিমের গোলাপী দলগুলি ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে—কেয়োঝাঁকার ফুলে কেমন একটা মিষ্টি সুগন্ধ। মরচের ফুল, হাতলম্বা লতার পাতাগুলি কুঠির মাঠে

যেতে বড় একটা গাছে—হলদে হয়ে আছে। খুকু দুপুরে এল, সে কত কি গল্প করে, হাসে। বেশ লাগে ছেলেমানুষকে। হাটে গেলাম। সন্ধ্যাবেলা খুকু আবার এল [।] বল্লে,আপনার গায়ে এত লোম কেন? পাশে তাকে চেয়ারে বসিয়ে [—] সেই আলো জ্বাললে। তারপর ১১টা পর্যন্ত গল্প।

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৯শে কার্তিক, ১৩৪১। সোমবার

কাল রাত্রিতে নক্ষত্র দেখা গিয়েছিল—যখন হাট থেকে এসে ভরা সন্ধ্যায় আমি কুঠির মাঠে ও নদীর ঘাটে গিয়েছিলুম। আজ প্রত্যুষে ও পাড়ার ঘাট থেকে বহুদিন বাদে সূর্যোদয় ও রৌদ্র দেখলুম। একটু পরেই মেঘে সব ঢেকে গেল। নদীতে যেতেই খুকু এল। তাতে আমাতে সাঁতার দিলাম। আগে ওপাড়ার ঘাট যাচ্ছিলুম, ও বল্লে—দাঁড়ান। ও ঘাটে চলুন যাই। আমি বাঁশতলার ঘাট থেকে নেয়ে এলুম। দোকড়ির ছেলে বল্লে আপনার তো খুব সাহস! একটু ঘুমিয়ে উঠে বসে আছি, খুকু চুল শুকোচ্চে ছাদে [—] আমায় বল্লে দেখুন? মুখ তুলে দেখি...। তারপর আমি রাঙারোদ-ভরা অপূর্ব বিকেলে...? এইমাত্র হোয়ে ছিল। বেলেডাঙার পথে এক জায়গায় গিয়ে বসলুম। সেক্‌রার দোকানে তামাক খেলুম। তারপর সন্ধ্যায় ফিরি। চারটা সিগারেট দিলে এক পয়সায়। চোদ্দ পিদীম দিয়েছে বোধনতলায়, সুকুদের উঠোনে। ওরা শাঁক বাজাচ্চে [—] কালীতলায় প্রদীপ দিতে। তারপর খুকু এল। আবার সন্ধ্যাবেলা এসে অঙ্ক করলে। আমিন'দিদিদের বাড়ি 'মেঘমল্লার' পড়লুম। খুকু সেখানে না যাওয়াতে আমার রাগ হোল।

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২০শে কার্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে লিখে উঠে খুকু এলে অনেকক্ষণ বসে গল্প করতে লাগ্‌ল—সে উঠল প্রায় বেলা। কুঠির মাঠে বেড়িয়ে এসে স্নান করলাম—সাঁতারও দিলাম। বিকেলে খুকুদের নিয়ে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম—কুঠি দেখে ওদের কি আনন্দ! খুকু লাফায়, ছোটে, এ ঝোপে ঢোকে, ও ঝোপে ঢোকে—আমায় কেবল বলে—দাদা, শুনুন, আসুন এদিকে, এটা দেখুন। আবার ঘাটের পথ থেকে ডেকে অনেকদিন পরে বল্লে—দাঁড়ান দাদা, আমরা যাই। আমার পেছনে পেছনে ছুটে আসে। ঠিক হোল একদিন সাতভেয়েতলায় যাব ওদের নিয়ে। সন্ধ্যার পরে গোপালনগরে গেলাম ঠাকুর দেখতে। ধোপার বাড়িতে গেলাম অনেক বছর পরে। স্কুলের মাঠে সেই ঘোর অন্ধকার ও কাদায় বেড়াতে গেলাম। হাজারির ওখানে তাস খেলা গেল কবিরাজ, মানিক, ব্রজেনবাবু মাস্টার। খেয়ে দেয়ে রাত এগারোটায় বাড়ি এলাম। খুকু বলেছিল [—] এসে পড়বেন সকাল সকাল—গল্প শুন্‌বো। তা আর হোল না।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২১শে কার্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে খুব কুয়াশা। একটু পরে রোদ উঠল। Ivanhoe লিখলুম। একটু পরে খুকু এল—কি একটা গল্প লিখেচে স্লেটে [—] পড়ে শোনালো। তারপর আমরা নাইতে গিয়ে নৌকায় উঠে ঠেলাঠেলি করলাম—খুব সাঁতারও দিলাম। বিকেলে ওই আমাকে ঘুম থেকে ওঠালে। কিন্তু কুঠির মাঠে যাওয়া হোল না ওর—আমরা তাস খেলার পরে কুঠিতে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার আগে নদীর ধারে বসে রইলুম। আকাশের কি অপূর্বরং দেখলাম নিস্তব্ধ নদীতীরে—সন্ধ্যার সময় খুকু এসে বল্লে— একটা জিনিস খাবেন? হাঁ করুন। তারপর আমার মুখে ভাজা মসলা ফেলে দিলে। অনেকক্ষণ গল্প হোল ও অনেকরাত পর্যন্ত শুন্‌ল। তারপর আমি লিখ্‌লুম। এখানকার দিনগুলো সত্যিই যে অপূর্ব আনন্দে কাট্‌চে বিশেষ করে খুকুর জন্যে [—] আর ও আজকাল সর্বদা কাছে এসে বসে থাকে বলে [বোলে]—এ বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু মেঘ মোটেও কাটচে না আকাশের, রোদের মুখ একদিনও দেখতে পেলাম না—আজ সন্ধ্যার সময় কেবল আকাশের রং যা দেখেছিলাম—অপূর্ব। যুগল কাকাদের শিউল গাছটার দিকে চেয়ে থাকি।...

৮ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে কার্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে আকাশে মেঘ, নদীতে গিয়ে দেখ্‌লুম, শেষ রাত্রে বেশ শীত করেছিল। কার্তিক মাসের সেই পাতালতার গন্ধটা এখনও মৃদুভাবে আছে। খুকু সকালেই এসে পৌঁছেচে—স্নানের সময় পর্যন্ত রইল। খুকু একটা গল্প লিখেচে—সেটা ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে আমায় বল্লে। একসঙ্গে আমরা ঘাটে গেলুম। ঘুমিয়ে উঠেই ও

আবার এল। তারপর আমি আর জেলি হাটে বেরিয়ে গেলাম। হাটে গিয়ে শোনা গেল জাহ্নবীর অসুখ। মনটা খারাপ হয়ে গেল। চমৎকার অস্তদিগন্তের আভা জড়ানো বট অশ্বত্থের গাছগুলোও ভাল লাগ্‌ল না। সন্ধ্যায় ফিরে মনোরমা প্রভৃতি পড়তে এল—খুকুও এল। অনেকরাত পর্যন্ত গল্প শুন্‌লে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা কেমন করে মারা গিয়েছিলেন—গৌরী কেমন করে মারা গিয়েছিলেন—সে সব শুনলে। অনেকরাত পর্যন্ত রইল। বল্লে—এই বকুনি আরম্ভ হোল তো আর নিস্তার নেই।

৯ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে কার্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে খুকু এসে পুঁটিদিদিদের বাড়ি পুজোর জায়গা করে দিলে। সবাই এল—আমি পুজো করচি কি না—বল্লে রামমণি পুজোর জায়গা করেচে। চণ্ডীদাস পুজো করেচে—দেখি কেমন পুজো হচ্চে। শেষ পর্যন্ত সে কাছে কাছেই রইল। গল্পটা পড়ে শোনালে। গ্রীষ্মের বন্ধের দিন এখান থেকে চলে যাবার সময়ের মত। নদী বেয়ে যাচ্চি—সকালবেলা। মেঘ মেঘ একটু রোদ উঠচে। বনগাঁয়ে এসে জাহ্নবীর অসুখ। এই যাবার সময় খুব আনন্দ হয়েছিল—চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাথায় কুচো কুচো হল্‌দে ফুল দেখে। বাসায় এসে জাহ্নবীর জন্যে ডাক্তারখানায় গেলাম। সুরেন এলে তার সঙ্গে অনেকদিন পরে ঘাট বাঁওড় [—] শীতলদের বাড়ি গেলুম। তারপর বলু এসে জাহ্নবীকে দেখলে [—] আমি ওষুধ এনে খাইয়ে [—] লিখ্‌লুম। ঠাকুরের দোকান থেকে খাবার কিনে আনি [—] জগদীশদের বাড়ি যাই।

১০ই নভেম্বর, ১৯৩৪।২৪শে কার্তিক, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে গানটা মনে পড়ল সেদিন খুকুর মুখে শুনেছিলুম—ঘুম ঘোরে এলে মনোহর, নমো নমঃ, নমো নমঃ নমো নমঃ [।] আজ আকাশ পরিষ্কার দেখে মনে কি সুখ যে হোল সকালে! এতদিন বারাকপুরে ছিলাম আকাশ পরিষ্কার হয়নি। কেমনওদের রোয়াকের তক্তপোষ থেকে বকুল গাছের ওদিকে গাছপালায় রোদ পড়ে স্বচ্ছ দেখাচ্চে। শিউলি গাছটার মুকুলগুলি কি চমৎকার দেখাতো! খুকু এসে গল্প করত। গান গাইত।

বৈকালে মহীতোষ রায়চৌধুরী ভোটের জন্যে ডাক দিলে একসঙ্গে গিয়ে বেড়ালুম। তারপর আমরা গেলুম গোপালনগরে। দোকানে ভোটের জন্যে ঘুরলুম। অনেকরাত্রে ফিরলুম।

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৫শে কার্তিক, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। এসে জাহ্নবীর জ্বর দেখে তার পথ্যের ব্যবস্থা করে লিখ্‌তে বসি। একবার বিভূতির আড়তে ভোটের গল্প শুনে এলুম। বেলা চারটার সময় ঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর। কুমোর বাড়ির কাছের রাস্তা দিয়ে নেমে যেতে ফকিরচাঁদের বাড়ি থেকে বেরুচ্চে পাঁচী। সে বল্লে—ও বিভূতিমামা, আপনার জন্যে পাড়া অন্ধকার। সবারই মন খারাপ, খুকুরও তাই। কচার চোখ দিয়ে জল পড়চে। যেতে যেতে চড়কতলার মাঠে খুকুর সঙ্গে দেখা। সে তো হাস্‌তে হাস্‌তে কাছে এল। সে সেই কেমন একধরনের হাসে। তারপর আমি পুঁটিদিদিদের বাড়ি গেলুম। পাঁচী বল্লে পাড়া অন্ধকার হয়ে গেছে। আপনাকে এত ভালবাসতে ইচ্ছে হয় বিভূতিমামা! খুকুর সঙ্গে আবার দেখা। সে বসলো পিসিমাদের দাওয়ায়। তাকে একটা চড় মারতে গেলে সে একটুও নড়ল না। আবদারের সুরে বল্লে—চড় মারলেন যাবার সময়ে?তারপরে গোপালনগরে...? বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে বনগাঁয়ে এসেচি। এমন সময় মহীতোষ বাবু ডাক্‌চেন ওদিকের জানলা থেকে। খানিকটা কথাবার্তা বলে লুচিভাজা খেতে গেলুম দোকানে। মনে আজ একটা অপূর্ব আনন্দ।

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে কার্তিক, ১৩৪১। সোমবার

আজ Assembly Election-এর Polling day। গোপালনগরে গেলুম সকালে—বারাকপুরে। খুকু মাঠে গিয়েছিল—এসে বিলবিলেতে যখন পা ধুচ্চে—আমি তখন মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখে এলুম। ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বল্লে। আমি এলুম বৃন্দাবনের বাড়ি। সেখান থেকে গোপালনগরে যুগল মদনকে নিয়ে বনগাঁয়ে। তখনই খেয়ে নিয়ে আবার গোপালনগরে।...?

গোপালনগরে...? দেখলুম কতবার। আবার ওদের নিয়ে বৈকালে বারাকপুরে। কালো ছিল বলে খুকু এল একটু আড়ষ্টভাবে। তাহলেও এল—পুঁটিদিদির ঘরের মধ্যে দাঁড়ালে।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৪।২৭শে কার্তিক, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে ওষুধ আনা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত ছিলুম। খয়রামারি বেড়িয়ে এলুম না। স্নান করে এলুম। বৈকালে গেলুম স্বদেশবাবুর ফার্মে। সুন্দর লোকটি—নানারকম বনফুলের গল্প হোল। একরকম সিমের ফুল দেখলুম। কত বড় পেঁপে...। তারপর ওখান থেকে এসে বীরেশ্বরবাবুর বাড়িতে গেলুম। সেখানে আমি ও বিনয়বাবু গল্প করে ফিরলুম,—।

কি সুন্দর রাত জ্যোৎস্নাময়ী! কি সুন্দর নীল নির্মল আকাশ! সব বৃথা গেল এবার কুঠির মাঠে এই আকাশ না দেখতে পেয়ে!

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৪।২৮শে কার্তিক, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে লিখি তারপর বাজার করতে গেলাম। তারপর জিতেন দফাদারের সঙ্গে সঞ্চয়ের গুণ সম্বন্ধে রাধুর ডাক্তারখানায় বসে গল্প করি। মন ভালই না মোটে। বারাকপুর ছেড়ে এসে মনে হচ্চে স্বর্গ থেকে চলে এসেচি—কি আনন্দেই ছিলুম। সেখানে! একটা আনন্দ স্বপ্নের মত। জাহ্নবী ছট্‌ফট্ করচে জ্বরের ঘোরে—সেই হয়েচে আরও কষ্টকর। বিকেলে তিনুর সঙ্গে গেলুম খয়রামারির মাঠে। সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণের গল্প করি ওদের সঙ্গে।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে কার্তিক, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে লিখে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি বসে গল্প করি। ফিরে এসে স্নান করে আবার হিরন্ময়ীর অধ্যায় লিখি সর্বপ্রথম দৃষ্টিপ্রদীপে। বৈকালে উঠে তিনুদের ওখানে চা খেলুম—তারপর তিনুর সঙ্গে খয়রামারির মাঠে বেড়িয়ে আসি। এসে আমি বিভূতিদের আড়ৎ হয়ে চলে গেলুম মন্মথবাবুদের আড্ডায়।

রোজ সন্ধ্যায় ফিরে এসে একটু লিখি। ওঘরে জাহ্নবীকে দেখে এসে তারপর একটু বিশ্রাম করি—জ্যোৎস্না খুব উঠেচে—কিন্তু মন নিরানন্দ হলে কি আর জ্যোৎস্না ভাল লাগে?

১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে কার্তিক, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখি। আজকাল উঠি খুব ভোরে [—] খয়রামারির মাঠে যখন যাই তখন সূর্য ওঠে না। এসে একটু ডাক্তারখানায় বসলুম—তারপর বীরেশ্বর বাবুর বাড়ি গেলাম। সেখান থেকে এসে স্নান করে হিরণ্ময়ী episode লিখলুম 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র। বৈকালে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তিনুর সঙ্গে খয়রামারি বেড়াতে গেলুম তখন জ্যোৎস্না উঠেচে। রাত্রে মন্মথবাবুর আড্ডা থেকে ফিরলুম।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

বেশ শীত পড়েচে। সকালে উঠে খয়রামারি বেড়িয়ে এসে লিখি। তারপর বাজার করে দিয়ে বিভূতির আড়তে বসে খানিকটা গল্প করি। এসে স্নান করি। একটু বিশ্রাম করে—আবার উঠে লিখি। বৈকালের দিকে আমি আর তিনু রোজ রোজ খয়রামারি বেড়াতে যাই। কোনোদিন চাঁদ ওঠে। কোনোদিন সন্ধ্যা হয়-হয়।

বারাকপুরের দিনগুলো এখন যেন স্বপ্নের মত মনে পড়চে। বড় আনন্দে কাটিয়েছিলুম এবার ও কটা দিন। অত অব্যবস্থা, থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্টের মধ্যেও সুখ ছিল অপূর্ব। সে কেবল প্রকৃতির মুক্ত উদারতার জন্যে ও খুকুর জন্যে।

রাত্রে প্রথমে মন্মথবাবুর আড্ডায় [—] পরে বীরেশ্বরবাবুর আড্ডায় বসে গল্প করি।

১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৪। ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে খয়রামারি বেড়িয়ে এসে লিখতে বসি Ivanhoe-র অনুবাদ। তারপর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই? ও ডাক্তার সঙ্গে বিরজার বাড়ি যাই। স্নান করে এসে লিখি ও আহারের পরে বিশ্রাম করে স্কুলে U. P. Teacher's Conference-এ যাই। খুকি মেয়েটি বলে সে মনে কষ্ট কর্‌চে। বিকালে খয়রামারি যাওয়া হয়নি। রাত্রে মন্মথবাবুর আড্ডায় গিয়ে ভাগলপুরের গল্প, স্কুলে গাঙ্গুলীর গল্প করি।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার।

খয়রামারির মাঠে সকালে গেলুম বেড়াতে। তারপর এসে লিখি। লিখে সকাল সকাল গেলুম বাজারে। বাজার থেকে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে গাড়ি করে বারাকপুরে। খুকু চুল শুকুচ্ছিল। আমায় দেখে ছাদে গেল। তারপর ডাকাডাকি করতে এল। আর কাছ ছাড়ে না। তবুও তো ঘরেই খুড়ো-খুড়িমা সবাই দাঁড়িয়ে। ও আমায় বল্লে—ঘরের মধ্যে আসুন—ও আর পাঁচী যুদ্ধ করবে—দেখতে হবে। তারপর সমস্তক্ষণই দাঁড়িয়ে রইল। কল্কেতে আগুন নিয়ে এসে দিলে। যা কখনও করে না। তারপর বল্লে—আজ থাকুন। আমি বল্লুম—গোপালনগরে প্রাইজে যাব। বল্লে—সেখান থেকে আসুন। আমি বল্লুম—তা হয় না। এরকম কোনোদিন বলে না। তারপর ওর লেখা গল্পটা নিয়ে এসে পড়লে। তারপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। পাঁচী বল্লে—ছাদ থেকে আড়ে আড়ে আপনাকে দেখ্‌ছিল। আমি চলে এলুম। গোপালনগরে স্কুলে গেলুম—ইন্‌স্পেক্টর আমেদ ও S.D.O. এক টেবিলে বসে খেলুম। তারপর আমি, যতীন, মন্মথ, হরিপদ এক গাড়িতে চলে আসি। এসে মন্মথবাবুর ওখানে আড্ডা। আজ নটু এলে ভরসা পেয়েচি। রাত্রে সল্‌তে নেই আলোতে। গেলাম বাজারে।

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে উঠে বাজার করে দিলাম—বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি বই দিয়ে এসে রোগীকে Glucose খাওয়ালাম। বাজার করে বন্ধুর ওখানে বসে গল্প করি।

রোজ সন্ধ্যায় তিনু ও আমি যাই খয়রামারি। আজ আর গেলুম না। মন্মথবাবুদের আড্ডায় গিয়ে গল্প করি। কাল নটু এসেচে—আজ সে এবেলা বারাকপুর গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি জাহ্নবীর কাছে বসেছিলুম। জাহ্নবীর জন্যে মন বড় খারাপ।

২১শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

আজ সকালে উঠে খয়রামারি বেড়িয়ে এসে লিখ্‌তে বসি। তারপর বিকেল থাকতে আমি ইন্সপেক্টরবাবু সব বসে গল্প করি। খেয়ে উঠে হেঁটে বারাকপুরে গেলুম— অনেকদিন পরে হেঁটে গেলাম। কতটুকু পথ! এর জন্য এত? গিয়ে হেলা কাঁটাল গাছটার তলায় বসি। একটু পরে ফণিকাকার মেয়েটা মারা গেল। তারপর মামার বাড়ি পাঠশালায় গিয়ে বসি। পুঁটিদিদিদের বাড়িতে তারপর যাই। খুকু এল। আমি মাদুর পেতে বাইরে বসলুম। খুকু আমার কাছ ছাড়ে না। একবার বল্লুম কুঠির মাঠে বেড়িয়ে আসি—খুকু যেতে দেয় না। বল্লে—বসুন। গল্প করি। সন্ধ্যার সময় চা খেলুম। শম্ভু মাংস নিয়ে গেল। খুকু এল অঙ্ক কষতে। অপূর্ব হেমন্ত জ্যোৎস্না—পূর্ণিমার রাত। কত রাতপর্যন্ত খুকু আর আমি বাইরে বসে—এত আনন্দ পেলাম! জ্যোৎস্না রাত্রে ও আমি আর জগ বসে গল্প করচি বাইরে—তারপর ঘরে গিয়ে গল্প করলুম। কত রাত্রে ও যাচ্চে—আমি বল্লুম—শোন। ও আবার ফিরল।

২২শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই অগহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার।

পরদিন সকালেই আমি নদীর ঘাটে গেলুম। একটু পরে খুকু এল কি একটা বই হাতে। বল্লে 'প্রলয়ের আলো' বইখানা আন্‌বেন। আমি হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। খয়রামারির মাঠের একটা নিভৃত ঝোপের মধ্যে স্নানের আগে বেরিয়ে এলুম। স্নান করে এসে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি থেকে বই নিয়ে এলুম। তারপর খেয়ে গাড়িতে এসে স্টেশনে এসে দেখি গঙ্গাহরি ও বারাকপুরের নলিনীদিদির ছেলে। তারা ৪টার ট্রেনে বারাকপুর গেল। আমি ভাব্‌তে লাগলাম আহা, যদি ওদের সঙ্গে চারটার গাড়িতে এই হেমন্ত অপরাহ্নে [অপরাহ্ণে] বারাকপুর যেতে পারতুম। কলকাতায় এসেই বন্ধুদের বাসায় গেলুম। বন্ধুর বৌ প্রণাম করলে। টরুর সঙ্গে বসে গল্প করি।

ওখান থেকে জগৎবাবুদের বাড়ি। চা খেলুম। গল্প গুজব হোল। মনে ভাবছিলুম এখনও নটার মেলে গেলে আজ এই জ্যোৎস্না রাত্রেই পুঁটিদিদিদের বাইরে শোয়া যায়।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

আজ সকালে G. C. College Mess থেকে একটা নিমন্ত্রণ এসেছে। স্কুলে গেলুম—কোলা প্রথম তো আসে না—শেষ কালে এল। বড় ভাল ছেলে—পুরোনো দিনের মত মিশ্‌লো। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। এখানে গালুডি ভ্রমণ বৃত্তান্ত বল্লুম। তারপর নীরদবাবুর আড্ডাতে; প্রমোদবাবু আজ এসেচেন ফটো নিয়ে। অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। ট্রামে বাসায় ফিরলুম। অনেকদিন পরে কল্‌কাতা ভাল লাগ্‌ছে কিন্তু জাহ্নবীর জন্য মন খারাপ। এসেই সুপ্রভার পত্র পেলুম। প্রমোদবাবুর আসার কথা আছে তার জুতো নিতে। রাখামাইন্‌সে জুতো বদ্‌লে গিয়েছিল। এখানে ধোঁয়া—জ্যোৎস্না বোঝা যায় না।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে লিখে স্কুল।ঘোট ঘরে কোলাদের ক্লাস উঠে গেল—আমার পক্ষে ভাল। তারপর সকালে ছুটি হলে Imperial Library-তে Nature Mysticism সম্বন্ধে বই পড়লুম। নীরদবাবুদের বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জমিয়ে আড্ডা—সেখান থেকে ট্রামে P.C.Sircar-দের দোকানে। তারপর বাসা।

সব সময়ই গত পূজার ছুটির অদ্ভুত দিনগুলোর কথা ভাবি—সেই বারাকপুরে রামপদদের রোয়াকে সেদিন বিকেলে মাদুর পেতে বসেচি—খুকু এসেচে—পাঁচী এসেচে গল্প করচি—সেই ছবিটা মনে পড়চে কেবল।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে নূর মহম্মদ লেনে এক মিটিং-এ কানাই যেতে বলেছিল—পথে হরিনাভি স্কুলের পুরোনো ছাত্র শম্ভুর সঙ্গে দেখা। কানাই-এর দোকানে চা খেয়ে পার্ক সার্কাসে মণিবোসের বাড়িতে গেলুম। বেলা একটার সময় সেখান থেকে এলুম। এসেই Sunday's Debating Club-এর এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। একটু লিখে উঠে বিকেলে সেখানে গেলুম। শৈলেন লাহা, নলিনী সরকার অনেকেই ছিল এখানে। বার হয়ে এসে রমেশ সেনের আড্ডায়। আজ বড্ড ধোঁয়া—এই দেড়মাস মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়ে মহা আনন্দ, এই ধোঁয়া ও বদ্ধতা কি বিশ্রী যে লাগচে—কেবলই মনে হচ্চে কি জানি কুঠির মাঠের পথের জঙ্গলে সেই হল্‌দে বড় বড় পাতা থাকে—পথ চল্‌তি লোকটা বলেছিল "হাড় নাস্বার লতা"। আর মনে পড়চে আটির সাম্‌নের মাঠে সেই গাছপালার outline, নীলঝর্ণা, বনতুলসীর জঙ্গল পাহাড়ের ওপরে, সূর্যাস্তে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি, পাটকিটার জঙ্গল। খুকু, বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ইছামতী ও চালতেপোতার বাঁকে কুচো কুচো ফুল।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে লিখি—তারপর স্কুলে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে প্রমথ, প্রেমেন, তারাশঙ্কর সকলের সঙ্গে ঘোর আড্ডা। ওখান থেকে বই কিনে নিয়ে সুসার কাকার বাসায় এসে কালোর চাকুরি সম্বন্ধে আলোচনা। আমার কেমন একটু কষ্ট হচ্চিল খুকুর কথা ভেবে—এইখানেই তো সে একদিন ছিল। ট্রামে বাসায়।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৪।১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে ট্রামে প্রবাসী আফিসে। সেখান থেকে বই ও ফাইল নিয়ে ব্রজেনদার সঙ্গে গল্প করতে করতে সাহিত্য পরিষদ পর্যন্ত। আমি ও বিশু এলুম নীরদের বাসায়। কেউ নেই। অনেকরাত পর্যন্ত বসেই রইলুম—চা খেলাম। ট্রামে ফিরলাম। মির্জাপুর স্ট্রীটে পরিমলের সঙ্গে দেখা—বল্লে, মোহিতবাবু আপনার সম্বন্ধে শনিবারের চিঠিতে লিখেচেন। তাকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম। বল্লে মীরাকে নিয়ে পশুপতিবাবু এসেছিলেন যে। তা কি আর করবো। নীরদের বাড়ি বসে আমোদ সা আবদালির দিল্লি ও মথুরা বৃন্দাবনের লুঠের কাহিনী পড়ছিলুম। হজরত বেগমের কথা—বৈরাগীদের গরুর মুণ্ড মুখে দিয়ে মারার কথা। কলেরা এপিডেমিকের কথা—পলাতক নরনারীদের কথা কি ভয়ানক! ১৭৫৪ সালের মার্চ।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

স্কুল থেকে নিখিলদার গাড়িতে আমি ও পরিমল নানা স্থানে বেড়িয়ে বলাইবাবুর শ্বশুরবাড়ি কালীঘাটে ও সেখান থেকে আমি যাই চারুবাবুর বাসায় চৌরঙ্গিতে। নীরদের বৌদিদি অনেক ফটো দেখালেন—চারুবাবুও ছিলেন। লেদাশাল পাহাড়ে আরোহণ সম্বন্ধে গল্প শোনা গেল। ভিক্টোরিয়া দত্ত সেখানেও উঠেচেন দেখলুম। ওখানে চা ও খাবার খেয়ে বাসে শ্যামবাজারে নীরদের বাসায়। নীরদের স্ত্রীর শরীর কিছু খারাপ [।] নটা পর্যন্ত গল্প করে ফিরি। রাত্রে হরিনাভির ছাত্র শৈলেন ঘোষ এল।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব তাড়াতাড়ি লেখা সেরে—যোগেশ বাগলকে 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র কপি দিয়েএলুম। স্কুলে কাল কোলার সঙ্গে মনান্তর হয়েছিল—সেটা মিটে গেল। তারপর বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটু আড্ডার পরে U.N.Dhar-এর দোকানে গেলুম মধুচক্রের ফলানো গল্পের জন্যে। সেখানে চা খেলুম। পথে পুরানো বাজার দেখে ফিরচি পথে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা। তাকে নিয়ে সুকুমারের কাছে ঘড়ি আনতে গেলুম। দেখা পেলাম না। করুণার সঙ্গে পথে দেখাহ্যারিসন রোডে। রাত্রে এসে বিচিত্র জগৎ লিখি। জগৎদাসের লোক এসে আইভ্যান হোর অনুবাদ নিয়ে গেল।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৪। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে লিখতে বসেচি [—] আজ এল রাজ্যের লোক। আশু, গিরিনবাবু পাব্লিশার, কান্তি, সুরেন, কৃষ্ণধন, পি.সি.সরকারের ছেলে—ছোট গল্পের বই দিয়ে গেল Standard Literature. স্কুলে ফোন [?] বল্লে to put young—বঙ্গশ্রীতে গেলাম—সুকুমারবাবু সেখানে। বার হয়ে বাসায় এলুম বিকেল বেলাই। এসে Wide World নিয়ে এসেছিলুম এপ্রিলমাসের তাই পড়লুম। রাত্রে করুণা একটা ছেলেকে নিয়ে এল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে পি.সি. সরকারের ছেলে এল। স্কুল যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা ওর বাড়ির সামনে। কোলা বল্লে আপনার সঙ্গে দেখা হোলেই আপনি [?] [—] বঙ্গশ্রী আফিসে না গিয়ে মেসে ফিরে আসি। বিকেলে নীরদ দাশগুপ্তের বাড়ি যাই। তাঁর মোটরে সোমনাথবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে—সুশীলবাবুর বাড়িতে অনেকক্ষণ গল্প করি। রাত নটায় ট্রামে চলে এলুম।

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের আড্ডা। সেখান থেকে এসে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত Great Short Stories পাঠ। দুপুরে এলেন পশুপতিবাবু। রাত্রে সৌরীন নিয়ে গেল পার্ক সার্কাসে নিমন্ত্রণ ওর কাকার বাড়িতে। খুব খাওয়ালে। কাকা বেশ লোক—গল্পগুজব হোল।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে Great Short Stories পড়লুম। ওতেই মশগুল হয়ে আছি ক'দিন। স্কুলে পরীক্ষা সুরু হোল আজ থেকে। দেড়টা পর্যন্ত ক্লাসে গার্ড দিয়ে ছুটি। নীরদের জন্যে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলুম—দেখা পাওয়া গেল না। আমি খুব হেঁটে চৌরঙ্গি পর্যন্ত বেড়িয়ে এলুম। পথে পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা। বল্লে—সামনের বুধবার ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবে। বল্লে—রাত্রে খুব তাস খেলবে। বারাকপুর কেউ যাচ্ছে একথা শুনলেই যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়। আগেও যেত—চিরকালই যায়। কিন্তু এখনকার সঙ্গে ও পুরাতনের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

সন্ধ্যার সময় মেসে এসেই Short Stories পড়তে শুরু করলাম।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

স্কুলে গেলুম বেলা দেড়টার পরে। রঞ্জনদের ঘরে গার্ড দিলাম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা বহুদিন পরে। ট্রামে জগত্তারণ দাস—ও গিরিনবাবুর দোকান। ট্রামে College Squr—ও বাসা। সেখান থেকে এসে দেখি নুটু এসেচে। জাহ্নবী ভাল আছে শুনে আনন্দ পাওয়া গেল।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে অরবিন্দ দত্তের কাছে। তার বিধবা পিসির গল্প শুনি। চা খেয়ে বেরুলাম—হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেন—সেখানে একস্থানে গায়ের আলোয়ান পেতে Short Stories পড়লুম। বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটে থাকে খালের জলে। বেশ লাগছিল। তারপর হেঁটে বাড়ি ফিরবার পথে ডালহাউসি স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে ১৬/১৭ বছর আগেকার কথা অদ্ভুতভাবে মনে এল—এই সন্ধ্যায় বাঁশবনের নিচে ছোট্ট একটা রান্নাঘরে তারা রাঁধ্‌চে—কিংবা হয়তো খাওয়া শেষ হয়ে গেছে [—] এবার ওদের বাড়ি যাবে। গৌরীর কথা মনে এল। অনেকক্ষণ পরে উঠলাম। কেবল বঙ্গশ্রীর আড্ডা না দিয়ে আজ বেশ নতুন হোল।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে 'প্রবন্ধ ও গল্প' রচয়িতা একটা ছেলে এল। বেলা দেড়টার সময়ে পোস্টাপিস্ হয়ে স্কুল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। বঙ্গশ্রী হয়ে Camp Stool কিনতে নিউমার্কেট ও চাঁদনী। ফিরবার পথে শেষে বৌবাজার থেকে আমার সেদিনের দেখা সেই Camp Stool-টা কিন্‌লুম ও নিয়ে এলাম। আজ সকালে Richard Dehan-এর 'A Nursery Tea'বলে একটা সুন্দর গল্প পড়েচি।

আমি দেখি আগে আগে যখন বয়স আরও কম ছিল, তখন মাঝে মাঝে যে নিরানন্দ ও অবসাদের ভাব আসতো মনে—তা এখন একেবারেই নেই। বিশেষ কিছু ঘটে না—তবুও তো যথেষ্ট আনন্দে আছি।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

স্কুলে গিয়ে রাম খাবার আনালে—খেয়ে হেড্ মাস্টারের সঙ্গে গল্প করি। তারপর বার হয়ে ফোর্টের পলাশী গেটের কাছে ময়দানে চাদর পেতে শুয়ে বই পড়চি—এল বৃষ্টি। একটা অশথ গাছের তলায় দাঁড়াই। বৃষ্টি থাম্‌লে একটা সাঁকোর ওপর বসে 'Rosanna'গল্পটি পড়লুম— Short Story বই থেকে [—] ওতেই এই কদিন মশগুল হয়ে আছি কিনা। তারপর পার্ক স্ট্রীট, ওয়েল্‌সলি দিয়ে বঙ্গশ্রী আপিস—সেখান থেকে পরিমল, বৈজ্ঞানিক গোপালবাবুর সঙ্গে—হেঁটে বাসা।

আজ আমার 'যাত্রাবদল' বেরুল। সকালে পি সি সরকারের ছেলে এক কপি দিয়ে গেল। আজ একটা রামপুরী পান্ কিন্‌লুম।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে আশু এল—পি সি সরকারের ছেলে 'যাত্রাবদল' দিয়ে গেল। কাল বারহয়েচে। কোলার সঙ্গে অনেক গল্প হোল—স্কুলে। প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল। মণীন্দ্র বসুও এসেছিল আমার বাসায়। স্কুলে কোলাদের Oral English। কোলা নম্বর টুক্‌তে লাগ্‌ল। কোথায় সে বলে—at the back। বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে হয়ে নীরদবাবুর বাড়িতে দুটি গল্প পড়লুম। Procurator of Judea ও Nursery Tea —সেখানে জালু এল— অনেকদিন পরে—আমার গল্প শুনলে। তারপর পি সি সরকারের দোকান থেকে বই নিয়ে আবার নীরদবাবুর বাড়িতে এসে মোটরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর বাড়িতে গেলুম। উমাপ্রসাদের বৈঠকখানায় উমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্পগুজব করি।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে মণি বোসের বাড়ি। ফিরে এসে আর কোথাও বেরুইনি। Short story বইগুলি পড়লুম। তারপর বার হয়ে কানাইদের সঙ্গে রামকমল সেনের লেনে গেলাম— দেখা হোল না ক্ষিতীশ সেনের সঙ্গে। চলে আসচি

তখন দেখা হোল। আমি একটু বেড়িয়ে চলে আসবার পথে একবার ভাবলুম বিভূতিদের বাড়ি যাব? টরুদের বাড়ি যাব? কিন্তু রাত ৮টা হয়ে গেছে। শীতের রাত ৮টা। বাবার কথা আজ হঠাৎ মনে এল—বিধুবাবুর বাসায় বাবা এলেন—আমি এক গ্লাস জল দিলাম—সেই কথা। বাবাকে কতকাল দেখিনি! কোলার সম্বন্ধে অন্য মনই হয়ে গেল এই পিতৃমনস্তত্ত্ব এসে। রিপনের সেই ছেলেটি এসে অনেকরাত পর্যন্ত গল্প শোনালে।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৩৪। ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। সোমবার

প্রজ্ঞাব্রতের বাবা এসেছিল তার ছেলের নম্বর কম হয়েচে বলে। তাকে পত্র লিখে আবার দেখা করতে বলা হোল। আমি স্কুল থেকে বেরিয়েচি, কোলার সঙ্গে দেখা হোল। ওকে নিয়ে একটা চায়ের দোকান [—] চা খাইয়ে দিলাম। তারপর ইডেন গার্ডেন দিয়ে হেঁটে পুরোনো আমলের ক্লাইভ স্ট্রীট্ দিয়ে ১১ বছর আগেকার ইউনাইটেড্ ট্রেডিং বিল্ডিংতে আবার উঠলুম। শেষে কবে উঠেছিলুম মনে নেই। নিশ্চয়ই বিভূতিদের বাড়ি ঢোকবার আগেই। প্রজ্ঞাব্রতের বাবার এই কথাটা মনকে খিচ্ড়ে দিয়েছে। তারপর চাঁদ বুক ডিপোতে চা খাওয়ালে—বিভূতিদের বাড়ি গিয়ে ভাগলপুরের নেবাজি সর্দারের কাছে টাকার জন্যে চিঠি লেখা গেল। দুটো ভাল কাজ করেচি আজ। তিনটা কুজীকে পয়সা দেওয়া, কোলাকে খাওয়ানো। নেবাজি সর্দারের টাকার তাগিদ। বটু [,] রাখী ও ছোট খুকী প্রণাম করলে। ওখান থেকে বার হয়ে রমেশ সেনের আড্ডায় ও সেখান থেকে P.C. Sircar-এর দোকানে বই নিয়ে এবং সুপ্রভাকে বই পাঠিয়ে দেবার কথা বলে বাসায় এসে লিখ্চি। হাঁ, এই একটা ভাল কাজ সুপ্রভাকে বই পাঠানোর কথা বলা। দিনটা ভাল। কিন্তু মনটা খারাপ প্রজ্ঞাব্রতের নম্বর কম পাওয়ার কথায়।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে আজ আইভ্যান্হো শেষ করলুম অনুবাদ। জসিমুদ্দিন, সুরেন ধর, গিরিনবাবু এল। দুপুরে কোলা এল College Square-এ। কি একটা ছড়া বলে—father, uncle, cousin, king—ইত্যাদি। ফিরে স্কুল গিয়ে গার্ড ছিলুম ৫॥০ পর্যন্ত।বার হয়ে বঙ্গশ্রী হয়ে ট্রামে কাত্যায়নী বুক স্টল হয়ে জগৎ দাসের ওখানে শেষ কপি দিয়ে এলুম আইভ্যান্হোর।

হেঁটে বাড়ি এলাম। শীত পড়েচে বেশি। কাল দরবার ডের ছুটি। ভাব্চি কি করবো কাল। কোথাও বেড়াতে যাব? বুকস্টলে ৫ খানা যাত্রাবদল দিলাম।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বুধবার

দরবার ডের ছুটি। দুপুরে এলেন সোমনাথবাবু, তাঁরই গাড়িতে বসে গেলুম বেলুড় মঠে বহুকাল পরে। ১৯১৬ সালে গিয়ে আর এই ১৯৩৪—১৮ বছর পরে। পথে একখানা বই দিলুম সোমনাথবাবুকে—গঙ্গার ধারে বিবেকানন্দের মন্দিরে বসে বিলেতের গল্প হোল। সেখানে আবার রিপন কলেজের সেই আশুর সঙ্গে দেখা। প্রণাম করলে। ওখান থেকে পুরোনো বিবেকানন্দের ঘর ও লাইব্রেরি দেখে এসে প্রসাদ নিলুম। তারপর মোটরে ফিরবার পথে হাওড়া স্টেশনের রেস্টোরেন্টে চা খেয়ে দুজনে এলাম College Street-এ। আমি অবিশ্যি নামলুম College Square-এ ও হেঁটে বাড়ি এলুম।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে অনেকদিন পরে দক্ষিণাবাবু এসেছিলেন। স্কুলে গিয়ে একগাদা খাতা দেখে গেলুম কার্জন পার্কে। এক ঝাড় সুন্দর ফুল গাছের ধারে [—] গায়ের কাপড় পেতে Prosper Merimee-এর Mateo Falcone পড়লুম। একটা সুন্দর ছোট ছেলে বছর পাঁচেক বয়স—কেমন অনেকক্ষণ আলাপ করলে। তার চোখে চশমা [—] দেখতে পায় না ভাল। আমার হাতের আংটিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলে। যাবার সময় বল্লেGood by [bye]. তার মা আমেরিকান্—বাবা বাঙালি। তারপর হেঁটে চলে এলুম। ছেলেটাকে বড় ভাল লাগল।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে স্কুল থেকে কোলার সঙ্গে বাসায় এলাম। পথে...? সঙ্গে দেখা। কোলা একটা দোকানে জিলিপি খেলে। তাকে ট্রামে উঠিয়ে শেয়ালদহ এসে বরিশাল এক্সপ্রেস ধরে বনগাঁয়ে এলুম। কাল ছুটি নিয়েচি। চমৎকার জ্যোৎস্না। এমন জ্যোৎস্না কল্‌কাতাতে পাইনি। মন্মথবাবুর আড্ডাতে গিয়ে সোমনাথবাবুর বিলাত ও ইটালী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা গেল। জাহ্নবী সেরে উঠেচে দেখে খুব আনন্দ হোল।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে উঠে মনে বড় আনন্দ হোল চারিপাশের প্রকৃতি দেখে। খয়রামাটির মাঠে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় ঝোপের মধ্যে জঙ্গুলে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে নীলবর্ণের ফুল ফুটেচে—সেদিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ হোল। দুপুরের পরে বিজয় ও আমি বারাকপুরে গেলুম। খুকু ওদের বাড়ি থেকে বালিশ বিছানা বয়ে নিয়ে আসবার সময় বল্লে—কি করবেন? আমি বল্লুম—আয়। ও বল্লে—ওমা! এখন কি করে যাব? বলে একটা কি চমৎকার হাস্‌লে। তারপর এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। রাত্রে কালোদের বাড়িতে কালো আমি খুকু খুড়িমা তাস খেলা হোল। কালুকে নিতে এসে মানুর স্বামী কি রকম কেঁদেচে—তাই নিয়ে পাড়া গুলজার! অনেকরাত পর্যন্ত সেইসব গল্প হোল। মানু নিজের দুঃখের কথা বল্লে। রাত ১২টা পর্যন্ত খুড়িমা আমি, খুকু কালা সেই গল্প।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি ও বিজয় বনগাঁয়ে এলাম হেঁটে। এসে যতীন ডাক্তারের দোকান থেকে জামা সারিয়ে আন্‌লুম। বাজার করে বিভূতির ওখানে খানিকটা গল্প করা গেল। খয়রামারির মাঠেতে কালকার সেই ফুলগাছটার কাছে বেড়িয়ে এলুম। তারপর একটু ঘুমুনো গেল দুপুরে। বিকালে কচা এল—দারোগার আসর বসে (?) চা খাবার যাচ্চে। আমি ও সরোজ খয়রামারিতে বেড়াতে গেলুম সন্ধ্যার সময়। কি অপূর্ব রক্তাভ পশ্চিমাকাশ। আস্‌বার সময়ে চাঁদ উঠেচে। মন্মথবাবুর আড্ডাতে গিয়ে রাসপুটিনের গল্প হোল। সুন্দর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে ফিরলুম বাসায়।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১লা পৌষ ১৩৪১। সোমবার

সকালে এক্সপ্রেসে কল্‌কাতা এলুম। স্কুলে গিয়েই বেলা দুটোর সময় বেরুই। প্রথমে নীরদ দাশগুপ্তের বাড়ি—সেখানে এল জাবলু [—] সে পুডিং করার কথা সেখানে। সেখান থেকে বন্ধুর বাসা ও নীরদ চৌধুরীর বাসায়। বাসে ফিরলুম।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ২রা পৌষ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

সকালে এক্সপ্রেসে কানাই, গিরীনবাবু, রমাপ্রসন্ন এল। স্কুলে যাই দেড়টাতে। মনোমোহনবাবু বল্লে কোলা কি চিঠি এনেচে হেড্‌মাস্টারের কাছে। নীরদ চৌধুরী এল—তার সঙ্গে book company, পরে কাত্যায়নী বুক স্টল—ও জগৎ দাসের ওখানে।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৩রা পৌষ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে কেউ আসে নি। আমি নিখিলবাবুর বাসায় গেলুম। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী—নীরদের সঙ্গে প্রবাসী। সকালে সকালে বাসায় ফিরি। এক ভদ্রলোক সিলেট্ থেকে দেখা করতে এল। সুপ্রভা সম্বন্ধে নীরদ বল্লে আজ বিকেল বেলা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪।৪ঠা পৌষ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

যাওয়ার কথা ছিল নিখিলদার গাড়িতে বনগাঁয়ে। ফিরে এলুম তার বাড়ি থেকে—খাওয়া হোল না। স্কুলে গেলুম—সজনী আজই চাকরি ছেড়েচে। পি সি সরকারের দোকানে এসে টাকা ও দৃষ্টিপ্রদীপের কথা নিয়ে কথাবার্তা ও আলোচনা হোল।

এসে মনে হোল ভগবান আমায় টাকাকড়ির চেষ্টা থেকে নিবৃত্তি করুন—ও আমার ভাল লাগে না।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৫ই পৌষ, ১৩৪১। শুক্রবার

কোলার জন্যে আজ মনটায় বড় দুঃখ। প্রথমে গেলুম বঙ্গশ্রীতে—সেখানে সজনীচাকুরি আবার নিয়েচে। আজ সকালে আশু এসেছিল, তার পদ্য ও দৃষ্টিপ্রদীপের কপি যোগেশকে দিয়ে চা খেয়ে এলুম। বঙ্গশ্রী থেকে ট্রামে নিউ মার্কেটে Geo, Mag. ও Wide কিনে স্কুলে এসে খাতা দেখি। আবার বঙ্গশ্রীতে গিয়ে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর সঙ্গে Hotel Majectic-এ গিয়ে চা। তারপর হেঁটে বাসা।

রাত্রে Short Story পড়ে মশগুল হয়ে ছিলুম। Mrs Knollys গল্পটা পড়ে সারারাত্রিটা স্বপ্ন দেখেচি। ১৮ বছরের মেয়েটি [?] এর ধারে বসে আছে।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৬ই পৌষ, ১৩৪১। শনিবার

সকালে পি. সি. সরকার, সুরেন ধর, কান্তি। দৃষ্টিপ্রদীপের টাকাকড়ির কথা বলতে অনেক দেরি হোল। স্কুলে গেলুম সকালে সকালে। কোলার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। সে বল্লে—I shall forget everybody except you. তারপর টাকাকড়ি নিয়ে কোলার সঙ্গে বাসায় এলুম। কোলা অনেকক্ষণ রইল। একটা ছোট খাতা সে নেবেই...অনেক করে তার কাছ থেকে নিলুম। দুজনে স্টেশনে এলাম। বেজায় ভিড়—বনগাঁয়ে এসে স্টেশনে গোবরাপুরের অনাথের সঙ্গে দেখা। খয়রামারি গেলুম সন্ধ্যাবেলা। সেই সাদা সাদা কুচো ফুল দেখে মনের কালকার টাকাকড়ির আলোচনার দরুন নিরানন্দ ভাব কাট্‌ল। ক্লাবে গল্প। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠ্‌ল। কোলার কথা কেবলই মনে হচ্চে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৭ই পৌষ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে বাজার গেলাম ও বারাকপুরে আস্‌বার জোগাড় করি। বেলা একটার নৌকায় চেপে বারাকপুর রওনা হই! দুধারে অতি সুন্দর দৃশ্য। জলপিপি জলের ধারে খেলা করে বেড়াচ্চে। খয়রামারিতে যে ফুলটা দেখেছিলুম—ঐ ধুর ফুল নদীর দুধারে ফুটে আছে মাঠের মধ্যে। সন্ধ্যার সময় বাড়ি পৌঁছে গেলুম। খুকু কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল—সে এল—তাকে কোলার গল্প করা গেল। সন্ধ্যার পরে আবার এল—অঙ্ক কসাই—তারপর সে আবার তাড়াতাড়ি রাগ করে চলে গেল গল্প না শুনে। রাত্রে খুব শীত করল।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৮ই পৌষ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে লিখতে বসি। একটু পরে রোদ উঠল—খুকু এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রইল। বেলা ১১৷৷০ টার সময় গেলাম নাইতে। কুঠির মাঠের কি শোভা হয়েচে—তা অবর্ণনীয়। ধুর ফুল ফুটেচে সর্বত্র। যেদিকে চাই সেদিকেই নীলাভ সাদা ধুর ফুল। স্নান করে এসে রৌদ্রে বস্‌লুম। বেলা যাওয়া পর্যন্ত বসে গল্প। সইমা, ন'দি, খুড়িমার কাছে পরলোকতত্ত্ব বললাম। তারপর কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলাম। সে যে কি শীতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ মাখানো গাছ, ঝোপ, ঘাসের মাঠ—কি চারিদিকের ফুটন্ত ধুর ফুলের শোভা—সর্বত্র ধুর ফুল, যেদিকে চাই সেদিকে। সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম—আরও লোকে বলে বাংলা ফুলের দেশ নয়। ক্রোকাস, মার্গারেট হয়তো ফোটেনা,কিন্তু এখানকার ফুলের সম্পদ কি কম? অনেক রাত পর্যন্ত খুকু রইল—গানকরলে, যেতে চায় না। জ্যোৎস্না উঠলে গেল [—] আবার এল। বল্লুম, এখানে এসে দাঁড়া। জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াল।...? গল্প হোল।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ৯ই পৌষ, ১৩৪১। মঙ্গলবার

এখানে বড়দিনকে আমরা গ্রাহ্য করি? দিব্যি গিয়ে সকালে নেয়ে এলুম খুকুর সঙ্গে—সাঁতার দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে গেলুম। দুপুরের ঘরে খুকু একখানা বই পড়ে শোনাতে লাগ্‌ল। তারপরে টুলখানা নিয়ে আমি কুঠির মাঠের তিন জায়গায় গিয়ে টুল পাতলাম—ফুটন্ত ধুর ফুলের বনের পাশে, নিভৃত বনঝোপের ধারে। পাখির কলকাকলীর মধ্যে, সুন্দর রাঙা রোদ পড়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে বসে মনে যে কত কি অদ্ভুত আনন্দের ভাব জাগল—কতকাল আগে ছেলেবেলায় এই বড়দিনের সময়ে মুচিপাড়ায় যেতুম রস জ্বাল দেওয়া দেখতে—

কলাইমুগের ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে বেড়াতুম সে কথা মনে পড়ে গেল। এখনও লোক আছে—যারা কলাই মুগ ঝাড়া নিয়ে ওই পৌষ মাসে মহাব্যস্ত। এই জীবনও আমি একদিন যাপন করেচি। তাই দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর সঙ্গে হোটেল ম্যাজেস্টিকে যদিও সেদিনকার কথা ভেবে হাসি পায়। ওরা আবার আর্টিস্ট, এখানে smoke nuisance একটা problem-ই নয়। রাত্রে খুকু গাইলে। ওদের গল্প করলুম।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১০ই পৌষ, ১৩৪১। বুধবার

সকালে উঠে মাঠে বেড়িয়ে এলুম। এসে লিখতে বসি। একবার উঠে হরিপদদাদের বাড়ি গেলুম মাংস নিতে। ফণি কাকা ইত্যাদি সেখানে এসেচে। স্নান করে আসবার আগে ধুরফুল ফোটা মাঠে গেলুম—মাঠে বেড়িয়ে ওপাড়ের ঘাটে সাঁতার দিয়ে এলুম। খাওয়ার পরে খুকু এসে বসল, বেলা গেল সে আর আমাকে উঠতে দেয় না—কুঠির মাঠে যেতে দেয় না—বলে, বসে আমাদের খেলা দেখুন। অনেক বেলা গেলে জোর পায়ে হেঁটে বেলেডাঙার দোকানে গেলুম ও খানিকটা বসে গল্প করে অপরূপ সন্ধ্যায় ফিরে আসি। রাত্রে খুকু এল—আমাকে বল্লে—কড়াইয়ের ডাল দুধ দিয়ে খাবেন? দিয়ে গেল এ ঘরে। অনেকক্ষণ অঙ্ক কষলে। সকাল সকাল চলে গেল [—] বল্লে আজ আর গল্প শুনবো না। ও যেন একটা প্রহেলিকার মত।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১১ই পৌষ, ১৩৪১। বৃহস্পতিবার

সকালে খুব ভোরে কুঠির মাঠে গিয়েছিলুম। তারপর এসে বসে লিখলুম। সুসার কাকা এসে গল্প করলেন। স্নানের পূর্বে কুঠির মাঠে গিয়ে ধুরফুল ফোটা একটা অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি আবিষ্কার করলুম। স্নান করে এলুম কিন্তু সাঁতার দিলাম না। খাওয়ার পরে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে লিখচি—তারপরেই খুকু এসে sentence লিখ্‌তে বসল। হাটে গেলুম। হাট থেকে এসে সন্ধ্যার সময় কুঠির মাঠে গেলাম। আমাদের ঘাটের ঠাণ্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে সন্ধ্যায় ওঠা Orion-এর দিকে নির্জন নদীতীরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রে খুকুদের অঙ্ক কসিয়ে তারপর...?গল্প করলুম। টুনি দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে টিকে নিয়ে এল। আজ শীত কম।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১২ই পৌষ, ১৩৪১। শুক্রবার

সকালে উঠে লিখলাম। খুব ভোরে উঠে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম—টক্‌টকে লাল সূর্য উঠেচে নদীর ওপার থেকে। ঘি কিনলাম বনগাঁয়ের একটা লোকের কাছ থেকে। স্নানের পূর্বে খানিকটা মাঠে বেড়িয়ে এলুম—সেই ফুল ফোটা মাঠে। বাঁশতলার ঘাট পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম—বাঁশতলার ঘাটের ছায়াভরা পথ দিয়ে আসতে ভারি ভাল লাগছিল। খুকু এসে দুপুরে কতক্ষণ বসে রইল। তারপরে টুনি, বাতু (?) জগো এদের সঙ্গে কুঠির মাঠে বেড়াতে গিয়ে কত বনঝোপের ধারে বসলুম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়েগেল—গাছপালা, ধুরফুল ফোটা ঝোপের সঙ্গে এই অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার প্রাণের জিনিস। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হোলে ওদের নিয়ে বাড়ি ফিরলুম।—পাঁচী রোজ বিছানা পেতে রাখে—বসে বেশ চা খাই—চালভাজা খাই—যেন নিজের বাড়ির মত যত্ন পাই—ওটা আমার বড় ভাল লাগে। এই সন্ধ্যায় লিখ্‌চি—এখনও খুকু আসেনি, আসবে এখন। খুকু রাত্রে এল—বল্লে আপনি অত রাগ করেচেন কেন? রাগ কিসের? ও মাথায় আবার সেই ফুল গুঁজলে।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৩ই পৌষ, ১৩৪১। শনিবার

আজ দুপুরে স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে এপাড়ার ঘাটে এসে দেখি ভববন্ধু মামা এসেচে। দুপুরের পরে খুড়ি মা আমার টুল পেতে বসে [—] গল্প করলেন। তারপর আমি, জগো, মঙ্গল বেড়াতে গিয়ে বেলেডাঙার বাঁওরের অই পাড়ে একটা সুন্দর জায়গায় বসে রইলুম। ভগবান সম্বন্ধে একটা ভাববার ছিল—প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবান নন, যিনি সকলের দাতা ও সেবক, সৌন্দর্য ও রূপের খনি—সেই ভগবানকে যে পুজো, সে তো আপনা থেকেই হবে। পুঁটিদিদিরা খুব ঝগড়া করলে জগোকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। খুকু আমার দিকে হোল দেখলুম। ওরা আজ মাঠ থেকে ফুল তুলে এনেছিল। অঙ্ক কষবার সময়ে খুকু কেমন মিষ্টি হাসে।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৪ই পৌষ, ১৩৪১। রবিবার

সকালে উঠে লিখেই বেড়াতে বার হলাম। প্রথমে হরিপদদাদের বাড়ি গিয়ে চা খাই। সেখান থেকে শাঁখারীপুকুরের ধারে বেড়াতে গেলাম—ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েগিয়ে শাঁখারীপুকুর দেখলুম—একটা গাবগাছের ডালে বসে রইলুম। শ্যামাচরণ দাদার বাড়ি এসে বসে গল্প করি। ভববন্ধু মামাদের বাড়ি গিয়ে বসে রইলুম অনেকক্ষণ, খুড়িমা এসেচেন। অনেকদিন পরে নায়েব বাড়ির খিড়কির দুয়ারের পথে গেলাম—বোধহয় ২৬/২৭ বছর পরে। অনেক বড় বড় গাছ হয়েচে[—] বদলে গিয়েচে। দুপুর খুকু এল—ইংরেজি পড়ালুম তাকে। বিকেলে বেড়াতে গেলুম মরা গাঙের ওই পাড়ে। অনেকক্ষণ বসে থেকে রোদ রাঙা হোলে তবে উঠলুম। গঙ্গাচরণের দোকানে এসে তামাক খেয়ে নদীর ধারে এসে প্রথম তারাটা দেখে মনে অপূর্ব ভাব হোল। তারপরে একটা অদ্ভুত উল্কাপাত দেখলুম। ঠিক ওপাড়ার ঘাটে উল্কাটা পড়ল। প্রথমে সাদা, পরে নীল, তারপর বেগুনি রং হয়ে গলে গেল। আমার মন যে কি অপূর্ব God-consciousness-এ ভরে গেল। রাতে খুকু আমি কালো খুড়িমা তাস খেলি।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪। ১৫ই পৌষ, ১৩৪১। সোমবার

সকালে বেড়িয়ে এসে লিখতে বসলুম। দুপুরে স্নানের আগে কুঠির মাঠে গেলুম। কুঠির মাঠের ওই ফুলগুলিকে বলে ছোট এড়াঞ্চির ফুল—যাকে বলে এসেচি ধুর ফুল। আজ অত্যন্ত শীত। সেই শীতের মধ্যে সাঁতরে ওপাড়ার ঘাটে এলুম। খুকু দুপুরের পরে এসে গল্প লেখালে। কতক্ষণ কাছে বসে রইল। তারপর পাঁচী চালভাজা ভাজ্‌লে। কচা এল। আমি কুঠির মাঠের মধ্যে দিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্যভূমির মধ্যে দিয়ে বেলেডাঙায় গিয়ে উঠলুম। ননী সেক্‌রার দোকানে বসে তামাক খাই। ওরা জিলিপি ভাজ্‌চে। আবার ফিরে এলুম সেই মাঠের মধ্যে দিয়েই। সন্ধ্যা ঘন হয়ে গিয়েচে। ফেউ ডাক্‌চে, আমি তখনও কুঠির ওদিকের মাঠের মধ্যে অস্ত রোদমাখা পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে আছি। তারপর নদীর ধারে রোজ রোজ সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে একটা সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে কি অপূর্ব অনুভূতি হয় মনে। খুকু ফর্সা কাপড় পরে এল রাত্রে। অঙ্ক কষল।

Notes for 1935

দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসখানি জ্যৈষ্ঠের মধ্যে শেষ করবো। জঙ্গলের বই আরম্ভ করবো। ছোটগল্পের একখানা বই বার করবো। ছোট একখানা উপন্যাস লিখ্‌বো।